হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু

প্রবোধ দে

অর্চনা পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
রাখী পূর্ণিমা,
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র
অর্চনা পাবলিশার্স
৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

কথা মুদ্রণ শিল্পী :
বাসুদেব চন্দ্র
অর্চনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৭এ, পার্বতী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ ব্লক প্রস্ফুটন ও মুদ্রণ শিল্পী :
রিপ্রডাকসন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা-৬

অঙ্কন ও আলোকচিত্র—
ব্লক প্রস্ফুটন ও মুদ্রণ শিল্পী :
বেঙ্গল অটোটাইপ
কলিকাতা-৬

গ্রন্থ-বন্ধন শিল্পী :
ন্যাশনাল ট্রেডার্স

॥ পাঁচ টাকা ॥

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিভূতি সেনগুপ্ত

অঙ্কন শিল্পী :
অরুণ ঘোষ

সজ্জা শিল্পী :
সলিল বসু
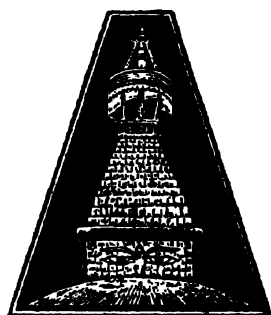
গোড়ার কথা

পাঠকমহলে হিমকান্তা কাঠমাণ্ডুর লেখক অপরিচিত নন। ইতিপূর্ব্বে যুগান্তর সাময়িকী, বেতার জগৎ প্রভৃতি পত্র পত্রিকাতে ওঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

রীতিমত ভ্রমণ বিলাসী আর নিপুণ আলোক-চিত্র শিল্পী—লেখকের গৃহীত বহু আলোক চিত্র, প্রচ্ছদ ও রচনার অন্তর্গত হয়ে বেতার জগৎ আর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকাকে অলঙ্কৃত করেছে।

হিমালয়ের প্রশস্তিতে পরিপূর্ণ অনেক নামজাদা লেখকের বই থাকলেও সামন্ত-তন্ত্রের লৌহ যবনিকার অন্তরালে নেপালের হিমালয় নিয়ে তত্ত্ব আর তথ্য পরিপূর্ণ বই'এর একান্তই অভাব ছিল। সেদিক থেকে হিমকান্তা কাঁঠমাণ্ডু এক অভিনব অবদান।

নেপালের প্রকৃতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস—সব কিছু সম্পদই লেখক উন্মাদের মত লুঠ করেছেন আর আমরা ঐ লুঠ করা ভাণ্ডারের কিছুটা জোর করে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছি।

বইটিতে লেখকেরই গৃহীত অসংখ্য আলোক-চিত্র সংযোজিত হয়েছে যা মনের কন্দরে নিঃসন্দেহে তরঙ্গের দোলা দেবে।

পাঠক সুধী-জন একে সাদরে গ্রহণ করলে লেখকের শ্রম আর আমাদের গুরুদায়িত্ব সার্থক হয়েছে মনে করবো। ইতি—

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৬ প্রকাশক

ভূমিকা

শ্রীপ্রবোধ দে তাঁর হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু বইয়ে একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করে আমাকে যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনি বেশ একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। নেপালে আমি কোন দিন যাইনি এবং যদিও কথা আছে যে যে-দেশ দেখিনি, তার ভ্রমণ কাহিনীই সব চেয়ে চমৎকার করে লেখা যায়, কেন না দুনিয়ায় ট্যুরিষ্ট গাইড বুকের অভাব নেই, তবু আমি অতটা দুঃসাহসী নই! তাই ভয়ে ভয়েই বইটি ওল্টানো স্বরু করেছিলাম! কিন্তু একাসনে সমগ্র বইটি যখন শেষ করে ফেললাম. তখন মনে হল, সত্যিই কি আমি নেপাল যাইনি?

প্রবোধ বাবু তাঁর নিপুণ লেখনীতে নেপালের পথ-ঘাট, অরণ্য-পর্বত, দেবস্থান, গ্রাম-সহর, তার বিচিত্র পাল-পর্ব, আমোদ-প্রমোদ, তার অর্ধ-রহস্যময় অর্ধ-আদিমতা ঘেরা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ও তার বিচিত্র মানুষের মিছিলকে যে ভাবে রূপায়িত করেছেন, তারপর বাস্তবিকই অদেখা কিছু থাকে কি? নিজের দর্শনকে তিনি অন্যের মননের মধ্যে জীবন্ত করে তোলার শক্তি রাখেন। তিনি কুশলী আলোক-চিত্রী তা জানি। কিন্তু কলমেও তাঁর চিত্রাঙ্কন শক্তি লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য শুধু এইটুকুই তাঁর বিশেষত্ব নয়। তাঁর আখ্যায়িকায় এক দিকে যেমন ছবির পর ছবি ভীড় করে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি এসেছে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গও। তবু কাহিনী তাঁর বিরস বিবরণে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি! তরলে কঠিনে, করুণে কৌতুকে আগাগোড়া গল্পটিই হয়েছে উপভোগ্য।

গল্প কথাটা আমি ভেবে চিন্তেই ব্যবহার করেছি। সত্যিই গল্প বলেছেন লেখক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেননি। তত্ত্ব, তথ্য, বিবরণ, সবই

সেই গল্পের সহজ প্রবাহে বয়ে এসেছে, যেমন করে গিরি-নির্ঝরের সঙ্গে সবেগে বয়ে আসে নুড়ির পর নুড়ি। ভাষণের এই নির্বাধ গতিশীলতা টুকুই তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ। আর বলতে দ্বিধা নেই, এটাই প্রধান আকর্ষণ বইটির। তাছাড়া অবশ্য বইটি যেমন আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে অনেক, তেমনি জুগিয়েছে অনেক নূতন চিন্তারও উপকরণ। মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাণাশাহীর স্বৈরাচার থেকে নূতন নেপাল কি করে ধীরে ধীরে জাগছে, তার মর্ম-পরিচয় পাবেন পাঠক বইটি পড়লে। সাম্প্রতিক নেপালের এমন পূর্ণ পরিচিতি অন্য কোন বইয়ে নেই। সেদিক থেকেও বইটির উপযোগিতা অল্প নয়।

ছোটবেলা থেকে আমাদের পরিচয় হয় কলকাতা ময়দানে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের সঙ্গে। আমরা কি জানি যে স্বাধীন নেপালের পায়ে পরাজয়ের বেড়ী পরিয়ে এসে ডেভিড অক্টারলোনী তুলেছিলেন এই অপমানের বিজয়-স্তম্ভ? প্রবোধ বাবুর বইটি পড়ার পর মনে হল, নেপাল-ভারত মৈত্রীর স্বার্থে এই মনুমেণ্টের আজ নূতন নামকরণ হওয়া দরকার। কারণ নেপাল শুধু প্রতিবেশী নয় আমাদের, পরমাত্মীয়ও। এই আত্মীয়তার সুরটুকুও নূতন করে জাগাল হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ভ্রমণ রসিকেষু
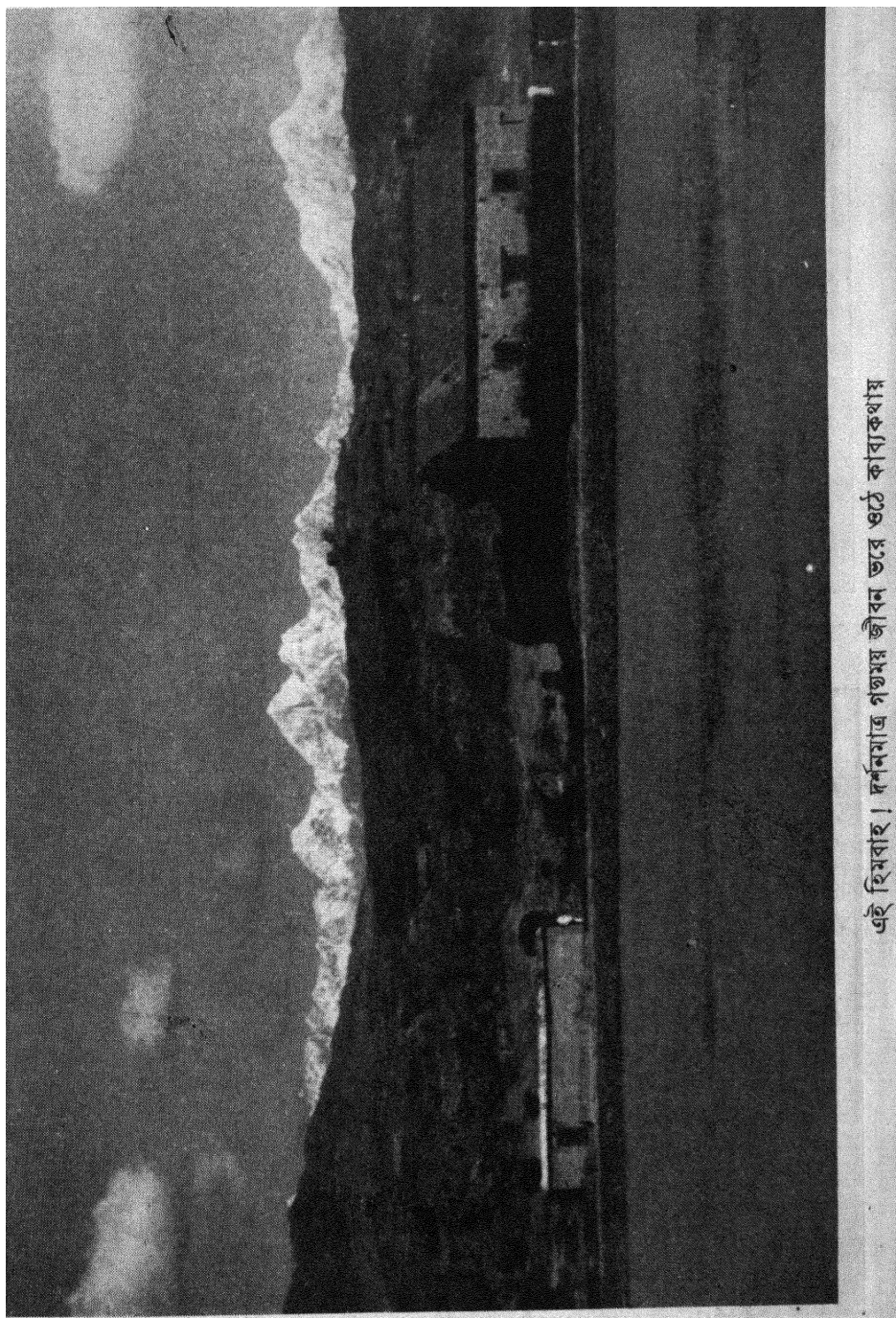
এই হিমবাহ! দর্শনমাত্র গদ্যময় জীবন ভরে ওঠে কাব্যকথায়
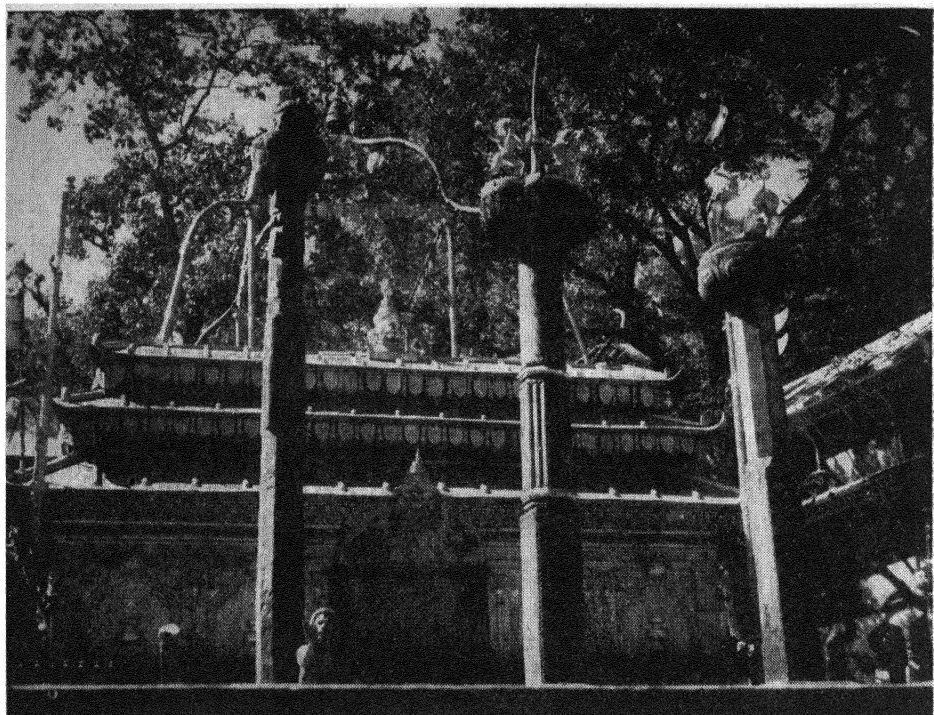
আপাদশীর্ষ সোনার পাতে মোড়া গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির
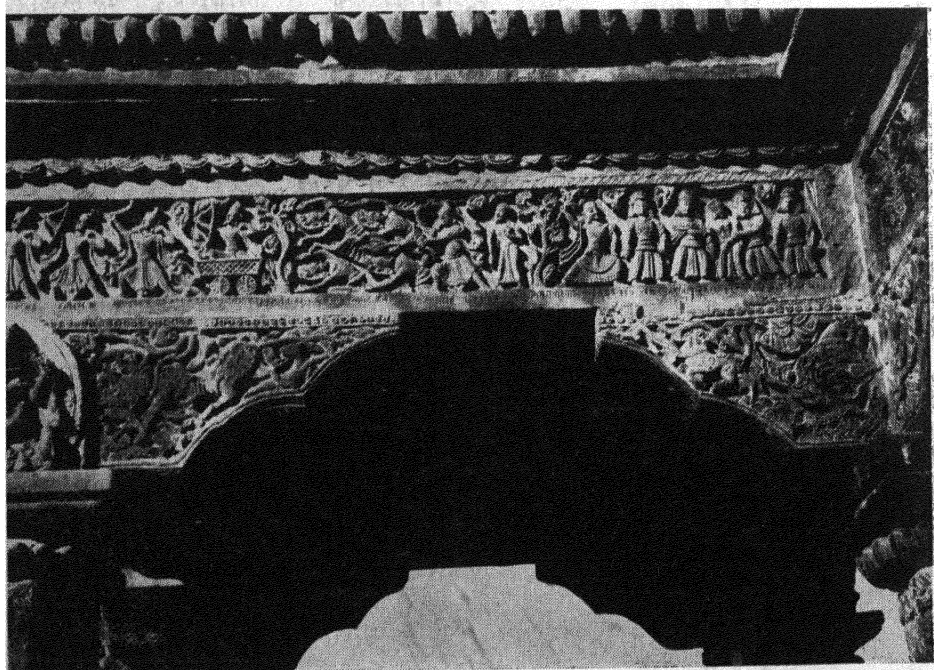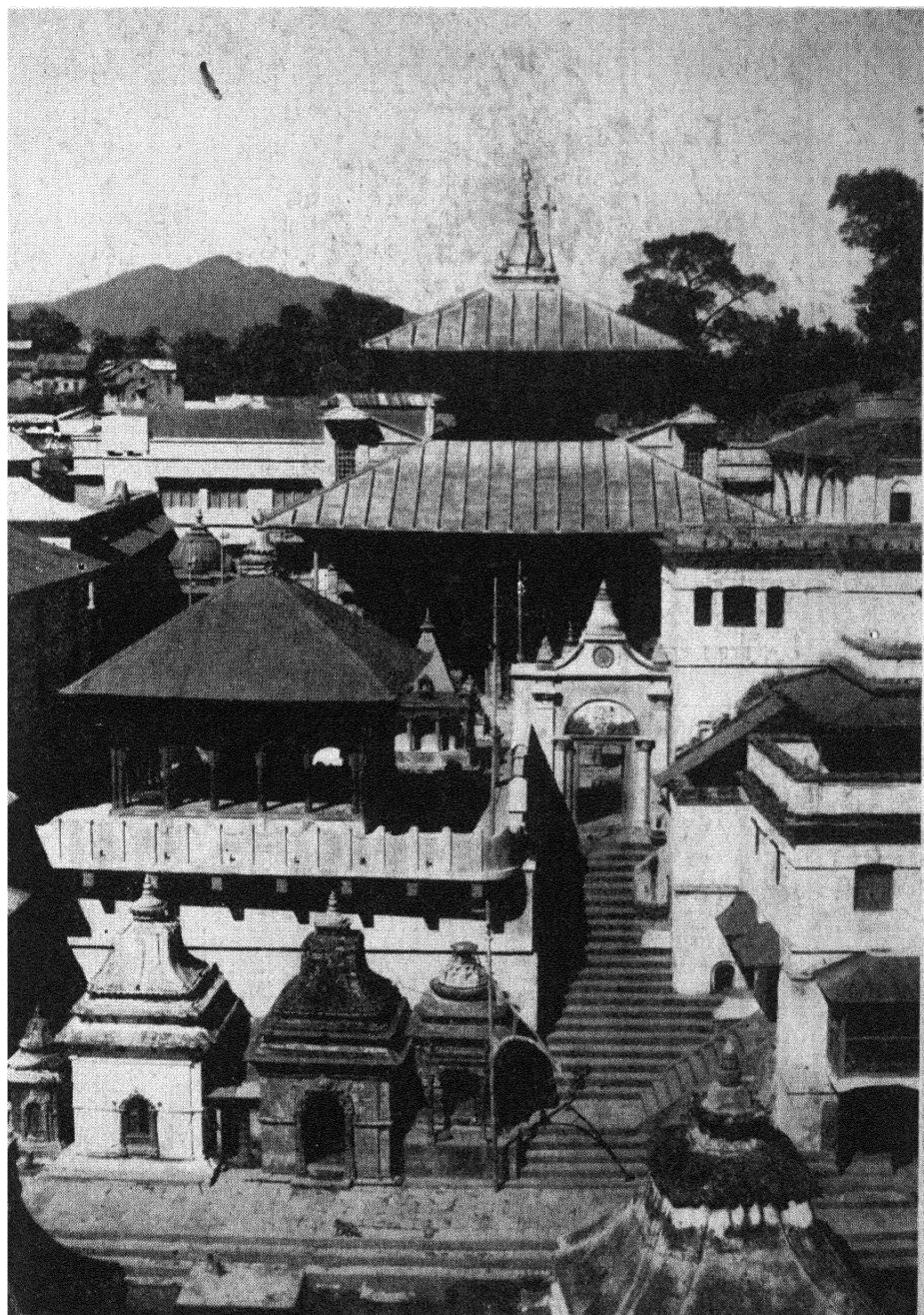
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম—পঞ্চবক্ত্র পশুপতিনাথ
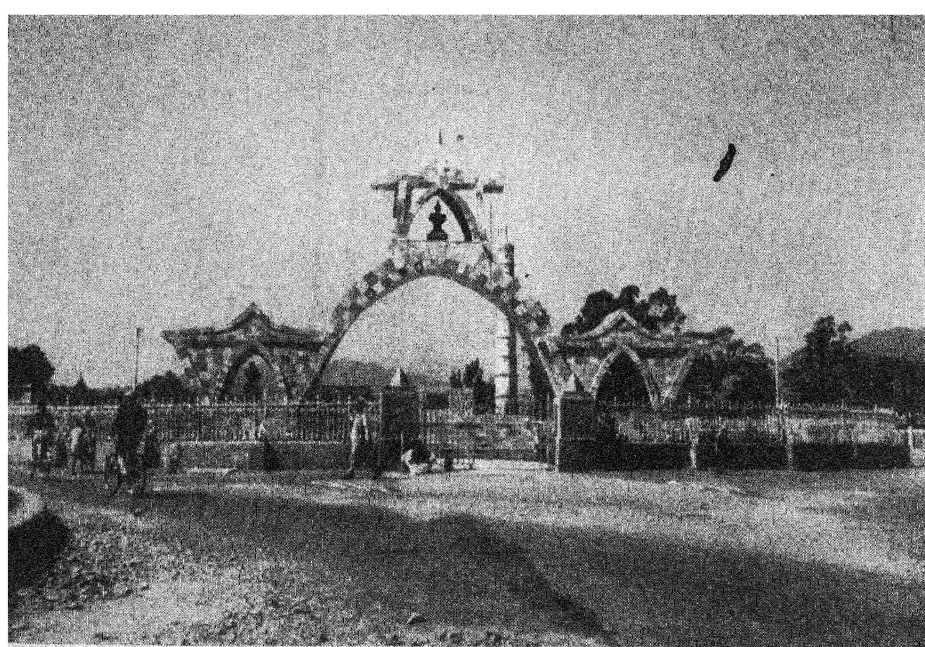
শহিদবেদী (কাঠমাণ্ডু)
শহিদের রক্তে রাঙ্গা হল কাঠমাণ্ডু—নব কলেবরে জন্ম নিল নেপাল
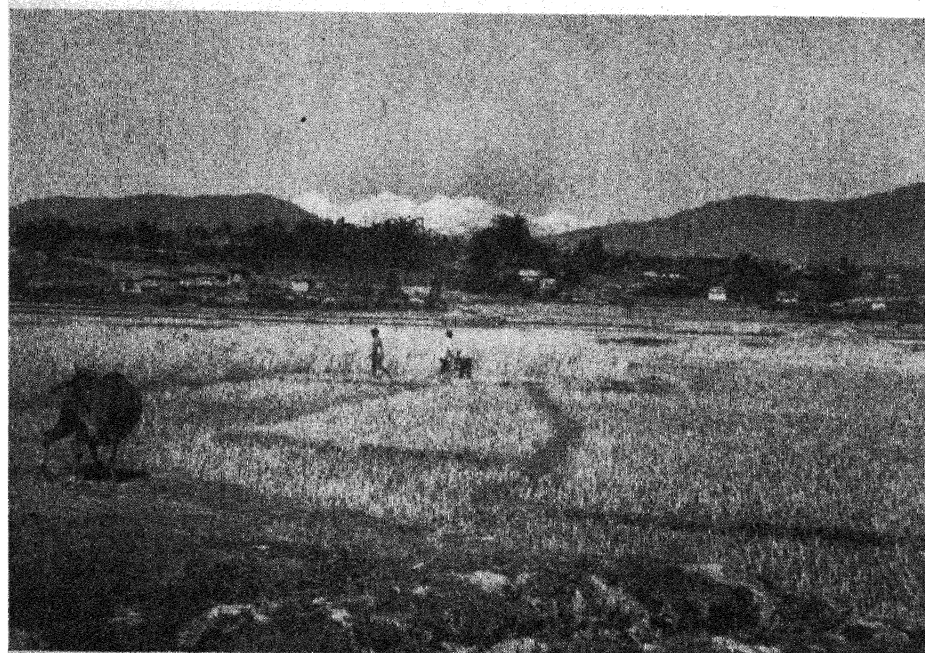
বাগমতী উপত্যকা
সোনার খনি ঐ আঁটিবাধা ধানের স্তূপে
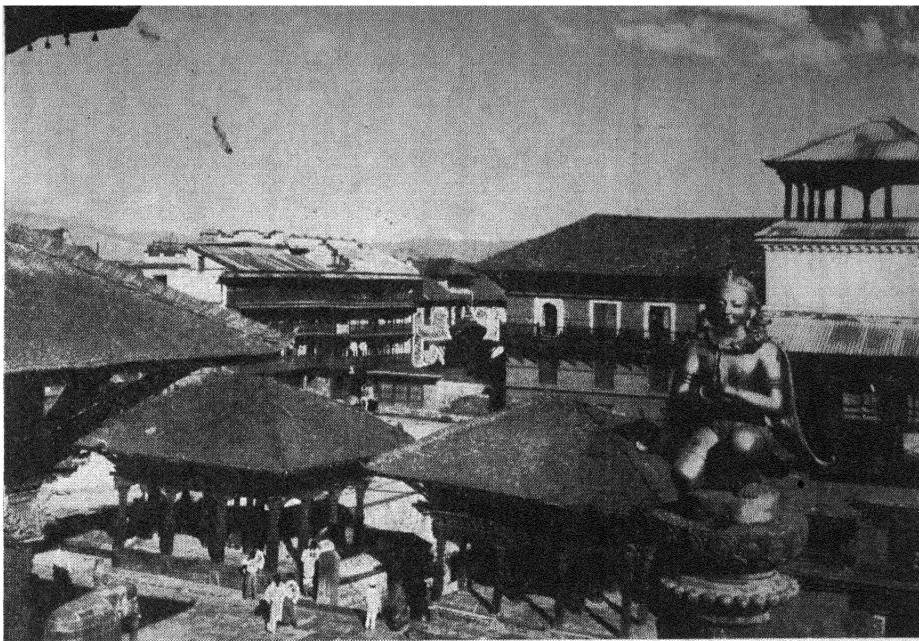
(পাটান কৃষ্ণমন্দির অঙ্গন)
বিষ্ণুবাহন ভক্ত বৈনতেয়

কাঠমাণ্ডু সহরের কেন্দ্র স্থলে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভীমসেন স্মারক স্তম্ভ

গুহ্যেশ্বরী মন্দির তোরণ

"কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ" জিজ্ঞাসায় উৎসুক দুটি নয়ন

ঘুরি পথে পথে

হনুমান ঢোকার পথের একাংশ

মঞ্জুশ্রী চৈত্য
হীরকদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল মৈত্রেয় বুদ্ধ

পথ পরিচিতি

আমলেকগঞ্জ—কাঠমাণ্ডু
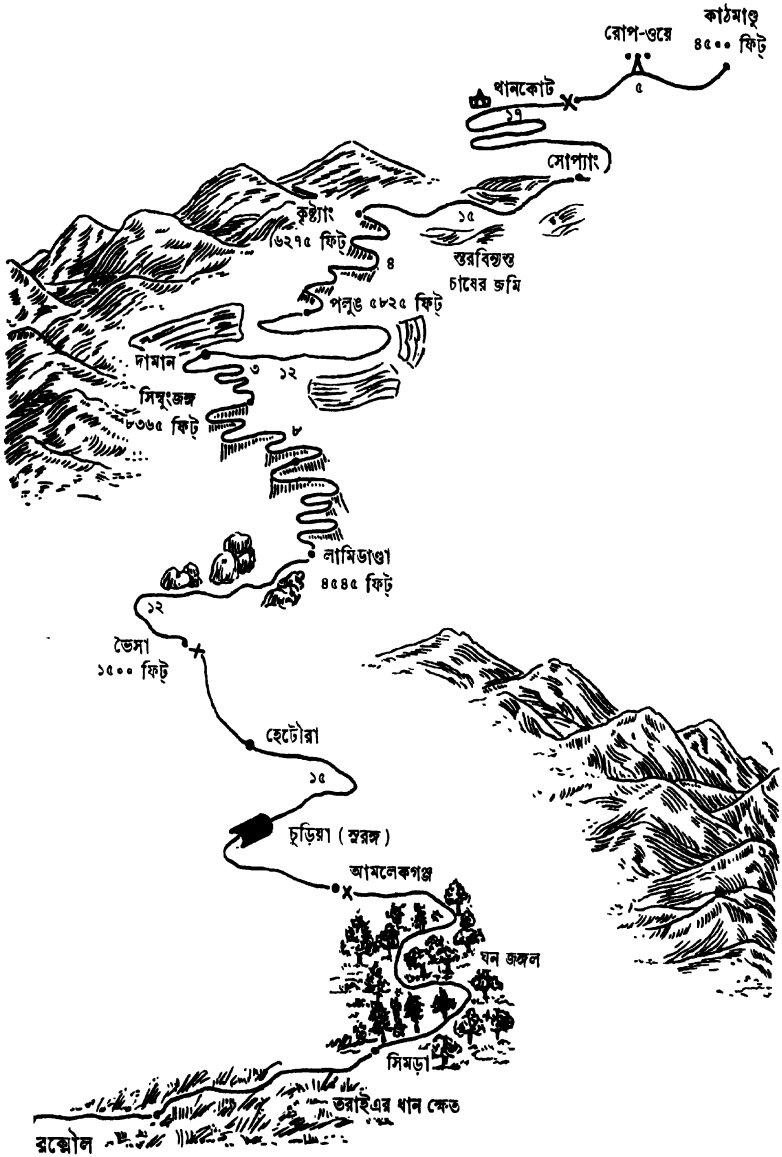
হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু
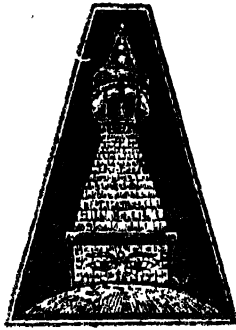
॥ ১ ॥

হাওড়া ষ্টেশনের সাত নম্বর প্লাটফরম। রাত ১০-৪৫ মিনিটে এখান থেকেই মিথিলা এক্সপ্রেস ছাড়বে।

পশুপতিনাথের উদ্দেশে চলেছি।

এখান থেকে রক্সৌল পর্য্যন্ত ভারতীয় রেলপথে, পরে রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জ, নেপালের রেলপথে—ওখান থেকে বাসে পাহাড় পথ ধরে কাঠমাণ্ডু যেতে হবে।

কলকাতা থেকে আমলেকগঞ্জ রেলপথে ৪৭৫ মাইল। বাস পথটুকু ১০২ মাইল। সমস্ত পথটা যেতে পুরো দু'দিন আর দু'রাত্রি লেগে যায়।

যন্ত্রের যুগ বলতে বোঝায় গতির যুগ। শম্বুকের ধীর মন্থর গতি এ যুগে অচল আর পীড়াদায়কও বটে।

শুনেছি পথের অপরূপ সৌন্দর্য্যের কাছে হার মেনে যায় সমস্ত পথ কষ্ট। কোন কষ্টই কষ্ট বলে মনে হয় না তাই একঘেয়েমী আর পথ কষ্ট থাকলেও গতিকে ছেড়ে অগতিরই শরণ নিয়েছি।

"নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবে ঃ॥"

অতন্দ্র আদিত্যদেব—কালচক্র পথে ধাবিত হয়ে রচনা করে চলেছেন কলা, কাষ্ঠা, দণ্ড প্রহর। অহোরাত্র চলেছে এই পরিক্রমা। পথিক! ঘুমিয়ে থাকলে চলবেনা। কর অন্বেষণ, চল এগিয়ে, চল উত্তুঙ্গ মার্গে। চলুক তোমার পরিক্রমা, চলুক অনুক্ষণ।

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে।"

তোমার প্রাণের গোপন মানুষটিকে কাজের পাকে বেঁধে রেখ না। সংসার গণ্ডীর মোহ ছেড়ে বেরিয়ে এস পথে। দেউলে করে রেখ না রূপাভিসারী ক্ষুধিত আত্মাকে। ওঠ মেতে শুদ্ধ রূপসম্ভোগে।

উন্মোচন কর প্রকৃতির অবগুণ্ঠন। লুটে নাও তার যা কিছু রূপসুধা আর ঐশ্বর্য্য সম্ভার। ব্রীড়াবনতা লীলাময়ীর রক্তরাঙা অধর পুটে এঁকে দাও প্রগাঢ় চুম্বন। বেধে নাও দৃঢ় আলিঙ্গনে।

"আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়
আনন্দ আছে নিখিলে।"

চল এগিয়ে আনন্দের সন্ধানে। থেক না বঞ্চিত হয়ে পরমধন থেকে। পথের ধূলোই হোক তোমার ব্রজরজঃ।

পূজার ছুটিতে প্রচণ্ড ভীড়। সমস্ত ষ্টেশনটা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যত না ভীড়, ব্যস্ততা তার চেয়ে অনেক বেশী।

গাড়ী তখন প্লাটফরমে আসেনি। জনতার কলকোলাহলে

চারদিক মুখর হয়ে উঠেছে। বিঘোষক যন্ত্রে শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠ। প্রচারিত হচ্ছে খবর বার্ত্তা। গাড়ীর নাম, নম্বর, প্লাটফরম আর সময়ের কথা জানিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝেই যাত্রীদের সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেল আট নম্বর প্লাটফরম থেকে মিথিলা এক্সপ্রেসের একটা ডুপ্লিকেট ও ছাড়বে। যাত্রীদের দুটো গাড়ীতে ভাগাভাগি হয়ে যাবার জন্য অনবরত অনুরোধ জানান হচ্ছে। তাতে ভাড়টা কিছু কমবে।

ভীড় কমা তো দূরের কথা, ক্রমে তা বেড়েই চলল। ডুপ্লিকেটের দিকে কেউ ই এগোচ্ছেনা।

গাড়ীটা এগিয়ে আসছে। প্লাটফরমে ঢোকার আগেই যাত্রীদের মধ্যে হৈ হৈ লেগে গেল। কে কার আগে ঢুকবে এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, রক্তপাত এমন কি মূর্চ্ছাও গেল কেউ কেউ।

ভীড়ের চাপে কোথায় যে ছিটকে পড়েছি বুঝতে পারছিনা। সঙ্গীরা কেউ কাছাকাছি নেই।

সুরুতেই কুরুক্ষেত্র, বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

ভীড়টা হাল্কা হলে পর কামরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সঙ্গীরা সবাই বহাল তবিয়তে আছে।

ধীরে সুস্থে গাড়ীতে উঠে বসলাম। মালপত্রগুলো গোছগাছ করে রাখলাম। শ্বাস প্রশ্বাসে কামরাটা বিষাক্ত বায়ুতে ভরে উঠেছে। প্লাটফরম ছেড়ে গেলে বাঁচি।

কাঠমাণ্ডুতে মানবকে একটা তারবার্ত্তা পাঠিয়ে দিলাম। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য মেলে এমনি একটা হোটেল যেন ঠিক করে রাখা হয়। আমরা চৌদ্দজন যাচ্ছি, কোন বাধা বিপত্তি না হলে তৃতীয় দিনের রাত্রির

প্রথম প্রহরেই পরিচয় হবে কাঠমাণ্ডুর মাটিতে। রক্সৌলে, রাজেশ্বর বাবুকেও অমনি জানিয়ে দিলাম।

কামরাটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। নীরু জানালার ধার ঘেঁসে বসেছে। শুচি আর অঞ্জনা মুখোমুখি দুটো আসন দখল করেছে। অমিত পার্টিশনের ওপারে রয়েছে। খুকু ইতিমধ্যেই বাঙ্কের উপর উঠে পড়েছে।

আর সকলে দুটো বেঞ্চের ফাঁকে মালপত্র সাজিয়ে চক্রাকারে গোল হয়ে বসেছে। গাড়ীটা ছাড়লে ওরই ওপর গড়াগড়ি দেবার মতলব এঁটেছে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্য কত আয়োজন।

ড্রাইভার প্রস্তুত হয়ে আছে। সঙ্কেত পেলেই এঞ্জিনটা চালিয়ে দেবে।

পথ পরিষ্কার! ষ্টার্টিং সিগন্যালটাও ওই সঙ্কেতই দিচ্ছে।

যাত্রীরা সব অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজল।

ফুর্‌-র-র-র-র গার্ডের বাঁশীটাও বাজল। সবুজ আলোটা গার্ডের হাতে দুলতে লাগল।

প্রচণ্ড আর্ত্তনাদে ফেঁটে পড়ল এঞ্জিনটা।

সমস্ত আলস্য কাটিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সচল প্রাণবন্ত হয়ে উঠল গাড়ীটা।

হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে একটা কি দুটো পাক খেয়েই হুস করে থেমে গেল চাকাগুলো।

গার্ড ওর কামরা থেকে নেমে এসেছেন। মুখমণ্ডলে বিরক্তির ছাপ।

কে যেন চেনটা টেনে দিয়েছে।

অস্থির পদক্ষেপে এদিক ওদিক করে, ফিরে গেলেন নিজের কামরাতে।

কানে ভেসে এল দুটো কথা "গির গ্যায়া।"

সর্ব্বনাশ! কেউ কি গাড়ীর নাচে পড়ে গেল? বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

একটা কোন্ ঘেসে জনতার ভীড় হয়েছে। ঐদিকে এগিয়ে গেলাম।

শুধু একপাটি জুতো! গাড়ীর নীচে চলে গেছে।

হায়রে কপাল! একপাটি জুতো নিয়ে এতবড় একটা প্রহসন হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ডাকে ঐ—ডাকে পথ: ডাকে ঐ অভ্রংলেহী তুষার চূড়া। শোন কান পেতে, একমনে, সমাহিত চিত্তে। নিশ্চয়ই চঞ্চল হয়ে পড়বে ঐ ডাকে। কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না ঐ আকুল আহ্বান। দুর্বার আকর্ষণ ঐ তুষার কিরীটীর। আকাশচুম্বী ঐ হিমমৌলী আচ্ছন্ন করে ফেলবে তোমার প্রাণ সত্ত্বাকে। বিস্তার করবে ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব। মোহমুগ্ধ হয়ে পড়বে মরীচিকার মায়ায়। স্বীকার করতে হবে বশ্যতা। দেখবে, কখন আটকে গেছ ওর ফাঁদে।

গাড়ী চলতে স্থুরু করেছে। বেরিয়ে এল প্লাটফরম ছেড়ে। লিলুয়া, বেলুড়, বালী মিলিয়ে গেল পিছনে। দ্রুততর হল গতিবেগ।

রাত্রির অন্ধকারে, অপচ্ছায়ার মত পার হয়ে যাচ্ছে ষ্টেশনগুলো।

চাকার ঘর্ষনে আর্ত্ত লৌহবর্ত্ম প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে অবিরত।

সহরের আলো-আঁধারের সীমানা পার হয়ে ছোটখাট ষ্টেশন-গুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মুক্ত প্রান্তরের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে যন্ত্রযান।

ঘর্ষন স্পৃষ্ট চাকার আর্ত্তনাদে যাত্রীদের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এল।

একটু আরামের আশায় শুচি আর অঞ্জনা অযথাই চেষ্টা করল। বিধি হলেন বাম, সুখ ওদের কপালে নেই। বসে বসেই, ঢুলে ঢুলে আর ঝিমিয়ে রাতটা কাটাতে হল।

লাগ ভেল্কী লাগ।

গাড়ীর ঝাঁকুনি যাদুকরের মন্ত্রের মত কাজ করছে। সবার অঙ্গে নেমে এল অলস অবসাদ। একটু রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল যাত্রীর ঢুলুনি সুরু হল।

কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ছুটে চলেছে মিথিলা এক্সপ্রেস।

সুপ্তির প্রশান্তি নেমে এসেছে যাত্রীদের চোখে। গতিবেগের দোলায় সমস্ত কামরাটা ঘুমিয়ে পড়ল।

সুসুপ্তিতে মগ্ন হল বিশ্বচরাচর।

জেগে রইল শুধু আকাশে রাতের প্রহরীগুলো। কান পেতে রইল ধরিত্রীর বুকে। শুনছে তার ধমনী স্পন্দন।

মনে নেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কোন একসময়। আকস্মিক ঝাঁকুনিতে উঠে বসলাম। ঘড়ির কাঁটা এসে পড়েছে তিনটার কোঠায়।

গাড়ী ব্যস্তচঞ্চল দুর্গাপুর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে।

সামান্য একটু জায়গার জন্য যাত্রীরা ছুটোছুটি করছে। কামরার ভেতরে যাত্রীরা কানে তুলো গুঁজে বসে আছে। ওরা বধির, মমতাহীন। লাঞ্ছিত বাইরের যাত্রীদের জন্য কোন সহানুভূতি নেই।

হঠাৎ কেমন করে এক ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন কামরার ভেতর। যারা ভেতরে বসেছিলেন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন নবাগতকে। কাঁটার পর কাঁটা বিঁধিয়ে অস্থির করে তুললেন।

স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতায় নির্লজ্জ ভাবে খসে পড়েছে ভদ্রতার মুখোস।

আধো জাগা আধো ঘুমে ভোর হয়ে গেল। মধুপুর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে মিথিলা এক্সপ্রেস। ঝম্ ঝম্ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল ডুপ্লিকেট টা।

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলাম। রাত্রি জাগরণে সবারই মুখাবয়ব রুক্ষ হয়ে পড়েছে। ক্লান্তির ছাপ সবার চাহনিতে। থমথমে ভাব অঞ্জনার ব্যবহারে।

অঞ্জনা অসীমাকে ফিরে যাবার জন্য বলছে। এ কষ্ট ও সহ্য করতে পারবে না।

ওর কাছে গেলাম। অঞ্জনা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার মাত্র চেয়ে দেখল।

ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বলি—কষ্ট স্বীকার করতে হবে জেনেই ত পা বাড়িয়েছ। "ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" চলই না দেখা যাক শেষ কোথায় ?

ও! অঞ্জনার স্বরে অবজ্ঞার ভাব প্রকট হয়ে উঠল। তবুও সাহস সঞ্চয় করে আবার বললাম—বিশ্বজোড়া রূপের ফাঁদ পেতে রেখেছেন বিশ্বস্রষ্টা। চলেছ হিমালয়ের অন্তরের মধু চয়নে। দু'চারটা হুল বিঁধেই যদি ক্ষতি কি ?

আপনার কথাগুলো কিন্তু কাব্যেই শোভা পায়। শ্লেষ তিক্ত অঞ্জনার স্বর।

আবারও আশ্বাস দিতে পিছ পা হলাম না। বললাম—না, না অসহিষ্ণু হয়ো না। সাহস আন। এত অল্পেতে হতাশ হলে চলবে কেন ?

অঞ্জনার গঞ্জনা এবার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

বিচলিত না হয়েই তবু বলি—দেখ, উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। সবদিক স্থির চিত্তে ভেবে দেখ তারপর ফিরে যাওয়াই যদি তোমার শেষ কথা হয় তবে রুখবে কে ?

সামান্য কিছুটা থেমে আবার বললাম—দেখ রক্তে বইছে তোমার অশান্ত উষ্ণ স্রোত, তবুও ঠিক এমনটি আশা করিনি।

তবে বলতে তুমি পার। তোমার বয়স থাকলে সারা পৃথিবীটাকে আমিও ঠিক এমনি করেই ধমকাতাম।

অঞ্জনা গুম হয়ে বসে রইল।

চায়ের অভাবে সতীর মেজাজটা একদম সপ্তমে চড়ে আছে। চা-ভেণ্ডারকে ডেকে নিয়ে এল কামরার ভেতরে। ভাঁড়ের চা, তাই সই। ওতেই আলস্য আর জড়তা কাটাতে হবে।

জান ত কথায় আছে "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।" দুধের সাধ ঘোলেই মেটাও।

খেয়াল করিনি গাড়ী কখন চলতে সুরু করেছে। জসিডি, শিমুলতলা পার হয়ে গাড়ী দাঁড়াল ঝাঁঝাঁতে।

রেস্তোঁরা থেকে খাবার এল।

অসিতের দিকে তাকালাম—কি হে ব্যাপারখানা কি ? এত আয়োজন কে করল ?

আচ্ছা ভুলো মন তো তোমার! মধুপুরে তুমিই না গার্ডকে বলে দিলে আর তুমিই ভুলে বসে আছ ?

খেয়ে বেশ তৃপ্তি হল সবারই।

মিষ্টি মুখ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ল। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি আর বিষণ্নতার ছাপ লুকাল কোথায়, কোন যাতু কাঠির স্পর্শে।

খুসীর আমেজে ডগমগ সব।

আবহাওয়াটা বেশ অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে।

কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে সকল সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললাম—একটা ঘটনা বলছি শোন।

সকলের সোৎসুক দৃষ্টি আমাকে ঘিরে ধরল।

জোর তাগাদা এল, চটপট বলে ফেলুন।

সুরু করলাম—তোমাদের মতই এমনি একটি বড় দল একবার বেড়াতে বেরোবে বলে ঠিক করল। দায়িত্ব চাপল আমারই মত এক নিরীহ গোবেচারার কাঁধে।

অঞ্জনা বাধা দিল।

আপনি আবার গোবেচারাটি হলেন কবে? সব সময়ই তো ধমকাধমকি আর কর্তৃত্ব ফলাও করে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত থাকেন।

বাব্বাঃ! এই যদি গোবেচারার নমুনা হয় তবে চালাক চতুরের নমুনাটা না জানি কি?

শুচি অঞ্জনার উপর চড়াও হয়ে স্নেহমাখান ভর্ৎসনার সুরে বলল, বলতে দাও না, মাঝপথে টীপ্পনি কাটছ কেন? হয়ত এক্ষুনি রেগে মেগে বলে বসবেন, আর ত মনে নেই। স্রেফ ভুলে গেছি।

আমার দিকে ফিরে বলল—আপনি চালিয়ে যান।

"মনসা মথুরাং গচ্ছতি।"

যাত্রা সুরু হতে বাকী আছে কিন্তু এর মধ্যেই সবার মন চলতে সুরু করেছে।

তোমাদের তো এরকম অবস্থার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বুঝতেই পারছ এই সময়টায় মনের অবস্থা কিরকম হয়।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে খুকু বলে উঠল—বুঝতে আবার পারছিনা ? খুব বুঝতে পারছি। খাঁচার পাখীর মত মনটা তখন উড়ু উড়ু করতে থাকে। চোখ দুটো থাকে নীল আকাশের শূন্যলোকে।

কিন্তু জানত একটা প্রবাদ আছে, "Many a slip between the cup and the lips." অধরের সঙ্গে মিলিত হয়েও চায়ের পেয়ালা ভূপতিত হয়ে যায় অনেক সময়।

হল ও কিন্তু তাই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত।

সেদিন শনিবার। পরদিন থেকে এক নাগারে কয়েক দিন ছুটি। ভদ্রলোক টেবিলে বসে তখন কাজগুলোকে শেষ করবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত। উঠে পড়ে লেগেছেন। মোটামুটি সব গুছিয়েও এনেছেন। টেবিলটা প্রায় খালি।

ভদ্রলোক একটা আরামের হাই তুললেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ফাইলের দিকে মন রেখে প্রায় অন্যমনস্ক ভাবে রিসিভার টা তুলে নিলেন কানে।

আগামী যাত্রাপথেরই সঙ্গী একজনের গলা শুনতে পেলেন।

এ সময়ে যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করতে কে না ভালবাসে ? ভদ্রলোকের মুখে তখন হাসি আর ধরেনা।

কথার আদান প্রদান চলতে থাকল। হা হতোস্মি ! ভদ্রলোকের মুখটা প্রথমে গোমরা, পরে কাল হয়ে গেল।

সতী প্রশ্ন করে বসল, কেন—এমনটি হবার কারণ ?

পরের টুকু শোন তাহলেই বুঝতে পারবে সব।

কি আর করেন ভদ্রলোক। ফোনটা রেখে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

কি হ'ল ? অফিসের সহকর্ম্মীরা এসে প্রশ্ন করতে লাগলো—কোন খারাপ খবর নাকি ?

হু—একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে আড়ষ্টের মত বসে রইলেন ভদ্রলোক। ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। ছুটিটা কি তবে মাঠে মারা যাবে ?

নাঃ ! ঝাড়া দিয়ে উঠলেন অমনি। কাজগুলো যা বাকীছিল শেষ করে ফেললেন। অফিস থেকে বেরিয়েই সঙ্গীদের বাড়ী বাড়ী ছুটলেন। একত্র জড়ো করলেন সবাইকে। মতামত চাইলেন। একই স্থরে বাঁধা সব। সবার ঐ একই কথা—এবারকার মত যাত্রা বন্ধ।

ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে বললেন—তবে তোমরা থাক আমি যাবই।

আমি চলে যাব আর ওদের কোথা ও যাওয়া হবে না—সহজেই অনুমান করতে পার কথা কয়টা সঙ্গীদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। খুকুকে শুধোলাম—বলতে পারকি ওদের চেহারাটা তখন কেমন হ'ল ?

হ্যাঁ,—খুব পারি। ফোনটা তুলে অফিসে ভদ্রলোকের যেমনটী হয়েছিল ঠিক তেমনটী। বেশ জব্দ করলেন ত ভদ্রলোক সবাইকে। খুকু হাসিতে ফেটে পড়ল।

কথাগুলো সবাই যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে মনে হ'ল।

কিছুটা থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলাম—আসল কথাটা হচ্ছে কি সঙ্গীরা সব ভদ্রলোককে বরদাস্ত করতে পারে না। কারণ ওর চরিত্রে সব সময়েই নাকি দাম্ভিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠত। ওর এটা এক মস্ত বড় ক্রুটী।

ক্রুটী ! কই, এতক্ষণ যা বললেন তাতে ভদ্রলোকটিকে ত খুব দৃঢ়চেতা আর স্পষ্টবাদী বলেই মনে হল। অমনি আবার যোগ করল, এমনি ক্রুটি সবারই থাকে। এতে আপত্তি করলে ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে।

সতীর স্বরে ভদ্রলোকের উপর পক্ষপাতিত্ব আর মমতামাখান সহানুভূতি জেগে উঠল।

অঞ্জনা সন্দিগ্ধভাবে বড় বড় চোখ করে তাকাল। প্রশ্ন করল, শেষ পর্য্যন্ত যাত্রাটা হল ত ?

বললাম—তা হ'ল। নেহাৎ অনিচ্ছায় ভদ্রলোকের গুরুগিরি সহ্য করবে এই মনস্থ করে অগত্যা সবাই বেরিয়ে পড়ল তুর্গা তুর্গা বলে

চারদিকে অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। একে অপরের কানে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করল কিছুক্ষণ। খুকু শেষটুকু শোনার জন্য অস্থির। অধীর ভাবে প্রশ্ন করল নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা শেষ করে ওরা ফিরে এলেন ত ?

অঞ্জনা খুকুকে ধমকে উঠল। বোকা মেয়ে এখনও বুঝতে পারছনা। আমাদেরই যাত্রা নিয়ে এত যে খটমট হয়ে গেল এটা তারই ইঙ্গিত।

সতী বলে তাই নাকি !

শ্বেতা বলে তাই নাকি ! সবাই বলে তাই নাকি !

মনে মনে সবাই তখন ঘটনাটা পূর্ব্বাপর আউড়ে নিল। হুবহু এক।

ধ্যাৎ, সব ধাপ্পাবাজী !

অঞ্জনা আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে সন্দেহের কটাক্ষ হেনে চেয়ে রইল।

হা হা হি হি হো হো—আচমকা হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। হাসি আর থামতে চায় না। ওদের সামলান দায়। কামরার সকল যাত্রীরা হতবাক্। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

এই ত ভাল—বেশ, হাস, যত পার হাস।

আমরা এমনি এসে ভেসে যাই
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুম গন্ধ রাশির মতন।
হাওয়ার মতন, নেশার মতন
ঢেউ এর মতন এসে যাই ॥

তাই বলি হাস। এমনি হাসি লেগে থাকে যেন সারাটা পথ।

গাড়ী এসে দাঁড়াল আবার লক্ষ্মীসরাইয়ের প্লাটফরমে। অনেকক্ষণ পরে এগিয়ে চলল ধীর মন্থর গতিতে।

থৈ থৈ করছে জল। অগাধ জলরাশি লাইনের দুধারে।

মাঠ ক্ষেত ভেসে গেছে। জলে জলময় চারিপাশ। অতি বৃষ্টির

ফলে গঙ্গার বাঁধ ভেঙ্গে জল মাঠে ঢুকে পড়েছে। সর্ব্বনাশা বন্যায় ভেসে গেল মুঙ্গেরের শত শত গ্রাম। প্রকৃতির বিধ্বংসী লীলার কবলে পড়ে নষ্ট হল বহু প্রাণ। ভেসে গেল কত গৃহপালিত পশু আর জীব জন্তু। প্রচুর ক্ষতি হল শস্য সম্পদের। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল রেলপথ।

লাইন মেরামতের পর মাত্র কয়েকদিন হল রেল চলাচল সুরু হয়েছে। কাঁচাপথে গতিবেগ বাড়ান সঙ্কটজনক তাই এ ঢিমে তাল।

ধ্বংসের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে চারদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। বেগ মন্দীভূত করে গাড়ী তাই চলেছে অতি ধীরে।

গঙ্গার ওপর চাপান হয়েছে লোহা আর পাষানের বোঝা। ওর বুকে রেল পেতে তৈরী হয়েছে নূতন পথ, যুক্ত করেছে উত্তর আর দক্ষিণ বিহারকে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি, শুধু আমি নই আরও অনেকে। সেতুর উর্দ্ধাঙ্গটুকু দৃষ্টিপথে ধরা দিল। কৌতুহলী মন নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে খুকু। গোপালকে ত সামলে রাখাই দায়। বার বার গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে জানালার বাইরে।

রেলপথ ক্রমেই উচুতে উঠে চলেছে। হঠাৎই এক সময় ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে এঞ্জিন সেতুর উপর উঠে পড়ল।

"দেবী সুরেশ্বরা ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে॥"

মন্দ্রিত হল প্রকোষ্ঠ যাত্রীদের উচ্চরোলে, "জয় গঙ্গা মায়ী কি জয়।"

কৃষ্ণ বাহাদুর গোপালের হাতে দুটো পয়সা গুঁজে দিল। গোপাল ছুঁড়ে দিল গঙ্গা মায়ের গর্ভে। এমনি পয়সা ছুঁড়ে দিল অনেকেই।

যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সামনেই বারৌণী জংশন। ব্রডগেজ রেলপথের শেষ। আবার চাপতে হবে মিটার গেজের গাড়ী।

অনেকটাই দেরী হল পথে।

গাড়ী যখন বারৌণীতে এল তখন বেলা ঠিক এগারটা।

মূল মিথিলা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা না করে ডুপ্লিকেট ট্রেণটার যাত্রী নিয়ে মিটার গেজের গাড়ী বেলা দশটায় বেরিয়ে গেছে। ও গাড়ীটা ধরতে পারলে, রক্সৌলে চলে যেতাম ঠিক রাত সাড়ে আটটায়। এ অবস্থায় কখন কিভাবে পৌঁছব কে জানে!

উপায়?

ভেবে আর কি হবে। চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিলাম অদৃষ্টের হাতে।

মুটের মাথায় মালের বোঝা চাপিয়ে এগিয়ে চললাম মিটার গেজের প্লাটফরমে।

"হ্যালো"—শুনবেন একটু?

প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিলেন ইউনিফরম পরা এক রেল কর্ম্মচারী।

ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলুন কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যাত্রাপথের নিগ্রহ আর বিপর্য্যয়ের কথা টুকু বললাম। কাঠমাণ্ডু যাব বলে বেরিয়েছি। আসছি কলকাতা থেকে। মিথিলা এক্সপ্রেস পথে দেরী করে যত বিড়ম্বনা বাধিয়েছে। রক্সৌলের গাড়ী ত দেখছি চলে গেছে।

বলুন ত, কি সুবিধাজনক উপায়ে চলে যেতে পারি আমরা গন্তব্য স্থলে।

ও নিশ্চয়ই,—কিছু ভাববেন না। চলুন আমার সঙ্গে, টাইম টেবল দেখে সব বলে দিচ্ছি। হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

ভদ্রলোকের সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।

পাতাগুলোকে উল্টে পাল্টে অনেক দেখে শুনে বললেন—ঐ যে চার নম্বর প্লাটফরমে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে ওটাতেই চেপে পড়ুন।

সমস্তিপুর হয়ে ওটা যাবে মজঃফরপুর তক। পৌঁছবে রাত আটটা নাগাদ।

তারপর রাত এগারটার গাড়ী ধরে যাবেন সগৌলী। গাড়ীটা প্লাটফরমেই দাঁড়িয়ে থাকবে, অসুবিধা হবেনা কিছুই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বললেন—

কিন্তু ভাবনা হচ্ছে সগৌলী নিয়ে। একে ছোট ষ্টেশন, তায় পৌঁছবে একটা বিশ্রী ক্ষণে, রাত দুটোয়।

তখন কোথায় কুলি, কোথায় গাড়ী—অস্থির হয়ে পড়বেন। ওটাই ভাববার কথা। কোন বিপর্য্যয় না হলে অবশ্য পৌঁছে যাবেন রক্সৌলে শেষ রাত্রি চারটায়।

সগৌলীতে রাত দুটো! চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। নিতান্ত অসহায়ের মত বললাম কি আর করা যাবে? উপায় যখন নেই তখন ঐ ব্যবস্থাই করতে হবে।

বিপদটা যেন নিজেরই—এমনি ভাবখানা। ভদ্রলোক বললেন—উপায় অবশ্য একটা আছে তবে ওটা আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে কিনা কে জানে। আবার টাইম টেবলের পাতা উল্টে পাল্টে ভদ্রলোক এক লম্বা ফিরিস্তি দিলেন।

সমস্তিপুরে এ গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়বেন দ্বারভাঙ্গার গাড়ীতে, ওটা পৌঁছবে দ্বারভাঙ্গায় রাত ১০টায়। সঙ্গে সঙ্গেই রক্সৌলে যাবার গাড়ী পাবেন, পৌঁছে যাবেন ভোর পাঁচটা নাগাদ।

ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলাম মালপত্রের কাছে।

যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন।

অত শত ভেবে চিন্তে আর কাজ নেই। রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জের গাড়ী ছেড়ে যাবে ছ'টায়। দ্বারভাঙ্গার পথে সামান্য একটু হেরফের হলে ভেস্তে যাবে সব।

স্থির করে ফেললাম সগৌলী হয়েই যাব।

কৃষ্ণবাহাদুর আর গোপাল সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত মুখে কুটোটিও কাটেনি। প্রায় আদেশের ভঙ্গিতেই বললাম—

যাও স্নান টান কর। ছেলেটাকে কিছু খাইয়ে দিয়ে এস আর নিজেও কিছু মুখে দাও।

আর ছ্যাখো, অমনি ফেরার পথে খবর নিয়ে আসবে সঙ্গীরা সব কোথায় ?

কৃষ্ণবাহাদুর আর গোপাল চলে গেল। মালের পাহারায় চুপচাপ বসে রইলাম।

ওরা ভাত খেলনা। লুচি পুরিতে জঠরের ইন্ধন যুগিয়ে ফিরে এল পিতাপুত্র। খবর নিয়ে এল, স্নান আর প্রসাধন সেরে সঙ্গীরা সব ভোজনাগারে ঢুকেছে।

ওরা যে ওখান থেকে শিগগীর বেরিয়ে আসবে এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

এদিকে গাড়ী ছাড়বার সময়ও ঘনিয়ে এলো। মুটেরা মালপত্র মাথায় তুলে নিয়ে অযথাই ছুটোছুটি করতে লাগল। হয়রান, গলদঘর্ম্ম হয়ে পড়েছে।

কা কস্য পরিবেদনা! ন স্থানং তিলধারনম্। ঠাঁই নেই কোন কামরাতেই।

"বাবু, বাবু" বলে একটা মুটে ইসারায় ডাকল।

এই বিষম পরিস্থিতিতে একদম তেতো বিরক্ত হয়ে পড়েছি। ধমকে উঠলাম, অযথা বিরক্ত করছ কেন ?

কি চাই বল ? যেমন করেই হোক মালগুলো তুলে দাও। মাল উঠে গেলে একটু যায়গা করে নেওয়া যাবেই।

নাও, নাও, জলদি কর, বখশিশ পাবে।

না বাবু—বলছি কি, এ গাড়ীটার সঙ্গে তিনটা নূতন বগি জুড়ে দেবে। যদি ওতে ওঠেন তবে আরামেই যেতে পারবেন মনে হয়।

আরে, তাই নাকি ! এতক্ষণ বলনি কেন ? ঐ ব্যবস্থাই হোক তবে।

এঞ্জিনটা বগিটাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

কৃষ্ণ বাহাদুরকে বললাম—যাও সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে এস। ততক্ষণে আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি।

বিনা কষ্টেই উঠে পড়লাম।

গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এমনি সময় এলেন সবাই।

নীচে থেকেই কৈফিয়ৎ নেবার ভঙ্গিতে অমিত জিজ্ঞাসা করল—সন্ধ্যা ছ'টায় লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসে গেলেই ত হ'ত। দিব্যি খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া যেত এখানে।

একটু বেসুরো ভাবেই বললাম—দেখ, বাক্‌বিতণ্ডার সময় পাবে প্রচুর। আর দেরী নয়, উঠে পড় চট্‌পট্‌।

এ ব্যবস্থায় কেউ যেন সন্তুষ্ট হ'ল না।

কামরাটায় আমাদের পিছু পিছু আরও অনেক স্থানীয় যাত্রী এসে ঢুকল।

পাইপটায় বেশ ঠেসে কিছুটা তামাক ভরে আরাম করে নিশ্চিন্তে টানতে লাগলাম।

জনকয়েক নব্যযুবক আমাদের মুখোমুখি বেঞ্চটা অধিকার করে বসেছে। পোষাক পরিচ্ছদে বেশ ছিম্‌ছাম। ওরা বেশী দূর যাবে না। সামান্য পথটুকু কাটিয়ে দিতে চায় উষ্ণ উত্তেজনায়। দল বেঁধেই উঠেছে ওরা।

ওদের মধ্যেই একজন ভাগলপুর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, বেশ মার্জ্জিত আর রুচিবান বলেই মনে হচ্ছে। সাধারণের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে ওর পোষাকে। ফরসা ধুতি, চাদর আর পাঞ্জাবীতে ওকে বেশ মানিয়েছে।

ওরা মেতে উঠেছে রাজনীতির চর্চ্চায়। বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতিই ওদের মুখ্য বিষয় বস্তু।

খৈ ফুটছে সবার মুখে। চায়ের পেয়ালাতে ঝড় উঠেছে। ওদের তর্ক তুফানে কামরাটা সরগরম।

তর্কটা বেশ জমে উঠেছে।

সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই ওরা মীমাংসা করতে চাইছে, সারা ছুনিয়ার সমস্যা। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে আলোচ্য বিষয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে অন্যপ্রসঙ্গে। গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা অথচ অতি হাল্কাধরণের কথাবার্ত্তা।

সাবাস্! নব্য ভারতের ভাবুক চিন্তাশীল যুবক।

ওদের তর্কের মূলাধার হচ্ছেন, ঐ অধ্যাপক।

ওরা তর্ক করল অনেক, চিন্তা করল নানাধরণের, অবতারণা করল বহু সমস্যার। সমাধান ও করে ফেলল বিনা আয়াসে।

ওরা বাজেট পেশ করল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার। খুঁটিনাটি বিষয়ে খুঁতখুঁত ধরল অনেক।

কি নেই ওদের আলোচনায়? আছে চীনের সীমানা লঙ্ঘন, নন-এলাইনড্ নেশনের ধুরন্ধরদের বেলগ্রেড কনফারেন্স, উরী গ্যাগারিণের রকেটে বিশ্বপরিক্রমা, পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা এমনকি মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ।

অধ্যাপক একাধারে বক্তা, জুরি, বিচারক, সব কিছু।

বিচিত্র এদের আলোচ্য বিষয়। সমস্ত বিশ্বসমস্যা এসে জটলা পাকিয়েছে ওদের ওষ্ঠপুটে। যে সমস্যা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে বিশ্বের সেরা ধুরন্ধরেরা, ওরা তারই সমাধান করে দিল এক লহমায়।

পাইপের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আমার চিন্তাগুলো। ওদের তর্ক থেকে মন তুলে নিতে হল।

সামনের পথটুকুর কথা চিন্তা করে ভরসা হচ্ছিল না কিছুই। তবু কোন অঘটন আশঙ্কা করিনি। কোন রকমে নিশ্চয়ই চলে যাব রক্সৌলে। এ ধৃষ্টতা দেখে, নেপথ্য থেকে ভাগ্যবিধাতা হয় ত হেসে

ছিলেন। এত যে কষ্ট সঞ্চিত হয়েছিল ভবিষ্যতের পথটুকুর মধ্যে কে তা জানত? তবুও বলি, তুমি মঙ্গলময়!

সামান্য কিছুকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

লক্ষ্য করলাম ওদের তর্ক অন্য পথ ধরে এগোচ্ছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কথাবার্ত্তা। আগামী নির্ব্বাচনের সাফল্য নিয়ে ওরা ভবিষ্যৎবাণী করে ফেলল।

অমিত ও ওদের তর্কে যোগ দিয়েছে। সুযোগের মুহূর্ত্তে ওর কম্যুনিষ্ট ঘেঁষা মতবাদগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সমস্ত কামরাটা উৎসুক আগ্রহে কান পেতে রয়েছে ওদের দিকে।

দুঃখ রইল, আলোচনা চক্রের শেষ পরিণতি হবার আগেই এসে গেল বাচ্ওয়ারা ষ্টেশন। ওরা সবাই নেমে যাবে এখানে।

অধ্যাপক ভদ্রলোকটি বেশ কথাকুশলী। ওর বাচনভঙ্গী আর বিষয়ের অভিনবত্বে বেশ রসাল হয়ে উঠেছিল আলোচনা চক্র।

ওরা নেমে গেল। শেষ হবার আগেই ছেদ পড়ায়, ওদের বিহনে কামরাটা একেবারে নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে।

একে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ তায় আবার মিটারগেজ, সবার উপরে হল নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, সময়ে চলা যার একদম অভ্যাস নেই।

প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে থেমে, টিপ্ টিপ্ করে চলছে। আরও বিপদ, থামলে আবার চলতে চায় না।

এ গাড়ী চলে তার স্বাধীন ইচ্ছায়, যাত্রীদের জন্য কোন দরদ নেই।

মাঝের একটা ষ্টেশনে উঠলেন কয়েকজন যাত্রী। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক আর প্রৌঢ়া এক মহিলা, ওদের সঙ্গে দুটি তরুণী। ওরা

দুজনে স্বামী স্ত্রী, তরুণী দুটি ওদেরই কন্যা। চাল চলনে মোটামুটি সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত বলেই মনে হয়।

অসীমা এগিয়ে গিয়ে মেয়ে দুটির পাশে বসে, এর মধ্যেই কথাবার্ত্তা স্থরু করে দিয়েছে। ওরা সমস্তিপুরে গাড়ী বদল করে দ্বারভাঙ্গা যাবে।

অসীমা বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে চর্চ্চা করে।

বিদ্যাপতিকে জানবার ওর আগ্রহ আছে। কবিকে বিহার-বাসীরা কি চোখে দেখে, কি ধারণা পোষণ করে, জানবার জন্য অসীমা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বোন দুটিকে জিজ্ঞাসা করল বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ওরা কিছু জানে কি না।

ভীষণ বিব্রত বোধ করছে বোন দুটি।

আলোচনাটা সম্ভবতঃ ওদের বৃদ্ধ পিতার কানে গিয়েছিল, তাই উদ্ধার সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

অবতরণিকা সহ স্থরু করলেন—এখন আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি, পুরাকালে এ ভূভাগের কিছুটা ত্রিহুত আর কিছুটা মিথিলা নামে পরিচিত ছিল। মিথিলাপতি জনকের রাজধানী ছিল জনকপুরে; এই জনকপুর এখন নেপালের তরাই অঞ্চল ভুক্ত।

সীতার জন্মভূমি মিথিলা নগরী বলেই রামায়ণে কীর্ত্তিত হয়ে এসেছে। জনকপুরই সেই নগরী। রাম আর সীতার কাহিনী—এই রামায়ণ, যে ভাষাতেই লেখা হোক্ না কেন, ভারতীয় সাহিত্যের এক অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ।

এ মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতির বার্ত্তা। রাম সীতার লীলা কাহিনী, পৌরাণিক ভারতের ঐতিহ্য আর গৌরবময় অধ্যায়ের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

ওঁরা দুজন, আমাদের চিরকালের আদর্শ। ওঁরা মিথিলার নয়, বিহারেরও নয়, ওঁরা সমগ্র ভারতের।

ভদ্রলোক বেশ অভিজ্ঞ। কথাগুলোও বেশ যুক্তিপূর্ণ।

কৌটা থেকে এক খিলি পান মুখে পুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছিলাম যেন ?

অসীমা খেই ধরিয়ে দিল।

ও, হ্যাঁ,—আর বিদ্যাপতি! যার জন্য আপনি এত উদগ্রীব, অথবা কেমন যেন মনে হচ্ছে যাচাই করতে চাইছেন আমাদের জ্ঞানের পরিধি—মাপ করবেন, যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি—এই মিথিলা রাজ্যেই জন্মেছিলেন কবি।

বৃদ্ধের চোখে একটু কৌতুকের ঝলক দেখা দিল।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় বিসপী গ্রামে একটা উচু টিপিকে দেখিয়ে বিদ্যাপতির টিপি বলে গ্রামবাসীরা আজও শ্রদ্ধা জানায়।

অবশ্য এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকেই সন্দেহ করেন যে বিদ্যাপতি বাংলারই কবি ছিলেন। হয়ত কোন কারণে এসেছিলেন মিথিলায় তারপর স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন এখানেই।

হবেও হয়ত তাই। ওর ভাবধারার সঙ্গে মিথিলা বা বিহারের ভাবধারার কোন ঐক্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর কাব্য আর গীতে, বাংলা ভাষার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে।

ওর গীত আর কবিতা দুইই রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, যে রাধাকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈষ্ণব বাংলার উপাস্য ; অথচ সমষ্টিগত ভাবে বিহারের উপাস্য হচ্ছেন ভগবানের অবতার মানুষরূপী রাম আর সীতা।

কথায় কথায় স্বচ্ছন্দে কেটে গেল পথটা। জানতেই পারা গেল না গাড়ী কখন এসে ঢুকে পড়েছে সমস্তিপুরের প্লাটফরমে।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওরা এগিয়ে গেলেন দ্বারভাঙ্গার গাড়ীর দিকে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে এলেও গাড়ী এখানে প্রায় এক ঘণ্টার মতই থামবে।

একটানা বসে থেকে থেকে সবার হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে, তাই

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে ঝারাঝুরি দিয়ে সচল করে নেবার জন্ম প্লাটফরমে নেমে পড়েছে।

লম্বা বেঞ্চটা একদম খালি পড়ে আছে। আরাম করে পা দু'টো ছড়িয়ে দিলাম ওরই ওপর। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দিনের উত্তাপও কমে গেছে, ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছে। বেশ লাগছে।

পাইপটায় বেশী করে তামাক ভরে মৌজ করে বসে দুটো কি একটা টান দিয়েছি মাত্র, এমন সময় নীরু মুখটা কাঁচু মাচু করে এসে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল, ফিরে এলে যে?

শুনেছ কি—এ কামরাটা নাকি এখানে কেটে রেখে দেবে? একটু খোঁজ খবর নিলে হত না? উৎকণ্ঠা জড়ান নীরুর কণ্ঠস্বর।

ধ্যাৎ! যত সব আজব কল্পনা। দুর্ম্মুখের কি কোন সুখবর নিয়ে আসতে নেই? বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে উঠল।

এ কঠিন ব্যবহারে নীরু হয়ত ব্যথা পেল। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর চোখের কোনে মুক্তার মত দু'চার ফোঁটা অশ্রুবিন্দু টলমল করছে।

ওকে এই ব্যথিত, করুণ অবস্থায় দেখে মায়া হল, অনুতাপ ও হল বৈকি। কেন মেজাজটা খারাপ করলাম!

ওকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য একটু মোলায়েম সুরে বললাম, যাও ত, একটু চা টা খেয়ে নাওগে। আমার জন্যও একটু এন। বেশী দেরী কর না যেন। আহত হয়ে, নত নেত্রে নীরু ফিরে গেল।

কৃষ্ণ বাহাদুর ও ঐ একই সংবাদ নিয়ে এল।

আগের থেকেই মেজাজটা বিগড়ে ছিল। ওর কথা শেষ হতে না হতেই খিঁচিয়ে উঠলাম—কৃতার্থ করলে! যাও তবে, ডাক পোর্টার ওঠাও মালপত্র, নিয়ে চল অন্য কামরায়।

ভাগ্য কি সারাটা পথ ধরে শুধু এমনি পরিহাস করবে? কার মুখ দেখে যাত্রা করেছিলাম কে জানে!

কৃষ্ণ বাহাদুর ঝপাঝপ মালগুলোকে টেনে নীচে নামিয়ে দিল। পোর্টাররা ও এসে দাঁড়িয়েছে। মোটের বোঝা ওদের মাথায় চাপিয়ে দিলাম।

অমিত এসে বিস্ময়ে হতভম্বের মত চেয়ে আছে।

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—অমন হাঁ করে দেখছ কি?

কথার ঝাঁঝটা গ্রাহ্য না করেই অমিত বলল—দেখছি তোমার কাণ্ড কারখানা।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম—এ অবস্থায় পড়লে তোমার মাথাও বিগড়ে যেত।

তিষ্ঠ, বন্ধু! প্রথম থেকেই ত রেগে বসে আছ। ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি? তাচ্ছিল্য ভরা অমিতের কথা কয়টা।

বলব কি মাথা আর মুণ্ডু!

ব্যাপারটা খুলেই বললাম অমিতকে।

তা' হলে উপায়? মজঃফরপুর যাই কেমন করে? অসহায়ের মত বড় করুণ শোনাল অমিতের কথাগুলো।

সাহস এনে বললাম—উপায় কিছু নিশ্চয়ই করতে হবে। চল অন্য কামরায়।

এবার অমিতের পালা। খাপ্পা হয়ে বলল—তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য আত্মীয় কুটুম্বেরা সব বসে আছে। ও চেষ্টাটি আর কর না। তার চেয়ে চল দ্বারভাঙ্গা হয়ে যাই, ভীড়ের চাপ থেকে ত বাঁচা যাবে!

সন্দেহের সুরে বললাম—জান, দ্বারভাঙ্গা হয়ে গেলে বেশ কিছুটা দেরীতে গিয়ে পৌঁছবে রক্সৌলে।

তা জানি—উত্তর করল অমিত। তবে দেরী হলেও নেপালের গাড়ী অপেক্ষা করবে বলে মনে হয়।

যদি গাড়ী ছেড়ে যায়, তাহলে কি হবে ভেবেছ কি কিছু?

এবার রুক্ষস্বরেই অমিত উত্তর দিল—অত শত চিন্তা করতে পারি

না। বর্ত্তমানই যেখানে অন্ধকার সেখানে ভবিষ্যৎ চিন্তা করি কেমন করে ?

মুটেরা মাথায় মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর রাজি নয়। শুধুই তাগিদ দিচ্ছে—চল, বাবু চল।

তাহলে দ্বারভাঙ্গা হয়েই যাবে ঠিক করেছ ? গাড়ীটা ছাড়বে কখন ?

এই সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই। যা হয় ঠিক করে ফেল। অমিতের হাবভাবে ব্যস্ততা প্রকাশ পেল।

কিছুক্ষণ থমকে থেকে বললাম, ওখানে যেতে যেতে ও গাড়ীটাও যদি ছেড়ে দেয়, আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। ততক্ষণে হয়ত এটাও ছেড়ে যাবে। পচে মরতে হবে এই সমস্তিপুরের প্লাটফরমে, পুরো একটা দিন।

মনস্থির করে ফেললাম। অমিতকে বললাম—তোমার ও যুক্তিতে আমি রাজী নই। যেমন করে হোক এ গাড়ীতেই যেতে হবে। ডাক সবাইকে।

এর মধ্যে সবাই খবরটা জেনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

ছুটোছুটি করছি, কিন্তু কোন কিনারাই হল না। যদিও বা ওঠা যেত কোন কামরায়, অন্তরায় হল লটবহরগুলো। মালের বোঝা ত নয়, যেন গন্ধমাদন পর্ব্বত !

কোন একটা কামরায় উঠতে যাব অমনি হা হা করে চীৎকার করে উঠছে ভেতরের যাত্রীরা—কোথায় যাবেন, এখানে একটুও জায়গা নেই।

সব দরজা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম।

ষ্টেশন মাষ্টারকে বললাম। ভদ্রলোক কথাটা কানেই নিলেন না।

হয়ত বা দয়া হল গার্ড সাহেবের। জিজ্ঞাসা করলেন—টিকিট কোথায় ?

আচ্ছা মজা ত ! ক্ষুব্ধ স্বরে বললাম—তুমি কি ভেবেছ আমরা বিনা টিকিটের যাত্রী, মুফৎ যাচ্ছি ?

আমাদের কথায় দৃকপাত না করেই ভদ্রলোক বললেন—তবে উঠে পড়, যেখানে খুসি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সম্মুখেই একটা ভেণ্ডার কার ছিল। হুড়-মুড় করে ওটাতেই তুলে দিলাম মালগুলো। ঝপাঝপ্ উঠে পড়ল সবাই।

যাক, কষ্ট একটু হবে, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সতী বাক্স পেঁটারাগুলো একধারে গুছিয়ে রাখল। হোল্ডল-গুলোকে গদীর মত সাজিয়ে দিল। আসন করে সবাই ওর ওপর বসে পড়ল।

আঃ! খাসা আরাম লাগছে। খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। ফার্ষ্ট ক্লাসকেও হার মানিয়ে দিল এই ভেণ্ডার কার।

ধন্য অঘটন ঘটন পটিয়সী! ধন্য তোমার লীলা। আর কত খেলা দেখাবে কে জানে!

এবারকার যাত্রাটাই যেন বাধা আর বিপত্তি দিয়ে স্বুরু হয়েছে। প্রতি পদে বাদ সাধছেন বিধি।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস!

অন্যান্য যাত্রীদের কাছে আমরা এক নির্ম্মম কৌতুকের খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিছু একটা ছল ছুতো করে অযথাই আমাদের সম্মুখ দিয়ে একপাক ঘুরে যাচ্ছে। উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। নেমে যাবার সময়ও একবার করে আমাদের কামরাটার সম্মুখ দিয়ে টহল দিয়ে যাচ্ছে।

এই অভিনব পরিস্থিতিতে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছি।

এমনি করে আর বিশেষ কোন হাঙ্গামার সম্মুখীন না হয়ে গাড়ী মজঃফরপুরে এসে গেল। রাত তখন সাড়ে আটটা।

সগৌলীর গাড়ী ছাড়বে সেই এগারটা পাঁচ মিনিটে। হাত মুখ ধুয়ে, একেবারে খেয়ে দেয়ে আসবে বলে, সঙ্গীরা সব চলে গেল বিশ্রাম গৃহে।

ষ্টেশন ভেণ্ডারের খাবার পছন্দ নয়, একটা রিক্শা চেপে কৃষ্ণ বাহাদুর ও তাই চলে গেল সহরের দিকে। এই অবসরে আমিও কিছু মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিলাম।

কিছুটা পরে কৃষ্ণ বাহাদুর ফিরে আসতেই, ফাঁকা গাড়ীতে মাল পত্র তুলে দিয়ে উঠে বসলাম। সঙ্গীদের জন্য, কিছুটা যায়গা মালপত্র দিয়ে ঘিরে রাখলাম।

এদিকে ওদের কোন পাত্তা নেই। গাড়ী ছাড়বার মাত্র ১০।১২ মিনিট বাকী আছে। এমনি সময় হেলে দুলে এল সুখের পায়রারা।

খালি গাড়ী! খুসি উপ্‌চে পড়ছে সবার।

আরাম করে যাবে বলে এক একটা বেঞ্চ দখল করে নিল এক একজন।

কৃষ্ণ বাহাদুর ভেতর থেকে দরজায় ক্ল্যাচ এঁটে দিল। পর পর দু'চারজন যাত্রী, দরজায় ধাক্কা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়বে, এই আশায় নির্ব্বিকার চিত্তে বসে রইল সবাই।

কথায় আছে—"তুমি যাবে বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে।"

দুর্ভাগাদের কপালে তাই এ সুখ সইল না।

হঠাৎ দরজায় মুহুর্মুহুঃ করাঘাত চলল।

জানালা দিয়ে দেখছি, কয়েকটা ফক্কর ছোকড়া জুটে হম্বি তম্বি করছে, দরজা খুলে দিতেই হবে, নইলে ইট্ পাট্‌কেল ছুঁড়ে আমাদের মাথা ভেঙ্গে দেবে। যেই কথা, সেই কাজ। হাতে করে কোথা থেকে কতগুলো পাথর ও নিয়ে এসেছে।

গোলমাল এড়াবার জন্য মাধবী দরজাটা খুলে দিল। ফাঁক পেয়ে ক্ষুদে শয়তানগুলো গাড়ীর ভেতর উঠে এসে তাণ্ডব ভাবে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতা সুরু করল।

দলের একটা, গানের অছিলায় চিৎকার সুরু করল—

"কানাইয়া কানাইয়া ডাকে মাঈ যশোদা। আওয়ে আওয়ে নন্দ গোপাল।"

অমনি আর একটা বাঁশীতে পোঁ ধরে দাঁড়াল, বঙ্কিম ভঙ্গীতে ; যেন কলির কেষ্টটা।

কামরার আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলল।

থেমে থেমে চলল, ওদের লীলা, অনেকক্ষণ ধরে। অতিষ্ঠ করে তুলল সবাইকে।

ঘণ্টা দেড়েক পথ ঐ ভাবে যাবার পর, মতিহারী ষ্টেশনে দুষ্টগ্রহ নেমে গেল। বিনিদ্র প্রায় কেটে গেল সারাপথটুকু।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সবাই।

রাত আড়াইটায় গাড়ী সগৌলীর প্লাটফরমে দাঁড়াল।

থামবে মাত্র দু'মিনিট। বিরাট লটবহরের বোঝা নিয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে নামাটা এক সমস্যা হয়ে উঠল।

অন্যান্য যাত্রীর সাহায্যে যাহোক করে মালগুলো টেনে হিচ্‌ড়ে নীচে নামিয়ে আনা হল। কিন্তু সারা ষ্টেশনটায় পোর্টারের চিহ্ন মাত্র নেই। ছোট ষ্টেশন। পোর্টার যারা বা ছিল তারাও অপর যাত্রীদের মাল নিয়ে চলে গেছে।

হায় রে! রক্সৌলের গাড়ীতে হয়ত আর আমাদের ওঠাই হবেনা।

কিছুটা দূরে উল্টো দিকের প্লাটফরমে ধূম উদগীরণ করে চলেছে এঞ্জিন। গার্ডের নির্দ্দেশ পেলেই ছেড়ে চলে যাবে।

সতী আর মাধবী ছুটে চলে গেল গাড়ীটার দিকে। বলে গেল— আপনারা অপেক্ষা করুন, যে পোর্টারগুলো এতক্ষণে ছাড় পেয়েছে আমরা গিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"আমরাও যাচ্ছি কৃষ্ণ বাহাদুরকে নিয়ে, দরকার বুঝলে চেন টেনে গাড়ী থামিয়ে দেব"—কথা কয়টা বলেই, অসীমা ও ছুটে চলল উর্দ্ধশ্বাসে।

আমি আর অমিত দাঁড়িয়ে রইলাম মালের কাছে।

এদিকে পাঁচ ছয় জন পোর্টারও এসে গেছে। ঝট্‌পট্‌ ওদের মাথায় মাল চাপিয়ে ছুটে চললাম গাড়ীর দিকে।

ভেতর থেকে সঙ্গীরা হাত বাড়িয়ে, সব মালগুলোকে টেনে তুলে নিল।

গাড়ীও চলতে স্থুরু করল। জানালায় ঝুঁকে পড়ে অঞ্জনা পোর্টারের প্রাপ্যটা মিটিয়ে দিল। আমরা ও সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়লাম।

উত্তেজনার ক্লান্তিটুকুকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য, শুধু ছু'একটা লম্বা লম্বা শ্বাস টেনেছি, অমনি দেখা দিল আর এক বিপদ।

অজ্ঞান প্রায় খুকু, এলিয়ে পড়ল মাধবীর গায়ে।

মাধবার চোখে উৎকণ্ঠা, অসহায়ের করুণ দৃষ্টি।

কি করা যায়! হাতের কাছে ছিল ওয়াটার বোত্‌ল। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিতেই, খুকু চোখ তুলে তাকাল। গাড়ীর সমস্ত দরজা জানালাগুলোকে খুলে দিলাম।

খুকুকে শুধালাম, কষ্ট হচ্ছে কি ?

খুকু ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না তেমন কিছু নয়, ভালই বোধ করছি।"

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে স্থির হয়ে বসল সবাই।

হাঙ্গামার সঙ্গে বিপদ ও কি মূর্ত্ত হয়ে ঘুরছে আমাদের পিছু পিছু! আরও কত খেলা দেখব কে জানে!

রক্সৌল আর মাত্র আঠার মাইল পথ। কোন বিপর্য্যয় না হলে হয়ত পৌঁছে যাব ঠিক সময়।

রাত সাড়ে চারটা। গাড়ী এসে দাঁড়াল ভারত সীমানার শেষ ষ্টেশন রক্সৌলে।

বায়ুহীন বদ্ধ কামরাটার ভেতর, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। লাফিয়ে নেমে পড়লাম তাই, মাটিতে।

মুক্ত বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস টেনে স্থস্থ বোধ করলাম কিছুটা।

"কিম্ অতঃ পরম্",—উৎসুক জিজ্ঞাসা সবার চোখে।

বললাম, হয়ত হল ভোর দুঃখ রজনী।

আর কি, চল এবার নেপালের রক্সৌল ষ্টেশনে।

মালগুলো নিয়ে, কৃষ্ণ বাহাদুর একটু বসুক আমরা হাত মুখ ধুয়ে আসছি বলেই সঙ্গীরা চলে গেল বিশ্রাম কক্ষের দিকে।

ওদের উদ্দেশ করে বললাম—দেরী করনা কিন্তু, বেশী সময় নেই হাতে।

বাসের টিকিটগুলো কেটে নিলে হত না বাবু?

কৃষ্ণ বাহাদুরের কথায় একটু থতমত খেলাম।

বাস! এখানে কোথায়? বাস তো আমলেকগঞ্জে।

আজ্ঞে না, টিকিট এখানেই পাওয়া যাবে। এই সামান্য কয়েক কদম দূরেই, নেপাল ন্যাশনাল রোড ওয়েজের টিকিট ঘর। টাকাগুলো দিন, টিকিটটা কেটেই নিয়ে আসি। অমলেকগঞ্জে টিকিট কাটতে হলে অনেক ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে।

নিশ্চিত প্রত্যয়ের দৃঢ়তা কৃষ্ণ বাহাদুরের কথায়।

তবে তাই কর, বলে টাকাগুলো গুনে দিলাম ওর হাতে।

পোর্টারগুলো মালপত্রের বহর দেখে বেশ প্যাঁচ খেলতে লাগলো। হেঁকে বসল, মজুরী দিতে হবে দশ টাকা পুরো। গন্ধমাদনের বোঝা, নিয়ে যাবে প্রায় একমাইল দূরে। দায়টা আমাদেরই।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, অনেক দর কষাকষির পর ওরা পাঁচ টাকাতেই রাজী হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সঙ্গীরাও ফিরে এসেছে। বললাম, কৃষ্ণ বাহাদুর বাসের টিকিট কাটতে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। তোমরা ওকে নিয়ে এস।

"প্রায় পাঁচটা বেজে গেল আর ত দেরী করা যুক্তিযুক্ত নয়।" অসীমার চোখে উৎকণ্ঠা দেখা গেল।

"কৃষ্ণ বাহাদুর এসে গেল বলে। আমি যাচ্ছি একটু অন্যদিকে" বলে ওদের ছেড়ে একা একা এগিয়ে চললাম।

একটু এগোতেই পথে দেখা হয়ে গেল কৃষ্ণ বাহাদুরের সঙ্গে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে শুনেই বললাম, তাড়াতাড়ি যাও তবে। মালগুলো মুটের মাথায় চাপিয়ে, সঙ্গীদের নিয়ে জলদি চলে এস।

আমের বনে ঘেরা পথ ধরে চলেছি, ষ্টেশনের দিকে। রাস্তার পাশেই, টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছিল, একটা চায়ের দোকানে। পায়া ভাঙ্গা একটা বেঞ্চ, আর ওরই সামনে ছোট্ট একটা টিনের ছপ্পর, সম্মুখের ঝাঁপটা তোলা। উনুনে কয়লা পুড়ছে, তাইতে চাপান একটা কেত্‌লী থেকে সোঁ সোঁ চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছে। আসবাব পত্র বলতে, দু'চারটা ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্স। ওরই খোপে খোপে সাজানো বেসাতি। অনেকগুলো খোপ পুরান সিগ্রেট আর দেশলাইয়ের খোল দিয়ে বোঝাই। দেখে বোঝে সাধ্য কার যে ওগুলো সব খালি।

কেমন যেন একটু চা খাবার ইচ্ছা হল। দোকানের ভাঙ্গা বেঞ্চটা জুড়ে বসলাম। ফরমাস করলাম, বেশ গরম গরম এক কাপ চা দাও দেখি?

"সামান্য একট দেরী হবে। বসুন, জলটা ফুটে উঠবে এখনি" বলে দোকানী এগিয়ে এলো। একটা গামছা নিয়ে বেঞ্চটা ঝেড়ে ঝুড়ে দিল।

এরই মধ্যে রক্সৌলবাসী অনেকেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। কোন কোন গৃহস্থের জানালা দিয়ে, মৃদু আলোর রশ্মি ঠিকরে পড়ছে।

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' ভজন গেয়ে কে যেন চলে যাচ্ছে মাঠের দিকে।

ঐ ধূলি মলিন বেঞ্চটায় বসে বসে, দেখছি দোকানীকে আর দোকানের আসবাবগুলো।

দোকানী এক গ্লাস চা আর দুটো নোনতা বিস্কুট এগিয়ে দিল। ছোট একটা বাচ্চাকে কাঁখে নিয়ে সলাজে দোকানী-বধূ এসে দাঁড়াল। বাচ্চাটাকে স্বামীর পাশে বসিয়ে দিল। আরামের আশায় ওটা বাপের কোলে সেটে বসেছে। ছোট একটা গ্লাসে করে দোকানী ওর হাতে তুলে দিল একটু চা। নিরীহের মত কুতকুত করে তাকাচ্ছে বাচ্চাটা আর চুক চুক করে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। বাপ, টুকরো টুকরো করে বিস্কুট ভেঙ্গে দিচ্ছে ওর মুখের ভেতরে।

মাঝে মাঝে নাক দিয়ে সিক্‌নি গড়িয়ে পড়তেই, বাপ আলতোভাবে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে।

দেখছি দরিদ্রের মমতা মাখান স্নেহ। গ্লাসটা শেষ করে দামটা মিটিয়ে দিলাম।

অপচীয়মান রাত্রির আঁধার মুছে যায়নি তখনও, নিভন্ত প্রায় গ্রহ নক্ষত্রগুলো ছড়িয়ে আছে রক্সৌলের আকাশ প্রান্তে। উষার আসন্ন লগ্নে, পূর্ব্বাশার দিকচক্রে চলেছে দ্বন্দ্ব, আলো আর আঁধারে। জ্যোতির্ম্ময়ের আসন্ন সম্ভাবনায়, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে প্রাজণিগৎ। এ এক মধুর ক্ষণ!

কানে এসে বাজছে, নারী কণ্ঠের কলহাস্য ধ্বনি। হয়ত বা আমাদেরই ওরা, নয়ত অন্য কোন যাত্রীদল। ওরা এগিয়ে আসছিল আম্রকুঞ্জের পথ ধরে। অস্পষ্ট আলোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না ওরা কারা।

না! ঐ ত অঞ্জনা, মাধবী আর সতী। দল বেঁধে ওরাই আসছে। গালগল্পে মসগুল, খেয়ালই করল না যে আমি চায়ের দোকানে বসে আছি।

ওরা পার হয়ে গেল। মুটেরাও মাথায় মোট ঘাট নিয়ে চলে গেল। ওদের পিছনে পিতা পুত্র, কৃষ্ণ বাহাদুর আর গোপালও হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল।

দোকানের বেঞ্চটায় বসে দেখছি, ওরা পৌঁছে গেল ষ্টেশনে। সবার অলক্ষ্যে আমিও ভিড়ে গেলাম দলের মাঝে।

॥ ৩ ॥

ভক্-ভক্-ভক্—এঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সশব্দে উঠে চলেছে শূন্যে।

"এক অপরিচিত ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছেন, খুব সম্ভব রাজেশ্বর বাবু" কথা কয়টা বলে অসীমা কাছে এসে দাঁড়াল।

কই, কোথায় ?

অসীমা অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখিয়ে দিল।

এগিয়ে দাঁড়ালাম ভদ্রলোকের সম্মুখে।

নমস্তে—আপনি নিশ্চয়ই রাজেশ্বর বাবু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নমস্তে।

আমার পরিচয় জানবার আকুল আগ্রহ ওর চোখে। ভদ্রলোকের কৌতূহল নিরসন করতেই হল। পরিচয় দিলাম।

পথে খুবই কষ্ট হয়েছে শুনলাম। কি আর করবেন, আজও ত ভাল ব্যবস্থা হল না রাস্তা ঘাটের! প্রায় সমস্ত যাত্রীকেই এমনি ছুর্ভোগ সইতে হয়। বেশ পরিবেদনাশীল ভদ্রলোকের স্বর।

হেসে উড়িয়ে দেবার মত করে বললাম—না, না ও কিছু নয়। পথে বেরোলে ত অমনি কষ্ট হামেসাই লেগে থাকে। এ কষ্টটুকু যার কষ্ট বলে মনে হয় তার ত পথ চলাই উচিত নয়। না ওতে ভ্রূক্ষেপ করলে চলে না।

পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম ভদ্রলোককে—আপনার খবর কি বলুন ? মনে হচ্ছে আপনাকেও বেশ ছুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ?

না তেমন কিছু নয়।

তবু ও ?

আপনারা আসছেন জেনে গেলাম ষ্টেশনে, রাত আটটার গাড়ী দেখতে। সামান্য চিন্তা হল আপনাদের না পেয়ে। ফিরে গেলাম বাসায়। আবার এলাম রাত বারটার গাড়ী দেখতে, তাতেও না পেয়ে বেশ একটু ঘাবড়ে গেলাম। বেশী রাত করে বাসায় ফিরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, শেষ রাতের গাড়ীটায় আর ঠিক সময়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। যাহোক দেখা ত হল।

অসাফল্যের সঙ্কোচ পরিস্ফুট হয়ে উঠল ওর দৃষ্টিতে।

যাকগে ওসব কথা। নূতন পরিচয় হল। গত রজনীর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, একটু করে সুধা ঢেলে নি মুখে—কি বলেন, আপত্তি নেই ত ?

টেনে নিয়ে এলাম ভদ্রলোককে টি ষ্টলের কাছে।

দেখলাম কফি ও আছে। শুভেচ্ছার বিনিময়ে চা এর পরিবর্ত্তে তবে কফিই হোক। দোকানীকে দু' পেয়ালা কফির অর্ডার দিলাম।

অন্যদিকে গ্লাসে গ্লাসে চা এগিয়ে দিল কৃষ্ণ বাহাদুর, সঙ্গীদের হাতে।

বেশ জাঁক করে, আঁটসাঁট হয়ে বসেছে ওরা, কামরাটার বিস্তৃত যায়গা দখল করে।

স্থানীয় মহাজনেরা মাটিতে কাপড়ের ফালি বিছিয়ে, স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে, ভারতীয় আর নেপালী মুদ্রা। গুচ্ছে গুচ্ছে বাঁধা নোটের তোড়া।

অঞ্জনা কামরা থেকে নেমে এল।

ভারতীয় ১৲ টাকা নেপালের ১·৬০ নয়া পয়সার সমান। বিনিময়ের হার জেনে নিয়ে, অঞ্জনা কৃষ্ণ বাহাদুরের সাহায্যে ভারতীয় মুদ্রার বদলে কিছু নেপালী মুদ্রা সংগ্রহ করল। এর পর, পথে কোথাও ভারতীয় মুদ্রা চলবেনা।

গাড়ী ছাড়তে বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেল।

নির্ব্বিঘ্ন যাত্রা আর শুভেচ্ছা জানিয়ে, রাজেশ্বরবাবু বিদায় নিলেন। বললেন—এখনি ফোনগ্রামে আমাদের কথাটুকু জানিয়ে দেবেন

মানবকে। কাঠমাণ্ডু বাস ষ্ট্যাণ্ডে মানব উপস্থিত থাকবে।

ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্। ন্যারোগেজের গাড়ী, দুলকি চালে এগিয়ে চলল বীরগঞ্জের দিকে।

মিহি কুয়াশাজালের আস্তরণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সম্মুখের পথটুকুতে তাই ঠিক ভাবে নজর চলছিল না।

চুপচাপই বসে আছি। অনেক স্থানীয় যাত্রী উঠেছে এ কামরাটার ভেতরে। আমার হাবভাবে, ওদের বুঝতে দেরী হল না যে এ পথে আমি নূতন। একটু একটু করে আলাপ হল।

ওদের একজন বললেন—আকাশ মেঘমলিন না থাকলে এখান থেকেই সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, আকাশচুম্বী তুহিন-শীর্ষগুলি। শূন্য পথে চূড়া গুলোর দূরত্ব একশ থেকে দেড়শ মাইল। ঐ সময় টেলিফটো লেন্স ছাড়াও ক্যামেরায় ধরা পড়ে।

আমরা চলেছি নেপালের নিম্ন ভূভাগ, তরাই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। চারদিকে শষ্প পরিপূর্ণ নীলহরিতের ঢেউ। অন্তহীন বিস্তীর্ণ শস্য-প্রান্তর, মিশে গেছে দূর দিগন্তে।

পাহাড়ের গড়ান জল আর বৃষ্টিধোয়া পলিমাটী, প্রতিবৎসর এসে পড়ে মাঠের মধ্যে। প্রকৃতির অনুগ্রহে নেমে আসে সারের ঢল। পৃথক সারের কোন দরকার হয় না। অল্প আয়াসেই তৈরী হয় জমি।

রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জ রেলপথটী, দৈর্ঘ্যে মাত্র ছাব্বিশ মাইল। নেপালে এমনি আর একটি রেলপথ আছে জনকপুর থেকে জয় নগর পর্য্যন্ত।

ছোট লাইন। ছোট কামরা। ছোট এঞ্জিন। খেলনার মত যেন।

ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্। ট্রেণ চলেছে অতি মন্থর গতিতে, হেলে দুলে। গরপরতা, ঘণ্টায় ছ'মাইল করে। ধেয়ে চলার শক্তি ওর নেই।

রেলপথের পাশ দিয়েই রাজপথ ধরে, দ্রুত চলে যাচ্ছে জীপ, মোটর, বাস, আর প্রাইভেট কার। এমন কি টাঙ্গাও পাল্লা দিয়ে, সময় সময় ট্রেণকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

মুক্তির আনন্দে ট্রেণ ও চলতে চায় ওদের সঙ্গে। এগিয়ে যেতে চায় পাল্লা দিয়ে। অক্ষম। নাই ওর পরিমিত শক্তি। নিষ্ফল আক্রোশে তাই করে শুধু গর্জ্জন আর আস্ফালন।

অক্ষমতার অস্থির কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে।

ছোট ছোট একদল ছেলে ফুট্ বোর্ডে চেপে চলেছে। ঝুপ করে নেমে পড়ছে কোথাও, এগিয়ে যেতে দিচ্ছে ট্রেণকে, আবার দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ছে। এমনি করে ট্রেণের সঙ্গে ওরা খেলা করে চলেছে।

আজ শারদীয়া মহাষ্টমীর দিন। পথে হেঁটে চলেছে নারী পুরুষের মিছিল। ফুলে ফলে ভর্ত্তি নৈবেদ্যের থালা হাতে চলেছে মাতৃ উপাসিকারা। সিঁথিতে লাল মেটে সিন্দুর, ভ্রূযুগলের মাঝে এঁকেছে সিন্দুরের টিপ, অঙ্গে জড়ান রয়েছে রক্তরাঙ্গা বাস, থালায় রয়েছে লালপদ্ম আর রক্ত চন্দন। শুধুই লাল—লালের ছড়াছড়ি।

সারি বেঁধে চলেছে ওরা বীরগঞ্জের ভবানী মন্দিরে।

কিছুটা বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে, সরে যেতে লাগল কুয়াশার আবরণ। ভাস্বর হয়ে উঠল পূর্ব্বাশার প্রান্ত, প্রদীপ্ত হয়ে উঠল উত্তর আকাশ। দেখা দিল তুষার চূড়ায়, রবিরশ্মির ছটা। নবারুণের বর্ণাঢ্য আলোক-সম্পাতে, মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে আকাশের রং।

যদি হয়ে থাক তুমি আর্ত্ত অভাজন, যদি হয়ে থাক পঙ্গু বিকল তবে চলে এস। দেখে যাও প্রকৃতির রূপসুষমা, পাবে অমৃতের সন্ধান।

ঐ যে। ঐ যে! সারাটা কামরা উচ্চকিত হয়ে উঠল যাত্রীদের

অধীর উল্লাসে। মহিমময় ভাস্বর রূপ নিয়ে, আকাশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ভেসে উঠেছে এভারেষ্ট। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সবাই, ঐদিকে।

রক্সৌল থেকে বীরগঞ্জ, এই সামান্য পথটুকু আসতেই প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। রেলপথে চেকপোষ্ট. ষ্টেশন, গাড়ী এখানে দাঁড়াবে বেশ কিছুক্ষণ। থামতে না থামতেই, শুল্ক বিভাগের লোকেরা তল্লাশীর জন্য গাড়ীর ভেতরে উঠে পড়েছে। এ ট্রেণে একমাত্র আমরাই বিদেশী যাত্রীদল। আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বেশ হয়রাণ করবে আমাদের।

না। তেমন কিছু হ'লনা। কৃষ্ণবাহাদুরের সঙ্গে কি কথা হল, চলে গেল ওরা অন্য কামরায়।

সবাই প্লাটফরমে নেমে পড়েছে। এক কোনে একটা করবীর গাছ। গোপাল এক ফাঁকে গাছটায় উঠে কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফুল নিয়ে এল।

সঙ্গীরা চায়ের ষ্টলে ভীড় করেছে। গরম জিলিপীর ঠোঙ্গা আর চায়ের গ্লাস হাতে ওরা জটলা করছে।

ষ্টেশনের পাশেই একটা বাড়ীর দেয়ালে, "নারী বিকাশ ক্ষেত্র" চিহ্নিত একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে। ওটার পাশে পরিপাটি বেশ ভূষায় একদল তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরই একজন, অপেক্ষাকৃত বয়স্কা, সুশ্রী, রূপসীও বলা যেতে পারে—ওরই সম্মুখে গিয়ে নমস্কার করে বললাম—সাইন বোর্ডটা দেখে কৌতূহল হ'ল, তাই এলাম আপনার কাছে। যদি অশোভন কিছু মনে না করেন তবে বলুন কিছু আপনাদের এই শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে। আমরা বিদেশ থেকে অর্থাৎ কলকাতা থেকে আসছি। চলেছি কাঠমাণ্ডুতে, ওখানে কয়েকদিন থাকব। আপনাদের দেশকে একটু দেখব, জানব, শুনব, এই ইচ্ছা।

কোন আপত্তিই করলেন না ভদ্রমহিলা। কথার আদান প্রদান চলল। মৃদু হেসে বললেন—অতি ক্ষুদ্র আমাদের এ প্রচেষ্টা। জানিনা

সফল হবে কি না। সুরু হয়েছে এই সবে কিছুদিন আগে। এদের দেখছেন—এরা সব শিক্ষার্থী। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে, সেবিকার ধর্মে ব্রতী করে লাগিয়ে দেওয়া হবে দেশের কাজে।

"কাজ গুলোর নমুনা ?" আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলাম।

ধরুন না কেন সূতো কাটা, তাঁত চালানো, পশম বোনা, মাতৃমঙ্গল, ধাত্রীবিদ্যা, শিশু পালন, এই সব আর কি।

"সবগুলো বিষয়ই কি সবাইকে শিখতে হয় ?" বেশ ব্যগ্রভাবেই প্রশ্ন করলাম।

না, সবগুলো অবশ্য সবাই শেখেনা। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। ছাত্রীরা শিক্ষা নেয় ওদের নিজ নিজ রুচিমাফিক।

ভদ্রমহিলা একটি মেয়েকে দেখিয়ে বললেন—এর নাম প্রেমা। এর শিক্ষা প্রায় সাঙ্গ হয়ে এসেছে। ওর বিষয়, মাতৃমঙ্গল আর শিশুপালন। আর একটিকে দেখিয়ে বললেন—ওর নাম কান্তা। ও তাঁত চালান আর সূতো কাটার কাজ শিখছে।

এদের শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে গ্রামে গ্রামে। প্রচার করবে, আর হাতে নাতে শিক্ষাও দেবে।

জিনিষটা, ঠিক আপনাদের দেশের কম্যুনিটি প্রজেক্টের মত।

খানিকটা জিরিয়ে আবার বলতে লাগলেন—এ রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টাই হয়'নি এর আগে। প্রায় নিরক্ষরই ছিল সবাই।

কখন যে নীরু এসে পাশে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই করিনি।

উৎসুক আগ্রহ নিয়ে নীরু ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করল—মেয়েদের ভেতর শিক্ষা, ঠিক কবে থেকে সুরু হল তা'হলে ?

আপনারাই কি এর পথিকৃৎ ?

উত্তর দিলেন ভদ্র মহিলা—তা যা হয় বলতে পারেন। তবে এটা খুবই সত্যি, রাণাদের কু-শাসনে সমস্ত জাতটাই পঙ্গু মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল। ওরা কোনদিন রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবেনি।

বাহ্ন-স্ফুলিঙ্গ তাই জ্বলে উঠল, গণবিদ্রোহের রূপ নিয়ে। উল্টে গেল, সমস্ত ব্যবস্থা। রাজ্যের শাসন ভার এল রাজার হাতে। তারপরই নূতন যুগের সূচনা হ'ল। সেই সঙ্গে পত্তন হয়েছে এমনি দু'চারটী কেন্দ্র।

এই সেবিকারা যাবে গ্রামে গ্রামে, নিরক্ষর নারী সমাজকে বর্ণ-পরিচয় করাবে। যাতে আলস্যে দিন না কাটায়, তাই শেখাবে তাঁত বোনার কাজ, পশমের কাজ, অমনি ধরণের আর সব কিছু।

যাতে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনটুকু নিজেরাই করে নিতে পারে, সেজন্য এদের সূতো আর পশম দিয়ে সাহায্য করা হয়।

পূর্ব্বাপর ইতিহাস থেকে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের বিচিত্র কাজ ও প্রচারের দিকগুলো ভদ্রমহিলা গড়্‌গড়্‌ করে বলে চললেন।

জানলাম, কিছুদিন হল ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রচারের কাজগুলো করা হচ্ছে।

কিছুটা সময় নিঃশব্দে কাটিয়ে আবার বললেন—সংস্কার মুক্ত না হলেও গ্রামের মেয়েরা অবহেলা করেনা এ প্রচারকে, বরঞ্চ উপদেশ মেনে চলারই চেষ্টা করে। তাই আশা রাখি, তিল তিল করে গড়ে উঠবে নেপালে, মায়ের জাত, বেশ বলিষ্ঠ ভাবে।

আপনারা ভারতের লোক, হয় ত তুচ্ছ মনে হবে এই সব পরিকল্পনা আপনাদের কাছে!

কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললেন এর চেয়ে বেশীই বা কি করতে পারি? আলাদিনের প্রদীপ নেই ত হাতে। রাতারাতি কেমন করে পাল্টে ফেলি এতদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন এই কাঠামোটাকে।

হবে, হবে। হবে ক্রমে ক্রমে, এ আশা রাখি।

কথাগুলো বলে এক ঝলক মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এল।

বললাম—আসি এবার। অনেক সময় নষ্ট করলাম। আশা করি

ভুলে যাবেন এ অত্যাচার।

"ওকি! ওটা কোন কথা হল না।" ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন, মৃদু আপত্তি ও জানালেন।

"'আচ্ছা, নমস্কার।" বিদায় নিলাম ভদ্রমহিলার কাছ থেকে।

প্রতি নমস্কারের ধ্বনি তুলে, লঘু পদক্ষেপে ওরা ভবানী মন্দিরের দিকে চলে গেল।

আবার চেপে বসলাম গাড়ীতে। সুরু হল এঞ্জিনের একটানা গোঙানি।

ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্, ভক্-ভক্-ভক্ করে শূন্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে এগিয়ে চলেছে ট্রেণ। পিছনে পড়ে রইল বীরগঞ্জ।

দুধারে বিস্তীর্ণ শস্য প্রান্তর। দু'চারটে বাড়ী ঘর আর ছোট ছোট বস্তি, পার হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

হেমন্তের শিশির-স্নাত তরাইয়ের ধান ক্ষেত। মৃদু সমীর সঞ্চরণে শীষে কাঁপন লেগেছে, ছড়িয়ে পড়েছে তরঙ্গ ভঙ্গে দূরদিগন্তে, নীল সবুজ পাহাড়ের দেশে। পাহাড়ের কোল থেকে ভেসে উঠছে জলদ স্তূপ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেকে ফেলল, তুহিন-চূড়াগুলোকে।

আমাদের কামরায় দু'চারজন নূতন প্যাসেঞ্জার উঠেছেন। এয়ার পাইলট "ব্যানার্জ্জী," "লালা মুক্তিনাথ" আর ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার "খাঁন।" ওরা সবাই নেমে যাবেন মাঝপথে সিমরা ষ্টেশনে।

সিমরা থেকে গৌচর—কাঠমাণ্ডুর এয়ার পোর্ট— ব্যানার্জ্জী চালিয়ে নিয়ে যাবেন ডাকোটা, উড়ে যাবেন আকাশপথে যাত্রীদের নিয়ে।

কথায় কথায় জানতে পারলাম, নেপালের বিমান বিভাগে আরও ৩।৪ জন বাঙ্গালী আছেন। দুঃসাহসিক কাজে বাঙ্গালী পরাঙ্মুখ নয়। বুকটা ফুলে উঠল। অমনি মনে পড়ে গেল এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জির কথা।

অনেক টাকা। মুক্তিনাথের হাতে একটা সিল করা থলেতে টিকিট বিক্রীর টাকাগুলো রয়েছে। বেশ ফোলান ফাঁপানো থলেটার চেহারা। পরিমানটা নিশ্চয়ই বেশ মোটা রকমের।

মুক্তিনাথ রয়্যাল নেপাল এয়ার লাইন কর্পোরেশনের ক্যাশিয়ার। ব্যানার্জ্জীর হাতে থলেটা গচ্ছিত করে, ফিরে যাবেন বীরগঞ্জে।

এরা সবাই অল্পবয়সের যুবক। বেশ ছিম্‌ছাম। গায়ে সগু পাট ভাঙ্গা জামা কাপড়।

সিমরা থেকে কাঠমাণ্ডু—আকাশপথের দূরত্ব আনুমানিক ৩৫ মাইল। পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই পথ অতিক্রম হয়ে যায় বলে বিস্ময় বা রোমাঞ্চ এমনি কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়না, এ পথে। তবু আকাশযানেই ফিরে আসব ঠিক করেছি।

চুপচাপ বসে থাকতে হয়ত ভাল লাগছিল না, তাই নেহাৎ মামুলী ভাবেই আলাপ স্তুরু করলেন মিঃ খাঁন্। জিজ্ঞাসা করলেন—"আসছেন কোথা থেকে আর চলেছেনই বা কোথায়? সাধারণতঃ রেলপথে বা বাসপথে স্থানীয় যাত্রী ছাড়া বিদেশী যাত্রীরা চলাফেরা করে না, তাই আমার এ কৌতূহল। অবশ্য আপনারা যে ভারতের, তা আপনাদের পোষাক পরিচ্ছদ থেকেই বোঝা যায়।" অশোভন হলেও আমার এ অহেতুক কৌতূহলটুকু ক্ষমার চোখে নেবেন।

উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই কিছু বলবার আগেই আবার শুধালেন, দল বেঁধে চলেছেন যখন, কোন কিছু রোমাঞ্চকর উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই, নইলে এত কষ্ট করে কে আসে এ পথে!

বলতেই হল, আপনারা স্থানীয় সজ্জন, অতি অভিলষিত পথের সঙ্গী। একঘেয়ে নীরবতাটুকু কাটাতে হলে সঙ্গী ত চাই, আর আপনাদের মত সঙ্গী ত দুর্লভ। অত বিনয়ের দরকার কি? নিশ্চয়ই চরিতার্থ করব আপনার কৌতূহল। তবে শুনুন, আসছি কলকাতা থেকে, যাচ্ছি কাঠমাণ্ডু। উদ্দেশ্য নিছক ভ্রমন।

কথাটা লুফে নিলেন খাঁন্। কলকাতা থেকে আসছেন! নিতান্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—তবে ত কেল্লা ফতে!

কি রকম?

বিস্মিত উৎসুক নয়নে উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

খাঁন্ বললেন, ছোট বেলায় স্কুল তারপর কলেজ, দুরকম শিক্ষাই ওর কলকাতায় হয়েছে, প্রথমে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। টিরেট্যা বাজারে ওর চাচাজীর ব্যবসা আছে। কলকাতায় পড়া শেষ করে ফরেষ্ট কনজারভেসনের ট্রেণিং নিয়েছেন দেরাদুনে। পাশ করে এসেই হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন। গত সাত বছর ধরে চলেছে ওর নেপাল গভর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট বিভাগে চাকুরী, আজ এখানে, কাল সেখানে, এমনি করে।

হেসে বললেন আবার—কাঠমাণ্ডু ত যাচ্ছেন, দলটাও ত বেশ ভারী আর প্রায় সবই ত দেখছি কোমলাঙ্গী বরনারী। এরা পথের বোঝা, এই ত জেনে এসেছি এত কাল। বুঝতে পারছিনা কেন সাধ করে এত বড় ফাঁসটা গলায় জড়ালেন।

"পথি নারী বিবর্জ্জিতা" কথাটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চান নাকি?

প্রতিবাদে খাঁন্কে জানালাম—অত্যন্ত দুঃখিত! আপনার কথাটায় সায় দিতে পারছিনা।

সারাটা পথের অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু জানলাম, তাতে মনে হচ্ছে, প্রবাদটা স্বতঃসিদ্ধ বা নির্ভুল নয়। ব্যতিক্রম আছে বৈ কি! সময় সময় আমিই ওদের বোঝা হয়ে পড়েছিলাম। পথ চলতে চলতে যখনই কোন কঠিন সমস্যায় হাবুডুবু খেয়েছি, তখনই ওরা এগিয়ে এসে, আমাকে টেনে তুলেছে।

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়ে গেলেও কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।

ঘোর কলি কাল! শাস্ত্র বাক্য উল্টে যাবে তা আর এমন বেশী কি?

খাঁন্ হো হো করে হেসে উঠলেন।

এদিক ওদিক আরো তুচারটা কথাবার্ত্তা হবার পর আলোচনাটা নেপালের বনসম্পদের প্রসঙ্গে চলে এল।

এবার খাঁনের বাহাতুরী নেবার পালা। নূতন উদ্যমে সুরু করলেন —ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ নেপালের এই তরাই আর ট্রান্স-হিমালয়ান অঞ্চল। সারা পৃথিবীর সবরকম গাছই এখানে আছে। এর অরণ্যলোক মূল্যবান মহীরুহ আর অটবীতে পরিপূর্ণ।

নেপালের অরণ্যে যে গাছ নেই তা ভূভারতের কোথাও নেই। নেপাল, উদ্ভিদতত্ত্বের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ, সারা উদ্ভিদ রাজ্যের মণিকুট্টিম।

এই যে কামরায় বসে আছি—তাও নেপালের কাঠেই তৈরী।

মুক্তিনাথ ঠিক ঠিক আমাদের কথা অনুসরণ করতে পারছেন না, তাই বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ব্যানার্জী এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। ওর কৌতূহলকে বাগে রাখতে না পেরে অগত্যা জিজ্ঞাসা করলেন—পূজায় কলকাতার আমোদ প্রমোদ ছেড়ে এই বিদেশে আসার খেয়ালটা কেন হল বলুন ত ?

উত্তর করলাম—নিছক বেড়াবার জন্যই। জানেন ! দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান একটা মস্ত বড় নেশা। মাতালের নেশার মতই, বরঞ্চ তার চেয়েও বেশী কিছু। যাযাবর মন ক্ষেপিয়ে তোলে, ইন্দ্রিয়-গুলোকে।

এই যে দেখছেন এদের—এরা কেউ অধ্যাপিকা, কেউ শিক্ষিকা, এদের অবসর মেলে শুধু পূজার ছুটিতেই। বরাবর তাই এই ছুটিতে ওরা দল বেঁধে বেরোয় পথে। চলে যায়, যেখানে মন চায়। তু' এক বছর পর এদের বেড়াবার যায়গা খুঁজে বের করা এক তুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

এরা যায়নি কোথায় ? কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, সদিয়া থেকে পেশোয়ার, কলকাতা থেকে বোম্বাই, ঘুরেছে এরা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র।

পায়ে হেঁটেই করেছে এরা তুহিন-তীর্থ কেদারবদ্রী। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ও।

পরম বিস্ময় এই হিমালয়। অমোঘ এর মন্ত্রশক্তি। টেনে নিয়ে যাবেই যাবে। যে একবার মজেছে সে হবেই হবে ঘর ছাড়া।

"খ্যাপা খুঁজে মরে পরশ পাথর।"

এদেরও ঠিক ঐ দশা। ঘুরে মরা দাঁড়িয়ে গেছে ওদের এক বাতিকে।

"লাগেনি যার পায়ে ধূলি কি নিবি তার চরণ ধূলি ?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন।"

স্বীকার না করে উপায় নেই যে, নগরজীবনের পঙ্কিল, ধূলি-আবর্জ্জনায় আবিল মনকে শুচিশুদ্ধ করতে হলে, বেরিয়ে আসতে হবে পথে। যেতে হবে তীর্থের দুর্গম পরিবেশে। নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে মনের প্রসারতা, মিলবে অন্তরের প্রশান্তি। ভরে নিতে হবে অভিজ্ঞতার ঝুলি তীর্থের ধূলি কণায়, ঐ হবে জীবনের পরম সম্পদ, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"

এই ধনেতে ধনী যে জন সেই ত মহাজন। নইলে বৃথাই তোমার কৃচ্ছ্রসাধন।

অনুভবে বুঝেছি, বাংলার ভাবধারার সঙ্গে নেপালের একটা আত্মিক যোগসূত্র রয়েছে। রয়েছে একটা নিকট আত্মীয়তা আর নিগূঢ় আন্তরিকতা।

ছুটে এসেছি তাই নেপালে। যতটা পারি দেখব, শুনব, জানব; নইলে বৃথাই হবে এ পরিক্রমা। শূন্যই থেকে যাবে অভিজ্ঞতার ঝুলি। মিশে যাব এই সরল জাতটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে। ফিরে যেতে চাই, কাঞ্চন গিরিশৃঙ্গের আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল, রজত শুভ্র মন নিয়ে।

একটা কোণ ঘেঁসে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোক। অমিত আর ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলনই ওদের বিষয় বস্তু। আকালি নেতা তারা সিং আর ফতে সিংকে কেন্দ্র করেই চলেছে আলোচনা।

অমিত এই আন্দোলন সমর্থন করে না।

শিখ ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। অসহিষ্ণু ভাবে প্রতিবাদ জানালেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্দায় উঠে এলো ওর কণ্ঠস্বর। নিস্ফল আক্রোশে জ্বলে উঠল ওর চোখের দুটো তারা, ফেটে পড়লেন বজ্র নির্ঘোষে—ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি রাখেনি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট। নেহেরু আশ্রয়ীদের জানিয়ে দিতে হবে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আর জঘন্য পাপাচরণ করা, দুটোই সমান অপরাধ।

মিথ্যাচারের প্রতিবাদে আমৃত্যু লড়াই করে যাবে পাঞ্জাব। আন্দোলন চলতেই থাকবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে।

ও হোঃ! ভাঙ্গার কাজে দেখছি আপনারা খুব পটু। একটু শ্লেষের সুর অমিতের কণ্ঠে।

দেশে যখন জাতীয় ঐক্যের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় আপনারা চলেছেন তাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করতে। জাতীয় সংহতির একান্ত প্রয়োজনের সময় মেতে উঠেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ আর দলাদলি নিয়ে। ভারতের উন্নতি আর অগ্রগতির পরিপন্থী, এমনি সব চিন্তাধারাকে, অঙ্কুরিত হবার আগেই সমূলে বিনষ্ট করে দিতে হবে। কঠিন হস্তে দমন করতে হবে এই সব পাগলামী।

অমিতের কণ্ঠে সুস্পষ্ট দৃঢ়তা আর উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

একটানা কথা বলে অমিত হাঁপিয়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত থেকে বলল—ভারতের আদর্শ হবে একতার, বিচ্ছিন্নতার নয়। বিচ্ছিন্নতা আনবে স্বার্থপরতা আর স্বেচ্ছাচারিতা। ভারতের পক্ষে এ এক লজ্জাকর গ্লানি।

অহিংসা, শান্তি আর সহনশীলতাই ভারতের মুল-মন্ত্র। আধ্যাত্মিকতার আদর্শে ভারত থাকবে পৃথিবীর সব জাতির ওপর, মাথা উচু করে।

ট্রেণ সিমরা ষ্টেশনে ঢুকছে। মন্থর হয়ে এসেছে গতিবেগ। সহযাত্রীরা সব নেমে যাবে এখানে।

ব্যানার্জ্জী গুছিয়ে নিলেন তার এয়ারব্যাগ। ছু'চার বার নেড়ে চেড়ে, টাকার থলেটা দৃঢ়মুষ্ঠিতে তুলে নিলেন মুক্তিনাথ।

সিংজী গোঁফে তা দিয়ে, পোষাকটা টেনে, ঝেড়ে নিয়ে, উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে কষে দম দিলেন, খাঁন।

নেমে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত।

ষ্টেশনের পাশেই ছোট্ট এয়ার ষ্ট্রিপের পথে এগিয়ে চললেন ওরা। কিছুটা পথ ওদের সঙ্গে গিয়ে বিদায় সম্ভাষণের বিনিময়ে ফিরে এলাম ষ্টেশনে।

অসীমা আর খুকু নেমে পড়েছে ট্রেণ থেকে। ঠোঙা বোঝাই করে কিনেছে বেগুনি, পাকৌড়ি। বিলিয়ে দিয়ে এল সঙ্গীদের হাতে হাতে। ছু'একটা কম পড়েছে, তাই আবার ফিরে এসেছে দোকানীর কাছে।

ট্রেণটা ইত্যবসরে কখন যে ছেড়ে দিয়েছে ওরা ছুজন কেউই জানতে পারলনা।

মাধবী খুকুর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠল, খুকু ও খুকু, চলে এস। উৎকণ্ঠায় আর উত্তেজনায় মাধবী বিবশ, বিবেচনা রহিত হয়ে পড়েছে। ট্রেণ থেকে নেমে পড়বার চেষ্টা করতেই অঞ্জনা ওকে ধরে ফেলল।

মাধবীর চীৎকারে ওদের হুঁস হল। ট্রেণটা চলে যাচ্ছে দেখে, ছুজনেই হতভম্ভ হয়ে পড়েছে।

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও বিচলিত হয়নি ওরা। হাতের কাছে ছিল একটা মেল ভ্যান, খুকু লাফিয়ে উঠে পড়ল ওটাতে। অসীমাকে কোনক্রমে টেনে তুলে নিলাম।

অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল না, এই রক্ষা।

সিমরা থেকে আমলেকগঞ্জ, রেলে এগার মাইল পথ। সমস্ত পথটাই ঘন অরণ্যসঙ্কুল। তরাইয়ের বন অঞ্চল। অরণ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে গেছে রেলপথ। তরল তমিস্রা, সারা দিনমান ঢেকে রাখে এই অরণ্যলোক।

দুপাশে সজীব, অন্তহীন, ঘন সবুজের মায়া। ঋজু শাল, সেগুণের সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে বনের দিক থেকে ভেসে আসছে ঝিল্লির একটানা ক্রন্দন, নয়ত কানের পর্দ্দায় আঘাত করছে এঞ্জিনের একটানা ঘস্ ঘস্ শব্দ। একঘেয়েমীতে ঢুলে ঢুলে পড়ছে চোখের পাতা।

এমনি করেই এক সময় শেষ হয়ে গেল পথটুকু। পৌঁছে গেলাম আমলেকগঞ্জে।

এবার সুরু হবে, দীর্ঘ ১০২ মাইল পথব্যাপী, আরোহন আর অবরোহনের পালা। মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। কৃষ্ণ বাহাদুর বাসের নম্বরটা মিলিয়ে, সব মাল ছাদে তুলে দিল।

মধ্যাহ্নের খর তাপে জ্বলজ্বল করছে চারদিক। এঞ্জিনের কয়লার গুড়ো আর পথের ধুলিতে, মলিন ছাপ পড়েছে বসন ভূষণে। রুক্ষ হয়েছে চুলগুলো। বিনিদ্র রজনীর কালিমা জমেছে চোখের কোলে। দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তিতে জড়জড়। সর্ব্বাঙ্গে নেমে এসেছে অলস অবসাদ। চাই একটু স্নান আর সামান্য একটু আহার।

বেশবাসে পরিপাটি হয়ে, অসীমা সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

আরে! ভোল পাল্টালে কেমন করে? জলই বা পেলে কোথায়? যাদু জান নাকি?

অসীমার ব্যবহারটা ছেলে মানুষীর মত মনে হল। মুখে বলল, বলব কেন, অথচ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল একটা জলের নল। সবেগে ঝড়ে পড়ছে জলের ধারা।

বহুৎ আচ্ছা! থ্রি চিয়ার্স ফর অসীমা। সবাই গিয়ে জড় হ'ল নলটার সামনে। লাগল জল নিয়ে হুটোপুটি। কে কার আগে, এই নিয়ে লেগে গেল ধাক্কাধাক্কি।

যেমন তেমন করে সবাই হাত মুখ ধুয়ে নিল। ঠাণ্ডা জলে মাথাও চাপড়ে নিল।

আমলেকগঞ্জের ফারপো! চাটাই এ ঘেরা বেশ প্রশস্ত একটা টিনের ছপ্পর। টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজান। ব্রেকফাষ্ট নিতে চাও, চলে যাও সম্মুখের দিকটায়। পাবে লুচি, পুরি, চা এমন কি কফিও। পেছনের দিকে, টেবিল চেয়ারে ভাত ডালের ব্যবস্থা ও আছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় হয়ত কেউই যেতনা ওখানে, কিন্তু পেটের জ্বালা, নিঃশব্দে বসল গিয়ে সবাই।

নানা রকমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অমিত ফরমাস করল—ডাল, ভাত আর ডিম। দক্ষিণা সাতাশী নয়া পয়সা।

পাকৌড়ি আর টক্ দই যদি চাও, তাও পাবে। তবে অতিরিক্ত মূল্য ধরে দিতে হবে তারজন্য।

খাচ্ছেনা, যেন গপ্ গপ্ করে গিলছে সব। যেমন তেমন করে কিছুটা পেটের ভেতর সেধিয়ে দিয়ে, জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করল।

ড্রাইভার অনবরত হর্ন বাজিয়ে, ডেকে ডেকে অস্থির করে তুলছে। তাড়া দেবার জন্য আবার কণ্ডাক্টরকেও পাঠিয়ে দিয়েছে।

"এ্যাই বাবু লোক, এ্যাই দিদি! জলদি করো।" বেটা সাক্ষাৎ যমদূতের চেলা যেন!

এ্যাই, চিল্লাও মৎ—অমিত খেঁকিয়ে উঠল।
চুপচাপ বৈঠা রহো। পহলে পেটমে থোরা ডালনে দেও, উস্‌কো বাদ যায়গা। এত তড়িঘড়ি কেনরে বাবা।

অমিতের এক ধমকে, একদম রাইট এ্যাবাউট টার্ণ। ও বেটা ফিরে গেল, ওর উপর'লার কাছে।

খেয়ে দেয়ে, ধীরে সুস্থে, এগিয়ে চলল সব বাসের কাছে।

দেরী দেখে, অস্থির হয়ে ড্রাইভারটা ফোঁস্ ফোঁস করে গজরাচ্ছিল। কাছে যেতেই বিরক্তির ভঙ্গীতে বলে উঠল—বেশ হয়েছে, দেরী করেছ যেমন, পড়ে থাকবে রাস্তার মাঝে। ভুগবে তোমরা, আমার কি? আজ রাতে আর কাঠমাণ্ডুতে যাওয়া যাবে না।

ওরে আমার দরদী রে। যাও, যাও, আর দিগদারী কর না, এবার চল ত বাছাধন! একটা সিগারেট দিয়ে অমিত ওকে আপ্যায়ন করল। ভাই, ব্রাদার বলে, পিঠ চাপড়ে দিল।

উঠে বসল সবাই।

আর দেরী নয়, চল, ঠিক পোঁছে যাব কাঠমাণ্ডুতে।

॥ ৪ ॥

"জয় পশুপতিনাথ কি জয়" সম্মিলিত উল্লাস ধ্বনিতে কেঁপে উঠল বাসের প্রকোষ্ঠ।

গর্জ্জে উঠল এঞ্জিন। "ঘরর্ ঘর্, ঘরর্ ঘর্"। দ্রুতবেগে ছুটে চলল বাস।

মিষ্টি মুখ করো। অসীমা ব্যাগ থেকে বের করে হাতে হাতে টফি আর লজেঞ্জ বিলিয়ে দিল। মিষ্টি দিয়ে দেবোদ্দেশে যাত্রার সূচনা হ'ল।

ঘন বনানী সমৃদ্ধ তরাই অঞ্চল। উর্দ্ধে অরণ্যের আচ্ছাদন আর নীচে সর্পিল পথ। পাহাড়ের সানুদেশ ঘিরে রাস্তা। পাহাড় প্রাচীরের

গা ঘেঁসে অমিতবেগে ছুটে চলেছে যন্ত্রদানব। অল্পই উঁচু-নীচু—পথটুকু প্রায় সমতল। বাঁক আছে, তবে কঠিন নয়।

চাঞ্চল্যকর রোমাঞ্চের আস্বাদনে বাড়ে পথের সৌন্দর্য্য। অমনি পরিবেশের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে সকলে। মাঝে মাঝে পার হয়ে যাচ্ছে নামগোত্রহীন দু'চারটা ছোট ছোট বস্তি।

মাঠের ধান উঠেছে। গৃহস্থবধূরা রোদে ধান বিছিয়ে দিয়েছে, নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। ছোট শিশুগুলো মায়েদের পিঠে বাঁধা। অপেক্ষাকৃত বড়গুলো, পরম নিশ্চিন্তে গণ্ডীটুকুর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিবিড় প্রশান্তি গৃহস্থের আঙ্গিনায়।

এ পর্য্যন্ত মাত্র সাত আট মাইল পথ এসেছি। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে "চুড়িয়া" সুড়ঙ্গ—লম্বা প্রায় দু'ফার্লং। রাণা চন্দ্রসামসের ভারতের বৃটিশরাজের সহায়তায় এই সুড়ঙ্গটা তৈরী করিয়েছিলেন। বাসটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎই একটা বস্তির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বাসটা।

কি হল ড্রাইভার? উত্তর করল না। ওর আসন থেকে চুপচাপ নেমে পড়ল, মাটীতে। হয়ত এঞ্জিনটা বিগড়ে গেছে। কি হয়েছে দেখা যাক্।

ড্রাইভারটা এঞ্জিনের কাছে দাঁড়ালই না। সোজা চলে গেল একটা ঘরের বারান্দায়। বিস্তর লোকের জটলা ওখানে।

কি হচ্ছে? অধীর ঔৎসুক্য নিয়ে নেমে পড়লাম।

যা বাব্বাঃ! এ যে দেখছি মস্ত বড় একটা জুয়োর আড্ডা। একটা ছক্ পাতা রয়েছে, দান চালছে অনেকেই। কাড়াকাড়ি করে ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে ড্রাইভারও দু'চার দান চেলে দিল।

কথাটা অমিতের কানে যেতেই হৈ হৈ করে উঠল। "তবে রে! এতক্ষণ ত সময় নিয়ে কত উপদেশ দিলে, কত না আক্ষেপ করলে!"

"ছাগল তাড়াবার মত সবাইকে ঝেটিয়ে তুললে।"—তাতিয়ে দেবার জন্য শ্বেতা ইন্ধনটুকু জোগাল।

"কত মায়া কান্না কাঁদলে" উস্কে দেবার জন্য অঞ্জনা ফোড়ন দিল।

অমনি শ্বেতা আবার যোগ করল—আর এখন, এই তুমি কি সেই তুমি ?

"কি হল তোমার যাদু"—বলেই তীব্র হল্লা করে উঠল অমিত।

"এ্যাই কণ্ডাক্টর, জলদি বোলাও তোমারা ড্রাইভার কো।"

যাত্রীদের হৈ চৈ শুনে, আড্ডার মায়া কাটিয়ে ড্রাইভার ওর আসনে ফিরে বসল। স্পন্দিত হল এঞ্জিন। রুক্ষ পাহাড়ের অঙ্গন ভেদ করে ছুটে চলল বাস।

অমসৃণ, অসমতল—পথের চেহারাটা আদৌ ভাল নয়। বর্ষায় প্লাবন, ফল্ স্বরূপ ধ্বস—এ রাস্তাটার এই বিশেষত্ব। নেহাৎ দরকার না হলে হয়ত মেরামত হয় না কখনও।

উত্থান পতনের ঝাঁকানিতে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ-কাতর। এমনি করে পনের মাইল পথ টেনে এনে, ঠাণ্ডা হবার জন্য, বাসটা হেটৌরাতে পাঁচ সাত মিনিটের বিশ্রাম নিল।

নেপালের বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ নয়। একটু ধূমপানের ইচ্ছা হল। পাইপে তামাক ভরে নিলাম। লক্ষ্য করিনি, কোন সময় শ্বেতা সরে গেছে পাশ থেকে। ওর জায়গায় খুকুকে বসিয়ে দিয়েছে। তামাকের উৎকট গন্ধটা ও সহ্য করতে পারে না, অথচ পাইপটা মুখে না থাকলে, ওকে পায় কে ? আমারই পাশে বসে কতই না জমিয়ে তোলে।

হঠাৎ স্বুরু হ'ল—হি হি, হা হা, হো হো।

ও কি। আবার কি হল ! এত হাসি কেন ?

অঞ্জনা বলে উঠল—কেন, অন্যায়টা কি হল শুনি ? আপনিই ত বলেছেন সারাটা পথ হেসে হেসে কাটিয়ে দিতে। এখন আপত্তি করলে চলবে কেন ?

না, আপত্তি কর্‌লাম কোথায় ? কারণ ত একটা থাকা চাই, তাই শুধাচ্ছিলাম।

কারণ নিশ্চই একটা আছে—অঞ্জনার বেপরোয়া কণ্ঠ।

খুকু ইসারায় গোপালকে দেখিয়ে দিল।

গোপালকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে গোপাল?

"নেহি, নেহি, ক্যুছ নেহি।" গোপালের গণ্ডদেশ কেন যেন আরক্ত হয়ে উঠেছে।

"দে ছো হামারা পাস্" বলে গোপালের হাতে ধরা ঝুড়িটার দিকে খুকু হাত বাড়িয়ে দিল। গোপাল দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে সজোরে সরিয়ে দিল খুকুর হাত ছুটো।

ভাবছি, ব্যাপার তা হলে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে।

অপেক্ষা আর করতে হল না। অসীমা ঝুড়িটাকে দেখিয়ে বলল—যত অনর্থের মূল হচ্ছে ওটা। গোপালের জিম্মায় আসনের নীচে রেখে দেওয়া ছিল, কিন্তু ওর অন্যমনস্কতার সুযোগে ওটা মাঝে মাঝেই গড়িয়ে যাচ্ছিল দূরে, আর ঐ নিয়ে যত হাসাহাসি।

ওঃ! এই কথা। তা বেশ, হাস তবে।

অক্ষমতার ওপর কটাক্ষপাতে গোপাল অভিমান ক্ষুব্ধ—হয়ত তাই কঠোর করে তুলেছে ওকে।

আঁকে বাঁকে ঘুরে, উচু নীচু পথ ধরে, ছুটে চলেছে বাস। দূরে, ভৈসা গ্রামের বসতি দেখা যাচ্ছিল। অল্প কিছুক্ষণ চলার পরই গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ল বাসটা। সামান্য কিছুটা পথ এগিয়ে অতর্কিত ভাবেই প্রায় বিপরীত মুখে মোড় নিল।

উল্টে ডিগবাজী খাবার মত ছিটকে পড়ল এ ওর গায়ে। সামলে নিল অবশ্য, কায়ক্লেশে।

এঞ্জিনটা বন্ধ করে ড্রাইভার নেমে গেল। বাস, পনর মিনিট দাঁড়াবে এখানে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ গ্রামের উচ্চতা মাত্র পনেরশত ফিট হলেও

হৈমন্তিক বায়ুর কাঁপনে ছুপুরের দিকেও বেশ একটা মিঠে মধুর শীতের আমেজ ছিল। রাস্তার ছুপাশে উচু উচু পাথরের পৈঠায় সব কাঠের কোঠা বাড়ী। জানালায় সুন্দর সূক্ষ্ম জালির কাজ। নিবিড় নিঃঝুম মধ্যাহ্নের শান্তশ্রী। রোমাঞ্চকর তন্ময়তার মাঝে মনোময় হয়ে উঠেছে পল্লীর পরিবেশ।

রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে, মূর্ত্তিমান সারল্যের প্রতীক, গ্রামবাসীরা। বিদেশীদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ঔৎসুক্য আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে, কিছুক্ষণ আপদামস্তক নিরীক্ষণ করে, আবার চলে যাচ্ছে যে যার পথে।

রাস্তার পাশে ছু'চারটা পানসিগারেট আর চায়ের দোকানে বেসাতি সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। চায়ের কেটলীগুলো ফোঁস ফোঁস করে মৃছ ধ্বনি তুলেছে। অন্তরঙ্গ মধুর স্বরে দোকানী যাত্রীদের আহ্বান করছে—"চা পি লেও বাবু।"

বাবুজী! অস্ফুট আহ্বানে কাছে এসে দাঁড়াল এক পাহাড়ী কিশোরী। অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। উত্তর না পেয়ে কিশোরীটি আবার জিজ্ঞাসা করল, চা নিয়ে আসব কি ?

না – দরকার নেই।

ক্ষুণ্ণ হল নাকি ? জানি না কি ভেবে আবার বললাম—আচ্ছা চল, তোমার দোকানে গিয়ে বসি। কি নাম তোমার ?

কৃষ্ণা—উত্তর করল কিশোরীটী।

ওদের দোকানে বসে, চা ত খেলামই আবার ওর ভাই তুলসী-প্রসাদের কাছ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট ও নিলাম। ভাই, বোন ছুজনেই বেশ খুসী হল।

সঙ্গীরা এদিক ওদিক ঘুরছে। পাহাড় প্রাচীরের লতাগুল্মে ফুটে আছে বিচিত্র বর্ণের ফুল। রূপ-রংএর বিপুল সমারোহ। খুকু অতি সন্তর্পণে ওরই ছুচারটা তুলে, পরিয়ে দিল বড়দের খোঁপায়। নিজেরটাতেও গুঁজল ছু'চারটা।

কাঠের বাড়ীগুলোর পিছনটায়, শীর্ণ এক স্রোতস্বিনীর ধারা বয়ে যাচ্ছে। উপলাহত স্রোত—ঝরে পড়ছে মধুক্ষরা ছন্দে। পাগল করে তুলেছে এ পরিবেশ। বসে পড়লাম ওরই বুকে, একটা বড় পাথরের ওপর।

সম্মুখে সুউচ্চ পাহাড়ের অবরোধ—ব্যাহত হয়ে পড়ছে দৃষ্টি। পাহাড়ের বুকে জলদমালিকার হার, ভেসে চলেছে অলস মন্দাক্রান্তা ছন্দে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে, দূর দূরান্তে চলে গেছে পাহাড়ের মিছিল। এখান থেকেই আরম্ভ হবে আসল পার্ব্বত্য পথ।

পাথরটার উপর বসে বসে দেখছি—পাশের রাস্তাটা চলে গেছে পাহাড়ের গা ঘেঁসে। কিছুটা দূরে গিয়েই একটা মোড় ঘুরে, অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। কে জানে কোথায়—চলে গেছে কোন অচিনপুরীতে।

মেঘেরা উড়ে চলেছে কোন অজানা লোকে! উতলা হয়ে পড়েছি। মেঘপথ অনুসরণ করে ছুটে চলেছে মন, অনন্ত জিজ্ঞাসার কৌতূহল নিয়ে। চেতনাবিহীন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, লতাগুল্মে সমাকীর্ণ বনচ্ছায়ার ওপারে মেঘলোকের পানে। সুখদুঃখের অতীত এক অনুপম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সমস্ত ইন্দ্রিয়।

এরাই হবে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের মনিময় হার। অবক্ষয়িত হবেনা কোন কালেই। পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে মঞ্জুমাধুরীতে।

স্বপ্ন বিলাস টুটে গেল, রুমার স্পর্শে।

"বাস যে ছেড়ে দিচ্ছে—উঠুন!"

ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালাম। পা দুটো টলছে যেন! পড়ে যাচ্ছিলাম, রুমা ধরে নিয়ে চলল, বাসের দিকে।

এবার সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে রাস্তার রূপ। যন্ত্রদানবের যুদ্ধ সুরু হল রাস্তার সঙ্গে; বনময় পাহাড় ছাড়িয়ে ক্রমেই উঠে চলেছে উচুতে। পাহাড়ের আঁকে বাঁকে, ঘুরে চলেছে বাস। ড্রাইভার

বজ্রমুষ্টীতে ধরে রেখেছে ষ্টিয়ারিং। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি, নিবদ্ধ হয়ে আছে সম্মুখের পথের ওপর।

ধন্য এই নেপালী বাস চালকেরা। জন্মেছে পাহাড়ের রাজ্যে, পাহাড় প্রাচীরের মতই অটুট ওদের স্বাস্থ্য, অতুলনীয় ওদের দেহসৌষ্ঠব, অভেদ্য, অসীম ওদের মনোবল। ভীষ্মের মত স্থির, দধীচির মত ধীর। সামান্য অসাবধানতায় চরম বিপর্য্যয় হতে পারে জেনেও, চলে ওরা অকুতোভয়ে। প্রতি পদক্ষেপে উপহাস করে চলেছে মৃত্যুকে।

"ও আকাশ বল আমারে,
মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে"

মেঘে ছোঁয়া শৈলশ্যামলিমা। পাহাড়ের কোলে কোলে, ভেসে চলেছে জলদজাল, চূর্ণকুন্তল বিস্তার করে, অলসমন্থর ছন্দে। দেখতে পাচ্ছি ধরিত্রীকে অভিনব পরিবেশে, নিবিড় ঘনিষ্ঠ ভাবে। পাহাড় প্রাকারে ভীড় করেছে ওক্ আর দেওদার, চীর আর ফার্ণ। পড়েছে মসীকালো ছায়া অরণ্যলোকে। ফুটে আছে ফুল, নাগকেশরের ডালে। বন্য পারিজাতের শোভা ছড়ান গাছে গাছে, লতাগুল্মে।

বাঁকের পর বাঁক, পাহাড়ের পর পাহাড়, আদি অন্তহীন দিশেহারা। পাকচক্রে সৃষ্টি করেছে গোলকধাঁধা। মেঘে আর পাহাড়ে চলেছে কোলাকুলি, অন্তরঙ্গ খেলায় মেতেছে প্রকৃতি।

এ কি সম্মোহন! কি এ বিস্ময়! কোথায় এলাম?

এ ত শ্রীনগরের পথ নয়! উটীরও নয়। না—নৈনীতাল রাণীক্ষেতের ও নয়। তবে এ কোথায় এসেছি! এ পথ কি তবে চলেছে অমৃত লোকে?

এ পথের পথচারীর কাছে, তুচ্ছ মনে হবে শ্রীনগরের পথ। তুচ্ছ নৈনীতাল আর উটির পথ। তুচ্ছ হয়ে যাবে, সকল সরণি পরিক্রমা।

শুধুই চড়াই। উঠছি তো উঠেই চলেছি। বিরাম নেই, অন্তহীন এ চড়াই। মেঘ আস্তরণে ব্যাহত হয়ে পড়েছে দৃষ্টি। সার্চ্চলাইট জ্বেলে, বাঁকে বাঁকে হর্ন বাজিয়ে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বাস। অনুভব করছি হিমশৈত্য। শীকরসিক্ত বায়ুকণা আলগোছে বুলিয়ে দিচ্ছে কোমল হিমশীতল স্পর্শ—চোখে, মুখে, সারা অবয়বে। মন্দ বায়ু বয়ে আনে মন্দার পারিজাতের সুরভিসার। মাদকতায় ভরা এ অজানা অচেনা পরিবেশ। পুলকশিহরণ জাগে, এর প্রগাঢ় সাহচর্য্যে।

রাস্তার ফলকচিহ্নে, উচ্চতার অঙ্ক এমন বেশী কিছু নয় ; মাত্র পাঁচ হাজার ফিট। পার হয়ে গেল লামিডাণ্ডা। বাস চলেছে, সিম্বুং-জঙ্গের পথে। অনুপম রূপ! পথ সৌন্দর্য্যের বন্দনা গেয়ে চলেছে সকল যাত্রীরা। সকল আরোহীর ঐ একই কথা, নেই কি শেষ এ চড়াই পথের!

ফুঁসে ফুঁসে উঠছে এঞ্জিন, অস্থির গর্জ্জনে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—চালক পাল্টে চলেছে গিয়ার, অবিরত। চড়াইয়ের সঙ্গে চলেছে লড়াই। অবশেষে যন্ত্রদানবই হল জয়ী। চক্রযান এসে পড়েছে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, ৮০০০ ফিট উচু, সিম্বুংজঙ্গের মালভূমিতে।

দেখতে দেখতে, প্রসারিত হল উত্তর দিগন্ত। সম্মুখে অপার বিস্ময়, স্থির হয়ে পড়েছে চিন্তা ভাবনা। অবলুপ্ত হল চেতনা। অবরুদ্ধ হয়ে গেল দৃষ্টি—শতযোজন ব্যাপী পারদশ্বেত হিমমৌলীতে।

ঐ যে, ঐ দেখা যায়—সাগরমাথা, মাকালু, গৌরীশঙ্কর, হিমলচুলি, লামটাঙ্গ, গণেশহিমল, যুগলগণেশ, ধবলগিরি, মাছেপুছেরি, লোৎসে, অন্নপূর্ণা, আরও কত শত হিমশৃঙ্গ।

শ্রোণিদেশ ঘিরে ভেসে চলেছে আলুলায়িতকুন্তলা মেঘমালা। অনুপম এ রূপ! চূড়ায় চূড়ায় বিচ্ছুরিত রবিরশ্মি—স্তরে, স্তরে, রচনা করে চলেছে, রংয়ের জাল, রূপ-রসের তরঙ্গ।

ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর, তোরা জয়ধ্বনি কর! যাত্রীরা সব, হরষে পুলকিত, উল্লাসে অধীর।

"জয় পশুপতি নাথ কী জয়" ধ্বনিতে মন্দ্রিত হল বাসের প্রকোষ্ঠ, প্রকম্পিত হল পর্ব্বত গাত্র, প্রতিধ্বনি তুলল গুহাকন্দর, বিস্তৃত হল শস্য প্রান্তরে, দূর দিগন্তে।

আবার সুরু হল উৎরাই, চড়াই। তরঙ্গায়িত পথ, নামছে, উঠছে। পার হল দামান। সম্মুখ ভূভাগে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সুদূর প্রসারী শস্য প্রান্তর, ধানের শীষাগ্রে লেগেছে কাঁপন, উঠেছে তরঙ্গলহরী। পাহাড়ের স্তরতরঙ্গে বিন্যস্ত হয়ে আছে, ছায়ানিবিড় ঘরবাড়ী—রূপরম্য মূর্ত্তি ধরে, প্রতিভাসিত হচ্ছে অলকাপুরীর মত। বাস এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, পালুঙ উপত্যকার গ্রামে।

রাস্তার পাশেই একটা ছোট খাবারের দোকানের মহিলা সত্ত্বাধিকারিণী, সহাস্যে অভ্যর্থনা করল বাসযাত্রীদের। ঝুপ্-ঝাপ্ নেমে পড়ল সকল যাত্রীরা, দাঁড়াল এসে দোকানের পাশে। মিনিট কয়েকের মধ্যে, উজার হয়ে গেল সব খাবার।

বিকাল পাঁচটা বেজেছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টার মত চলে, আমরা এসেছি মাত্র ৬১ মাইল পথ। কাঠমাণ্ডু আরও ৪১ মাইল দূরে।

পালুঙ উপত্যকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফিট উচু। বিকালের দিকটায় তাই বেশ শীত শীত লাগছে। অনেকেই গরম অঙ্গাবরণ বের করে নিল; বসল চেপে, ঢেকেঢুকে।

সেই একঘেয়েমী, একই ভাবে সরীসৃপের গতিভঙ্গিতে ছুটে চলল বাস। একই ভাবে চলতে লাগল, চড়াই উৎরাই করে—বাঁকে বাঁকে ঘুরে। মাঝে মাঝে, সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, ধরা দিচ্ছে তুষারশীর্ষগুলি। বাসের ঘুরপাকে কখনও পড়ছে ডানদিকে, কখনও বাঁ দিকে।

এবার নূতন কিছু দেখছি। দেখছি পাহাড়ের গায়ে দেব-দেউলের সিঁড়ির মত স্তরে স্তরে, বিন্যস্ত, চাষের জমিতে শষ্পশয্যা। আশে পাশে দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট বস্তি। এরই মধ্যে হয়ত গৃহস্থ বধূরা

উনুনে আগুন জ্বেলে দিয়েছে ; খড়ের চাল ভেদ করে, ওপরে উঠে চলেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কোথায় আবার হারিয়ে গেল সেই স্তরবিন্যস্ত চাষের পাহাড়। পড়ে রইল পিছনে চালাঘর। এবার পথ চলেছে, গভীর শৈলারণ্যের ভেতর দিয়ে।

শত সহস্র বাঁকের স্মৃতি মুছে ফেলে, উপত্যকা, অধিত্যকা আর মালভূমির অঙ্গনের মায়া কাটিয়ে চলেছে যন্ত্রদানব ঊর্দ্ধশ্বাসে। দিনান্তের আলো ম্লান হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে। আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, নেমে এসেছে অরণ্যানীতে। সূর্য্য চলে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। ম্লান পাণ্ডুর পারিপার্শ্বিক। প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বনাঙ্গন।

জ্বলে উঠল যন্ত্রদানবের চোখ দুটো। উজ্জ্বল আলোতে পথের সন্ধান করে এগিয়ে চলেছে, অতি সন্তর্পণে। পার হয়ে গেল কৃষ্ট্যাং, সোপ্যাং আর দু'চারটা ছোট ছোট গ্রাম। আটক হয়ে পড়ল বাস, থানকোটের কাছাকাছি খানিকুলা চেকপোষ্টে।

প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলল, শুল্ক কর্ম্মচারীরা। কিবা নাম, কুত্র ধাম, কি উদ্দেশ্য, কোথায় পরিচিতি পত্র—এমনি অনেক কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে, কাঠমাণ্ডু সহরে ঢুকবার অনুমতি পাওয়া গেল।

প্রায় সমতল—মসৃণ, উপত্যকার পথ ধরে চলেছি। স্বতঃই প্রতীতি হচ্ছে, নিষিদ্ধ সহর কাঠমাণ্ডু আর বেশী দূর নয়।

দু'ধারে সাজান গাছের সারি, পিচ্ ঢালা পথ। দূরে, উচু, নীচু স্তরে দেখা যাচ্ছে, বিজলী আলোর ছটা।

পিছনে বনভূমি মিশে গেছে অন্ধকারে। সম্মুখে তুষারচূড়ায় বিকীর্ণ হচ্ছে শুভ্র চন্দ্রমার কুন্দস্বচ্ছ অংশুকজাল। চারদিকে আলোক-লহরী, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সকল অনুভূতি, সম্মুখের অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে।

কাঠমাণ্ডু সহর! অঙ্গে তুলে ধরেছে বর্ণাঢ্য বিচিত্র জড়োয়ার

সাজ। মদিরঅলস আঁখি মেলে, দাঁড়িয়ে আছে, রূপসী মনোরমার ভঙ্গিতে। মুগ্ধ হয়ে পড়েছে সমস্ত উপলব্ধি, বশীভূত হয়ে পড়েছে সমস্ত ইন্দ্রিয়। মোহময়ীর মনোহারিণী সজ্জা কেড়ে নিয়েছে মন।

এসে পড়েছি যেন রূপ কথার দেশে। ভাবাবেশ গেল টুটে। দ্রুতগতিতে ঢুকে পড়ল বাস সহরের ভেতর। বেশ বড়বড় বাড়ীঘর, সাজানগোছান দোকানপাট। চারদিকে বৈচিত্র্যময় চমৎকারিত্বের লুব্ধ-আকর্ষণ। নিয়ন আলোতে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। আড়ম্বরের ত্রুটি নেই কিছু।

সহরের মধ্যে দু'চারটা পাক খেয়ে, গাড়ী এসে দাঁড়াল, নেপাল ন্যাশনাল রোড ওয়েজ অফিসের পাশে।

অজানা, অচেনা পরিবেশ। জনবিরল, স্বল্পালোকিত পথঘাট। রাজ-ধানীর জৌলুসটা কমে গেছে এখানটায়। ড্রাইভারের জোর তাড়াতে নেমে দাঁড়ালাম, উন্মুক্ত পথে। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসছে হিম-শীতল বায়ু। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল সবাই।

॥ ৫ ॥

বাস থেকে নেমে, কাঠমাণ্ডুর মাটিতে প্রথম পদপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নেপালের ঘড়ি ঢং ঢং আওয়াজ তুলে জানিয়ে দিল রাত নটা। বাসের মাথা থেকে কৃষ্ণ বাহাদুর মালপত্র নামিয়ে নিল। ওর দু'চার জন আত্মীয়, কাছাকাছি থাকে। সাময়িক কিছু একটা ব্যবস্থার উপায় স্থির করতে হবে, তাই কৃষ্ণ বাহাদুর চলে গেল ওদের কাছে। এদিকে গোপালের শোচনীয় অবস্থা। গায়ে গরম জামা কাপড় নেই। মাথাটা আর কান দুটো, জড়িয়ে নিয়েছে একটা গামছা দিয়ে। ওতে কি হয়! হি—হি—করে কাঁপুনি, বন্ধ হলনা কিছুতেই। স্তব্ধ, নিশ্চুপ—কৃষ্ণ বাহাদুরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল সব, পথের ধারে।

অমিত একাএকাই চলে গেল, হোটেলের খোঁজে। আমিও চুপচাপ কিছুক্ষণ সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম। সম্মুখের বাড়ীটার মাথায় "পারাস হোটেল" নামটা জ্বলজ্বল করছে। একবার চেষ্টা করে দেখলে মন্দ কি! এগিয়ে চললাম ঐদিকে। ম্যানেজারের ঘরে ঢোকবার মুখে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না। দু'চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে, টেবিলের ওপর বোতল গ্লাস সাজিয়ে, সবে মৌজে বসেছেন ভদ্রলোক। তাই ত! বিনা নোটীশে ঢুকে পড়লে বিরক্ত হবেন কি!

দরজার চৌকাঠ আর মাড়াতে হল না। ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন—কি চাই। ওখান থেকেই উত্তর করলাম,—বিদেশী অতিথি। আজ রাতের মত একটু আশ্রয় চাই। যাত্রীর সংখ্যা শুনে বললেন—নিরুপায়! এতজনের যায়গা আমার এখানে হবেনা। অন্যত্র চেষ্টা করে দেখুন। বিশেষ দুঃখিত!

তবুও, ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়ালেন। অঙ্গুলি সঙ্কেতে বললেন—ও দিকটায় যান, দু'চারটে হোটেল আছে। হয়ত মিলেও যেতে পারে আস্তানা।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণ বাহাদুরও ফিরে এসেছে। বলল—ওর আত্মীয়েরা হোটেলের খোঁজে গেছে, ফিরে আসবে এখনি: অমিতের কোন খবর নেই।

কৃষ্ণ বাহাদুরকে রেখে চললাম নির্দ্দেশিত পথ ধরে। পাশ দিয়ে টলতে টলতে, চলে গেল দু'চারজন পথচারী। রাতের কাঠমাণ্ডুর চেহারা দেখে, বেশ অস্বস্তি আর আতঙ্কিত বোধ করছি। উপায়হীন! তাই এগিয়ে চললাম ক্ষিপ্রপদে। মিলল একটা হোটেল। এখানেও পারাস হোটেলের দৃশ্যই অভিনীত হচ্ছে। পানপাত্র উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, দ্রাক্ষারসে। আমাদের অসহায় অবস্থার কথা জানালাম ম্যানেজারকে।

ঐ একই কথা। না এখানেও জায়গা হলনা।

বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কিছুটা বিপন্নও বোধ করছি। অতি অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। শেষে কি রাস্তার ফুটপাথেই আশ্রয় নিতে হবে! না—আর চিন্তা করতে পারছি না। ফিরে এলাম সঙ্গীদের কাছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

আশার বাণী নিয়ে ফিরে এল অমিত। "জায়গা মিলে গেছে, চল হিমালয় হোটেলে।" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আজ রাতের মত আশ্রয় মিলল তাহলে। কৃষ্ণ বাহাদুর সাইকেল রিক্সার ওপর মালগুলো চাপিয়ে দিল। এসে গেলাম হিমালয় হোটেলে।

কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। তড়্‌তড়্‌ করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম তেতলার একটা ঘরে। কৃষ্ণ বাহাদুর স্তূপীকৃত মালের বোঝা দিয়ে প্রায় ঢেকে ফেলেছে ঘরটাকে। ঘরের দেয়ালে আর সমস্ত আসবাবপত্রে পুরু হয়ে জমে আছে এক পরদা ধুলো। কার্পেটের অবস্থা ও তথৈবচ।

চোখদুটো বুজে আসছে ঘুমে। দেয়ালের ধার ঘেঁষে টেনে নিলাম, ছোট একটা চারপায়া। বিছিয়ে দিলাম হোল্ডলটা, লুটিয়ে পড়লাম ওর ওপর।

চেতনাবিচ্যুত অবস্থায়, অঘোরে কেটে গেল প্রায় সারাটা রাত, জেগে উঠলাম অন্তিম প্রহরে। নিঃশব্দ নিথর চারদিক, বিছানা ছেড়ে, দাঁড়ালাম এসে বারান্দায়। চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ শূন্যলোকে। আকাশের বক্ষলগ্ন হয়ে দু'চারটা তারা ম্লান নিষ্প্রভ আলোতে মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। কাঠমাণ্ডু সহরের ঘুম অবশ্য তখনও ভাঙেনি। আবার ফিরে এলাম ঘরের ভেতর।

সঙ্গীরা কে কোথায়? দেখছি, কৃষ্ণ বাহাদুর শুয়ে আছে আমার খাটের পাশটায়। ঐ একই শয্যায় কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে গোপাল। অন্যদিকে, পরপর আরও কয়েকটা শয্যা পাতা রয়েছে। রুমা আর অসীমা শুয়ে আছে একটায়, খুকু আর মাধবী অন্য একটায়, সতীর গলা জড়িয়ে রয়েছে নীরু।

চুপচাপ আর কতক্ষণ থাকা যায়! কৃষ্ণ বাহাদুরকে ডাকলাম।

"জী! ভোর হয়ে গেছে নাকি।" ধড়ফড় করে উঠে বসল, ও।

"না—ভোর হয়নি এখনও তবে আর বেশী বাকীও নেই।"

আচ্ছা, একটু চা, পাই কোথায় বল ত?

বিছানার কিছুটা অংশ গুটিয়ে রেখে, ষ্টোভে গরম জল চাপিয়ে দিল কৃষ্ণ বাহাদুর। ওরই কিছুটা দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। শুনতে পাচ্ছিলাম, চায়ের দোকান থেকে ভেসে আসছে ঠুং ঠাং শব্দ। তাই কৃষ্ণ বাহাদুরকে বললাম, চা আর করতে হবে না। দোকান থেকেই নিয়ে এস। কৃষ্ণ বাহাদুর বেরিয়ে গেল।

হোটেলের অন্য সব ঘরে, তখনও কোন সাড়া শব্দ নেই। অধিবাসী আর কেউ আছে কি না, বোঝা গেল না।

গ্লাস বোঝাই করে, কৃষ্ণ বাহাদুর চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে এল। ততক্ষণে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। গোপালকে ওর মামা এসে নিয়ে চলে গেল। অন্য সঙ্গীরা তখনও বিছানায় পড়ে আছে। বেশ কিছুটা বেলা হবার পর উঠল।

সূচনা হল নেপালের প্রথম প্রভাত।

শারদীয়া পূজার আজ নবমী তিথি। নেপালের অধিবাসীরা সবাই শক্তির পূজারী, তাই এই মহানবমীর দিনটি ওদের এক স্মরণীয় পুণ্যতিথি। ঘরে ঘরে মহোৎসব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চলেছে সারি বেঁধে। চূয়া-চন্দন, ধূপ আর পুষ্পে সাজান পূজার অর্ঘ্য হাতে চলেছে মেয়েরা, মায়েরা, সবাই। রঙীন বসন-ভূষণে আচ্ছাদিত হয়ে ওরা চলেছে তালেজু মাঈর মন্দিরে।

মহাসমারোহে বলি চলে এই মন্দিরে, অষ্টমীর রাত থেকে। কাতারে কাতারে, জমা হয় মোষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী আরও অনেক পশু। উৎসর্গের আগে, সিন্দূর আর চন্দনে লিপ্ত করে দেওয়া হয় ওদের ললাটদেশ। গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় ফুলের মালা।

হায়রে নিরীহ পশু! জানতেও পারেনা কখন উড়ে যায় ওর মুণ্ডটা, খুরকীর এক আঘাতে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশুবলি, নেপালের এক অননুকরণীয় জাতীয় উৎসব। শরতে শক্তি পূজা, নেপালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান। "সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে"—রূপে নয়, নেপালবাসীরা দেবীকে পূজা করে শক্তির আধার রূপে। ওদের উপাস্য—দেবী কালিকা, ভবানী, নয়ত মহিষাসুরমর্দ্দিনী। নবরাত্রি ব্যাপী চলে এই উৎসব। সুরু হয়, মহালয়ার দিনটি থেকে, সাঙ্গ হয় দশমীর প্রভাতে, তারপর চলে বিজয়া উৎসব।

বাংলা দেশে, বাড়ীতে বাড়ীতে যেমন মূর্ত্তি গড়ে পূজা হয়, নেপালে কিন্তু তেমনি পূজার কোন রীতি নেই। ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, পূজার অর্ঘ্য নিয়ে আসে মন্দিরে, আর পূজা হয় সেখানেই।

বেশ কিছুটা বেলা হয়ে গেছে। ভোর হবার পরেও, দু'চার ঘণ্টা চলে গেল, তবুও কর্ত্তৃপক্ষের কোন হুঁস নেই। কলে জল নেই, স্নানের গরম জল চাইলেও মিলছে না। কাঞ্চা, কাঞ্চী, বয়, ডেকে ডেকে হয়রান—কেউ উত্তর দিচ্ছেনা। এদের পরিচর্য্যার অব্যবস্থায় মেজাজ বিগড়ে গেছে, অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে সবাই।

সকাল বেলার চা, জলখাবার এখনও আসেনি, বেলা আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। পাঞ্জাবী মালিক, কানে তুলো গুঁজে বসে আছেন। অগত্যা, সতী আর অঞ্জনা, ঢুকে পড়ল রান্না ঘরের ভেতর। এদিক সেদিক থেকে, জোগার করে নিল কয়েকটা ডিম। রুটি কেটে, সেঁকে নিল, ওতে মাখন মাখিয়ে, ডিমের পোচ করে, নিজেরাই সব নিয়ে, বসল এসে চায়ের টেবিলে। টিপটে চায়ের পাতা ভিজছে। ওর মাথায় একটা টুপি বসিয়ে ঢেকে রেখে দিল। কৃষ্ণ বাহাদুর বা'র থেকে একটু দুধ নিয়ে আসার পর চা হল। যাক্, সকালের ত কিছু একটু হল, দুপুরের ব্যবস্থা কি হবে কে জানে!

অসীমা আর মাধবী, ভীষণ উতলা হয়ে পড়েছে। যেমন করে হোক, অন্যত্র একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে, চুক্তি করে নিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা সুব্যবস্থা হয়, ওরা ঘুরবে হোটেলে হোটেলে। ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদা ভাবে অমিতও বের'ল।

বসে আছি ব্রেকফাষ্ট হলে। হোটেলের এ দিকটা রেস্তোঁরার মত ব্যবহার হয়। বাইরের খদ্দেরও আসে। রাস্তার দিকটায় কাঁচের দে'য়ালে, বেশ ফলাও করে "এ্যারোমা" নামটাকে জাহির করা হয়েছে। সমস্ত রাস্তার দৃশ্যটা ঘর থেকে ধরা পড়ে। ঘরখানা হোটেল-মালিক বেশ রুচিমাফিকই সাজিয়েছেন। বাইরের এই চুণকামে, বোঝে সাধ্য কার, যে ভেতরে এত জঞ্জাল আর আবর্জ্জনা রয়েছে।

বেয়ারা খবর নিয়ে এল, কে এক ভদ্রলোক আমার খোঁজ করছেন।

এখানেই পাঠিয়ে দাও—বলে বেয়ারাকে ফিরিয়ে দিলাম। কিছুটা বাদে, অল্পবয়স্ক এক তরুণ এসে সম্মুখে দাঁড়াল।

আমি মানব—স্মিতহাস্যে নিজের পরিচয় দিল তরুণ ছেলেটী।

কিছুক্ষণ থেমে বিনীত ভঙ্গীতে বলল—দাদার কাছ থেকে ফোন-গ্রাম পেয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। আপনাদের না পেয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে, অনেকটা রাত্রে বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

তাই নাকি! খুব দুঃখিত। অকপট সহানুভূতি জানালাম।

কিছুটা থেমে মানব আবার বলল—একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু কোনটাতেই আপনাদের না পেয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। আপনারা আসেননি, একথাটা বিশ্বাসও হচ্ছিল না। বাস-কর্ত্তৃপক্ষও কোন সদুত্তর দিতে পারল না। দুর্ঘটনা কিছু হয় নি ত? জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাল, সব বাসই নিরাপদে এসে গেছে।

কি হল তবে?

ব্যাপারটা মীমাংসার জন্য মনটা ছটফট করছিল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই তাই আপনাদের তল্লাসে বের হলাম। আচ্ছা বলুন ত— কখন এসে পৌঁছলেন আর কোনখানটায় বা নামলেন! বাস ষ্ট্যাণ্ডে নিশ্চয়ই নয় ?

প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস এনে বললাম—এই ত দেখতে পাচ্ছ, সশরীরে বহাল-তবিয়তে হাজির আর কাল রাত নটাতেই এসেছি। জায়গাটার কথা, কাল রাতের বিষম পরিস্থিতি আর দুর্ভোগের কথাগুলো বলতেই সব জিনিষটা মানবের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

এর জন্য নিজেই যেন অপরাধী এমনি ভাব দেখিয়ে মানব বেশ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে বলল—আচ্ছা দুর্ভোগ হল ত ?

দুর্ভোগ! সে ত কিছুটা হল। বিড়ম্বনা আর দুর্ভোগটা তোমারই বা কি কম হল শুনি ? রাত, দুপুর পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় কাটালে! পাল্টা মানবকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমারও একটু কৌতূহল হচ্ছে আশা করি তা বলবে। এখানে যে আমরা আছি এ খবরটা পেলে কোথায় ?

সে এক ভারী মজার ব্যাপার! আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই হোটেল থেকে হোটেলে টহল দিতে শুরু করলাম। ঘুরতে ঘুরতে এলাম, হিল ভ্যু'তে! হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু। ওর ওখানে বসে আছি এমনি সময় দুই ভদ্রমহিলা এসে ঘরের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন আর ঐ সঙ্গে আপনার নামও করছিলেন। অমনি ছুটে এলাম আপনার কাছে।

যাক্, ধরে নাও, সবই চুকে বুকে গেছে। পুরানো কাসুন্দি ঘেটে আর কি হবে ?

মানব প্রশ্ন করল—হিল ভ্যুতে উঠে যাচ্ছেন ত ? নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করলাম—হিল ভ্যু, হেল ভ্যু—আমার আপত্তি নেই কিছুতেই।

মানব হেসে উঠল।

কুলি আর সাইকেল রিক্সা নিয়ে এসে অসীমা আর মাধবী তখনি

সোরগোল তুলল। এক্ষনি, এই মুহূর্ত্তে, ছেড়ে যেতে হবে এই আস্তানা।

বাব্বাঃ! বাঁচা গেল এ বেটাদের হাত থেকে।

"কৃষ্ণ বাহাদুর, কৃষ্ণ বাহাদুর!" দু'চারবার ডেকে নিজেরাই কোন রকমে মুটেদের মাথায় মাল ওঠাতে লাগল। ততক্ষণে কৃষ্ণ বাহাদুরও এসে গেছে। ওদের একপাশে সরিয়ে দিয়ে মালপত্রগুলো গুনে গেঁথে বলল—চলুন।

আর বিলম্ব নয়—পথে নেমে এল সবাই। এগিয়ে চলল হিল ভ্যু হোটেলের দিকে।

হিল ভ্যু হোটেলে উঠে এলাম।

সামান্য কয়েকদিনের জন্য গৃহস্থালী, তারই জন্য কত না যত্ন! সাজাতে গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সকলে মিলে। ফাই-ফরমাসে অস্থির করে তুলল হোটেলের বেয়ারা সন্তুনকে। এই মুহূর্ত্তে হুকুম হচ্ছে ধোয়ান টেবিলক্লথ, পর মুহূর্ত্তেই চাই বিছানার চাদর, ফ্লাওয়ার-ভাস্ আরও কত কি। বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে নিল ঘরগুলো, যেন চিরকালটাই কাটাতে হবে এই ঘর কয়টা আশ্রয় করে।

সামান্য চা আর একটু জলযোগ করে সবাই টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আজ আর কোন কাজ নয়। সারাদিনটা কাটাবে শুধু আলস্যে। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে দুপুরের পর মানব ফিরে গেল। প্রিয়জনদের সাথে মিলবার আশায় কৃষ্ণ বাহাদুরও চলে গেল ওর মচ্ছিনাথ গ্রামে।

কোন এক ফাঁকে অমিতও যেন কোথায় বেরিয়ে গেছে। খবর নিয়ে এল, ভারতীয় দূতাবাসে খুব ধূমধাম করে প্রতিমা গড়ে পূজা হচ্ছে। আয়োজনের কোন কসুর নেই, প্রায় বাংলাদেশের মতই জমকাল।

উদ্যোগীরা সব উড়োজাহাজে করে কলকাতা থেকে প্রতিমা এনেছে। প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনার মাঝে চলেছে উৎসব। ডাঃ চৌধুরী, মিস্টার রায় আর জনাকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সন্ধ্যারতি দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মন্দ কি! আজ যখন আমাদের দিনপঞ্জীর পাতাটা একেবারে ফাঁকা, তখন দূতাবাসেই কাটান যাবে সন্ধ্যাটা। সেই ভাল, রাজী হয়ে গেল সবাই।

শুয়ে, গড়িয়ে, গল্পগুজবে, বিনা কাজে, কেটে গেল সারাটা দুপুর। বিকালের দিকে বেয়ারা চা আর খাবার দিয়ে গেল। সমস্ত দোতলাটাই সন্তন বাহাদুরের জিম্মায়। এমনি করে, ছুটোছুটি করতে হয়, সাতটা কামরায়, সবার মর্জি জুগিয়ে চলতে হয়। দু'দণ্ড গল্পগুজব করবার ফুরসৎ কোথায় ওর? এর ওটা, ওর সেটা, অনবরত ফাই-ফরমাস খেটে চলেছে বেচারা। এই শীতের মাঝেও স্বেদ-বিন্দু জমেছে ওর ললাটে।

হোটেলের সামান্য খাবারে অমিত তৃপ্তি পায়নি। না বলে, না কয়ে, চাঙারি বোঝাই সিঙ্গারা, কচুরী আর ভাজাভুজি কিনে নিয়ে এসেছে।

নাও, নাও, কিছু কিছু করে সবাই নাও, বলতেই প্রায় খণ্ডযুদ্ধের উপক্রম আর কি!

এ কি কাণ্ড করেছ, তোমার কি কোন জ্ঞানগম্যি নেই! সব কি রাক্ষস, গিলবে এত এত করে—ঝাঁঝিয়ে উঠল অঞ্জনা।

কারো মেজাজকে ভয় করেনা অমিত। নির্ব্বিকার, নিরুদ্বেগ ভাবে বলল—না পার ত দিয়ে দিও এই অধমকে, কিছু ফেলা যাবে না। টপাটপ চলে যাবে এরই ভেতর, বলে পেটটায় হাত বুলোতে লাগল।

দুজনার মধ্যে জোর কথা কাটাকাটি চলছিল। অসীমা এসে দাঁড়াল মাঝখানে। প্রায় গুরুমশায়ের চাল অসীমার। ওই ভঙ্গীতে, একটা

ছোটখাট উপদেশও দিয়ে ফেলল। বেড়াতে এসে ওসব কি হচ্ছে? আগেই ত বলা আছে, শুধু হাসবে, তা নয় যত সব বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। নাও, তৈরী হয়ে নাও, বেরিয়ে পড়া যাক দূতাবাসের উদ্দেশে।

অসীমার মধ্যস্থতায় স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল দুজনের চোখে।

বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ল সবাই। স্থানীয় পথচারীরা কেউই দূতাবাসের দূরত্বের পরিমাপ দিতে পারছিল না। একজন বলছে এক মাইল হবে, আর একজন বলছে দু মাইল। হয়ত বা তার চাইতেও বেশী। অগত্যা পায়ে হেঁটে যাবার আশা ছেড়ে দিতে হল।

দেখি জীপ-টীপের কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা, বলেই, অমিত অদৃশ্য হয়ে গেল।

দলের দু' একজন এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ল। আমি আর খুকু আসানটোলের মোড়টায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সবাই এসে ওখানেই মিলবে।

পথ হেঁটে যাচ্ছিলেন এক তরুণ দম্পতী। ইতস্ততঃ করে, ভদ্র মহিলা এগিয়ে এলেন। খুকুকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন—কবে এসেছ ভাই?

একটু হেসে খুকু জবাব দিল—কাল রাতে।

কেমন লাগছে এ দেশ!

সবে ত কাল এসেছি, এরই মধ্যে লাগালাগি কি! কিছুই ত দেখাশোনা হল না। ফট্ করে একটা কিছু বলে দেব সেই বা কেমন? তবে মন্দই বা কি? দার্জ্জিলিং, সিমলা, নৈনীতাল, শ্রীনগর—এমনি সব পাঁচটা পাহাড়ী সহরের মতই। আবহাওয়াটা কিন্তু চমৎকার!

এবার খুকু পাল্টে জিজ্ঞাসা করল—আপনাদের কেমন লাগছে তাই বলুন।

কেমন আর লাগবে! আমাদের ভাই পাকাপাকি গৃহস্থালী এখানে। স্বামীকে দেখিয়ে বললেন—উনি এখানকার বাটা সু সপের

ম্যানেজার। এখানে প্রায় তিন বছর ধরে আছি। দেশও যা বিদেশও তাই। আমাদের কাছে জগতের পরিধি সীমাবদ্ধ। পারিবারিক জীবনেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের জগৎ। ওর ছুটিছাটায় অবশ্য মাঝে মাঝে এদিক সেদিক যাই।

কিছুটা সময় থেমে ভদ্রমহিলা খুকুর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললেন, এস না ভাই আমাদের ওখানে একদিন।

কালই এস। ভাল দিন, কাল বিজয়া দশমী। খুকুকে কোন উত্তর না দিতে দেখে ভদ্রমহিলা প্রায় ভগ্নাশা হয়ে পড়লেন।

এ অনুনয়টুকু এড়াবার মত ক্ষমতা হল না। আচ্ছা যাব বলে তবে রেহাই পেল খুকু।

ভদ্রমহিলা ঠিকানা লিখে এক টুকরো কাগজ খুকুর হাতে গুঁজে দিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই প্রীতি আর আগ্রহটুকু দেখে মুগ্ধ হ'লাম। দুঃখ রইল, শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রমহিলার ওখানে আমাদের যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এর মধ্যে দলের আর সবাই এসে জড় হয়েছে। অলস পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সব মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দিরে।

সোনার পাতে মোড়া এর শীর্ষ দেশ, সোনার পাতে ঘেরা এর স্তম্ভ সকল। বিস্ময় লাগছে, মন্দিরের বৈভব দেখে।

রূপকথা আর উপকথার দেশ এই নেপাল। কত যে সুন্দর সুন্দর কাহিনী ছড়িয়ে আছে চারদিকে, শুনে আশ্চর্য্য লাগে।

অনেক নাম—নানা আখ্যায় বিভূষিত এই মচ্ছেন্দ্রনাথ বিগ্রহ। কেউ বলে শ্বেত-মচ্ছেন্দ্রনাথ, কেউবা বলে শ্বেত-লোকেশ্বর। আবার অনেকেই বলে বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব আর্য্য লোকিতেশ্বর। বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় এ চরিত্র এক সুমহান অধ্যায় অধিকার করে আছে। গোরক্ষনাথ নামে এক সাধু মহাপুরুষ দীক্ষা নিয়েছিলেন, এই মচ্ছেন্দ্রনাথেরই কাছে।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখছি, সতী আর অঞ্জনা মচ্ছেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্ত্তা সুরু করে দিয়েছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নীরু। প্রশ্ন করলাম—তোমার বন্ধু সেই ডাক্তার পূর্ণেন্দুর কাছ থেকে এই মচ্ছেন্দ্রনাথের কি একটা কাহিনী শুনেছিলে বলছিলে না?

নীরু এড়িয়ে যাবার অছিলায় বলল— সব ভুলে গেছি, কিছুই মনে নেই।

সবিস্তারে না বললেও হবে। যেটুকু জান, ছোট করে দু'কথায়ই বল না। নম্র অনুনয়ের আবেদনে নীরু সাড়া দিতে বাধ্য হল।

উপকথাটা শোনার জন্য সবাই বেশ আগ্রহশীল মনে হচ্ছে।

নীরুকে বলতেই হল—সেটা নেপালের মধ্যযুগ। কোন এক সময় কাঠমাণ্ডুর রাজা নরেন্দ্রদেব গোরক্ষনাথকে তার উপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসী, মনোকষ্টে তাই চলে যান কাঠমাণ্ডু সহর ছেড়ে, দূরে এক পাহাড়ে। আশ্চর্য্য এমনি যে গোরক্ষনাথ কাঠমাণ্ডু ছেড়ে যাবার পরেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, নানা রকমের লাঞ্ছনা সইতে হল রাজাকে। পরপর কয়েক বৎসর ধরে চলল, অনাবৃষ্টি আর অজন্মা। মহামারীর কবলে পড়ল কাঠমাণ্ডু। সাধারণের বিশ্বাস, সবই নাকি এই সাধুকে অবমাননার ফল।

রাজা কিছুতেই একথা মানতে চাইলেন না, আবার প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতেও সাহস হল না। প্রজার কল্যাণে তাই রাজা গোরক্ষনাথের গুরু মচ্ছেন্দ্রনাথের কাছে এলেন। মচ্ছেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় গোরক্ষনাথ আবার ফিরে এলেন কাঠমাণ্ডুতে।

এল বরষা। জন্মাল শস্য সম্পদ, প্রাচুর্য্যে ভরে উঠল মাঠ ক্ষেত, দূর হ'ল মহামারী।

সেই থেকে কাঠমাণ্ডুর সর্ব্বসাধারণ, মচ্ছেন্দ্রনাথের স্মরণে, বর্ষার প্রারম্ভে প্রতি বৎসর জাঁকজমক সহ এক উৎসব করে।

অমিত এসে তাড়া লাগাল। কোথায় যেতে হবে ভারতীয়-দূতাবাসে, তা নয় জমে গেছ এখানে। চল, চল, জীপ নিয়ে এসেছি আর দেরী নয়।

পাণ্ডাদের কবলিত হবার আগেই মন্দির অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসে, সবাই চেপে বসল জীপে।

দূতাবাসের প্রাঙ্গণে আসতে সামান্যই সময় লাগল। নেমে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ চৌধুরী আর মিসেস্ চৌধুরী এগিয়ে এলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা চলল। মিসেস্ চৌধুরী, অপেক্ষ না করে সঙ্গিনীদের নিয়ে চলে গেলেন অন্য দিকে। ইতিমধ্যে মিঃ রায়ও এসে জুটলেন। নানাধরণের আলাপ চলতে লাগল। বেশীর ভাগই কাঠমাণ্ডু আর আশেপাশের ভাল লাগবার মত জায়গাকে কেন্দ্র করে। কবে ললিতপুর, কবে ভকতপুর, কখন কি ভাবে কোথায় যাওয়া যাবে, কি কি দেখতে হবে, মুখেমুখেই এক বিরাট ফর্দ্দ রচনা করলেন মিঃ রায়।

শুনেছিলাম মিঃ রায় একবার গল্প স্থুরু করলে কিছুতেই থামেন না। এখানে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া গেল। পূজাপ্রাঙ্গণে আরতি হচ্ছে, তা দেখতে না দিয়ে ভদ্রলোক আটকে রাখলেন আমাদের।

অন্তরাল থেকে চাপাস্বরে কে যেন বলে উঠলেন, ও বাবা! বাঘের খপ্পরে পড়েছে যে! অন্য আরেকজনকে উদ্দেশ করে বললেন—ওহে, ভদ্রলোকদের ঐ অক্টোপাশের হাত থেকে উদ্ধার কর ত, নইলে মারা যাবেন যে ওরা। আরও ছু' চারজন এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। কথা বলতে বলতে পূজা বেদীর দিকে এগিয়ে চললাম।

বিস্তৃত জায়গা ঘিরে মস্ত বড় পূজামণ্ডপ তৈরী হয়েছে। সম্মুখে অভিনয় মঞ্চ। কালো যবনিকা ঢেকে রেখেছে মঞ্চকে। আজকের অনুষ্ঠান এখনই স্থুরু হবে। এই উৎসব চলছে তিনদিন ধরে। আজই সমাপ্তির দিন।

আজকের আকর্ষণ নাচ, গান, আবৃত্তি আর বিরিঞ্চীবাবা নাটিকার অভিনয়। শিশু আর কিশোরে মণ্ডপটা গিজগিজ করছে। প্রায় সম্পূর্ণ জায়গাটাই দখল করে রেখেছে ওরা। ওদের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে পূজাপ্রাঙ্গণ।

দূতাবাসের আর নেপালের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য কিছুটা যায়গা পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে রাখা আছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নেপালের দু' চারজন বেতারশিল্পী আর সাহিত্যিকও আছেন।

বেশ মঞ্জু পরিবেশ। ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত, শিশুদের অনাবিল আনন্দে আর কোলাহলে মুখরিত পূজামণ্ডপ।

বয়স্কদের মধ্যে বর্ত্তমান রাজনীতি, সাহিত্য, নয়ত শিক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হাল্কা হাল্কা টুকুরো টুকুরো সাময়িক আলোচনা আর প্রীতিকর সাহচর্য্যে সময়টা কোন দিক দিয়ে কেটে গেল টেরই পাওয়া গেল না।

মঞ্চের পর্দ্দা উঠল। সারি বেঁধে কিশোর কিশোরীরা মঞ্চে এল। একতানের সঙ্গে চলল, চঞ্চল পদক্ষেপ। নৃত্যের তালে তালে বেজে উঠল মঞ্জীর সীঞ্জিনী। "নিকষিত হেম গোপীজন প্রেম"—রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমের আবেদনে, নৃত্যালেখ্যের ভাব বস্তুতে আর সাবলীল গতিতে মুগ্ধ হল দর্শকেরা।

"সাধু, সাধু" রবে প্রতিধ্বনিত হল মণ্ডপ। কালো যবনিকা ঢেকে দিল মঞ্চকে।

স্তুতি করতে হয় মিসেস চৌধুরীকে, যিনি অনেক তালিম দিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে, তৈরী করেছিলেন আলেখ্যটি।

সামান্য বিরতির পর আবার অপসারিত হল মঞ্চের কালো যবনিকা। শিল্পী দশরথ মানসিং, মিষ্টি মধুর ভজন পরিবেশন করলেন।

আতিথেয়তা আর সৌজন্যের চূড়ান্ত করলেন মিসেস চৌধুরী, ভরে উঠল মন। রাত হয়ে গেল অনেকটা। বিরিঞ্চীবাবা অভিনয় আর দেখা হল না। এই অপরূপ সন্ধ্যাটি নেপালের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে অনেকদিন।

জীপে চেপে ফিরে এলাম হোটেলে। ম্যানেজার একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন। ওতে মানবের লেখা দু' চারটা আঁচর রয়েছে।

"দাদাজী, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেলাম। কাল তোমরা কোথায় যাবে ঠিক করেছ? যদি দরকার মনে কর, খবর পাঠাতে দ্বিধা কর না। ফোন নম্বরটা রেখে গেলাম। তোমাদের কোন কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করব।"

কুয়াশায় আচ্ছাদিত প্রভাতে আর একটি নূতন দিবসের সূচনায় জেগে উঠল কাঠমাণ্ডুবাসীরা।

হিল ভ্যু হোটেলের অধিবাসীদের মাঝেও প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। ভাল করে আলো ফুটে ওঠার আগেই ছাব্বিশ নম্বর কামরার গোফুদা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি স্থরু করে দিয়েছেন।

"সব ঝুটমুট্, সব কুছ বেকার। এ্যাই দুবেজী, ক্যেয়া মালুম আপকা। কল্ মে পানি নেই ক্যেও?" নীচ থেকে দুবেজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "আরে সাব্ চিল্লাও মাত্, আভি মিল যায়গা পানি। পাম্প চল রহা হ্যায়।"

অমিতও, ওর ঘর থেকে হেঁকে উঠল—এ্যাই সন্তন, জলদী লে আও চা।

নিমেষের মধ্যেই নলের মুখ দিয়ে হুড়হুড় করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সন্তনও প্রত্যেক কামরায় চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে গেল।

রুমা চুপিচুপি এসে ষ্টোভটা জ্বেলে, দুটো ডিমও সেদ্ধ করে দিল। দুবেজীর হোটেলে সব নিরামিষের ব্যবস্থা, তাই এ গোপনতার আশ্রয় নিতে হল। খোসাগুলো ছাড়িয়ে একটা কাগজের ঠোঙায় রেখে দিলাম। পথের কোন ডাষ্টবিনে ফেলে দেব।

অসীমা ভোরে ভোরেই পরিক্রমার তালিকা তৈরী করে ফেলেছে। আজকের তালিকায় শুধু পশুপতিনাথ আর গুহ্যেশ্বরী মন্দির।

বিজয়া দশমীর দিন—তাই গাড়ী পাওয়া দুষ্কর। তবুও ডবল ভাড়ায়, অমিত দুটো জীপের বন্দোবস্ত করেছে। মানবকে ফোন করব,

তাও হল না। হোটেলটার পাশের বাড়ীতেই ফোন। ও বাড়ীর বাসিন্দারা তখনও ওঠেনি। ফিরে এলাম।

কৃষ্ণ বাহাদুরও নেই। মানবকেও পাওয়া গেল না। মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। মন্দির দর্শনে যাবে সব, তাই শুচিস্নাত হয়ে বসল, প্রাতঃরাশের টেবিলে। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে জীপে চাপলাম।

॥ ৬ ॥

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ।
পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু॥

পৃথিবী সর্ব্বভূতের মধু, সবর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। মধুময় এ ভুবন। ব্রহ্মেরই সৃষ্ট এই অখিল চরাচর। ব্রহ্মেরই স্বরূপ এই জগৎ পারাবার। মনোময়, মনোরম, প্রাণস্পন্দন এই ধরিত্রীর শিরায় শিরায়। রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে—বিচিত্র প্রাণসম্ভারে উদ্বেল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের পথ অনুসরণ করে চলেছে জীপ।

স্বতঃই মনে পড়ে সেই পুরাণের কথা। শিবহীন যজ্ঞ করলেন দক্ষ। বিনা আমন্ত্রণেই সতী এলেন পিত্রালয়ে। পতি নিন্দায় করলেন দেহত্যাগ। বার্ত্তা চলে গেল কৈলাসে। বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলেন শঙ্কর। পত্নী বিহনে ব্যথাকাতর, উদভ্রান্ত, মেতে উঠলেন ধ্বংসলীলায়। সুরু করলেন তাণ্ডব, লণ্ডভণ্ড হ'ল দক্ষালয়, পণ্ড হল যজ্ঞ। বিয়োগ ব্যথায়, শঙ্কর ভুলে গেলেন তাঁর কর্ত্তব্য। ভার্য্যা বিহনে উন্মাদপ্রায়, ঘুরে চললেন পথে পথে। মহাকালের বিলাপে চঞ্চল হয়ে উঠল ত্রিভূবন। ত্রাস শঙ্কিত হল দেবলোক।

বিষ্ণু তাই চক্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করলেন সতী দেহ। খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিটকে পড়ল একান্নটি বিভিন্ন স্থানে। প্রতিষ্ঠিত হল দেবীপীঠ। দেবীর গুহ্য অঙ্গ পড়েছিল কাঠমাণ্ডুর এই স্থানে। দেবী এখানে পূজিতা হন গুহ্যেশ্বরী আখ্যায়।

অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য, একাত্ম—শাশ্বত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন সতী আর শঙ্কর। ভৈরবীর পাশে রয়েছেন, ভৈরব পশুপতিনাথ। শক্তির সঙ্গে শিব, ভৈরবীর সঙ্গে ভৈরব—দেখা যায় সব পীঠস্থানেই। এমনি কামাখ্যায়ও ভৈরবীর পাশে রয়েছেন ভৈরব—ব্রহ্মপুত্র বক্ষে উমানন্দ পাহাড়ে।

রম্য উপবনে ঘেরা, কাঠমাণ্ডু সহরের এই উপকণ্ঠ—মৃগস্থলী নামে পরিচিত। সার্থক বলতে হয়, এ নাম। মানুষের কল-কোলাহলে উপবনের শান্তি বিঘ্নিত না হলে, বন বিটপী আর লতাগুল্মের ছায়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়, ঋতুরঙ্গে লীলাচঞ্চল মৃগসারি। মহাকবি কালিদাসের কথায় বলা যায়—

"শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়তঃ কৃষ্ণসারঃ"
অথবা
"প্রিয়ারে তার কৃষ্ণসার, পরশে শৃঙ্গে বারংবার।
পরশ আবেশে হরষ আকুল, ঢুলু ঢুলু আঁখি যুগল তার॥"

এই রম্য উপবনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে পুণ্য সলিলা বাগমতী, শিব-শর্ব্বাণীর প্রশস্তি গেয়ে। এক তীরে রয়েছেন পশুপতিনাথ, অন্য তীরে শঙ্করতোষিণী, দেবী গুহ্যেশ্বরী। ছোট টিলার ওপর, নির্জ্জন শান্ত পরিবেশে এই মন্দির অঙ্গন। আপাদশীর্ষ সোনা আর রূপার পাতে মোড়া। দু'চারটা সিঁড়ি ভেঙ্গেই মন্দিরের তোরণ। অপূর্ব্ব

এর শিল্পচাতুরী। জিজ্ঞাসায় উৎসুক দুটি নয়ন মেলে, দাঁড়িয়ে আছে তোরণ স্তম্ভ।

হ্যাঁ জিজ্ঞাসা—"কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ?
কে তুমি, কি তোমার উদ্দেশ্য। করে চল অন্বেষণ।

"আত্মানং বিদ্ধি।"

ক্ষুধার্ত্ত আত্মার সংশয়! চাই মীমাংসা। চাই নিবৃত্তি, রহস্য পিপাসার।

মন্দির তোরণের নয়নদ্বয়ে ঔৎসুক্য, ঔৎসুক্য যাত্রীদের চোখে, ঔৎসুক্য পারিপার্শ্বিকে। উৎসুক-তন্ময়তায় মগ্ন সবাই।

দু'চার ধাপ পার হবার পরেই মন্দির অঙ্গণ। পূজারী পুরোহিত মাতৃবন্দনায় মগ্ন। শাস্ত্রীয় শ্লোকগাথার নাদ ও ধ্বনিতে সৃষ্টি করেছে উচ্চস্তর।

সম্মোহিতের মত সঙ্গীরা প্রদক্ষিণ করে চলেছে মন্দির। নেপালের অনেক গৃহস্থ বধূরাও এসেছে, হাতে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে। ওরাও মন্দির পরিক্রমায় রত।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে দেবী পীঠ। সামান্য নীচে নেমে যেতে হয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে। ত্রিকোণ আকারে সামান্য উচু বেদী। ছোট একটি ছিদ্র পথ দিয়ে অনবরত জল বুদ্বুদ ভেসে উঠছে।

পশুপতিনাথ যাবার নামটি করছেনা কেউ। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সব, স্বচ্ছন্দ অলস ভঙ্গিতে। সবার অলক্ষ্যে, নীরু মন্দিরের উল্টো দিকটায় চলে গেছে। ও পথে কেউ যায় না। ওকে অনুসরণ করে ওর পেছনটায় এসে দাঁড়ালাম। নির্জ্জন গাছের ছায়ায় বসে রয়েছে নীরু। সূক্ষ্ম অস্ফুট গুঞ্জন কানের পর্দ্দাকে মধুর ভাবে স্পর্শ করছে—

"আমারে ভেঙ্গে করহে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লও হে গড়ি!"

ওর পাশে বসলাম। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই—আমার উপস্থিতিতেও কোন রকম বিকার দেখলাম না ওর হাবভাবে। হয়ত নীরু কিছুটা বিষন্ন, নয়ত পরিবেশের গাম্ভীর্য্যে পূজামগ্ন।

নীরুকে ডাকলাম—চল, পশুপতিনাথ যাবে না ?

উঠে দাঁড়াল নীরু। অন্যমনস্ক হয়ে এগিয়ে চলল তোরণের দিকটায়। জীপটা ওখানেই আছে।

একবার নয়, মন্দিরের আলোকচিত্র নেবার জন্য কয়েকবারই চেষ্টা করলাম। প্রতিবারই বাধা পেলাম, প্রতিহারীর কাছ থেকে।

বাধা পেয়ে, জেদটা আরও জোর হয়ে চাপল। সবার অলক্ষ্যে টিপে দিলাম ক্যামেরাটা। ধীরে সুস্থে পার হয়ে এলাম মন্দির দ্বার। সঙ্গীরা সব জীপে বসে আছে। আমি উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই পশুপতিনাথের রাস্তা ধরে ছুটে চলল জীপ।

গুহ্যেশ্বরী থেকে পশুপতিনাথ সামান্যই পথ। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই জীপ এসে গেল মন্দির দ্বারে। মন্দিরে ঢুকবার মুখেই নানারকমের আপত্তি আর বাধা নিষেধ এসে ঘিরে ধরল। জুতো খোল, ক্যামেরা রাখ। চামরার তৈরী কোন জিনিষ নিয়েই ঢুকতে পারবেনা মন্দিরে।

এক পাহাড়ী কিশোর এসে সম্মুখে দাঁড়াল। "বাবু মন্দিরকো ফটো লেগে ?" আমার চেয়ে ওরই বেশী আগ্রহ দেখছি।

'উত্তর করলাম—ফটো ত নেব কিন্তু বাধা নিষেধের যে কড়াকড়ি তাতে ভয় হচ্ছে, ফটো নিলে ঘাড়টা ভেঙ্গে দেবে না ত ?

ছেলেটি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—কুছ ডর নেহি। চলিয়ে হামারা সাথ। বহুৎ আচ্ছাতর জায়গামে, লে যায়েগা আপ্‌কো! বহুৎ খুবসুরৎ ফটো নিকালে গা। কিছুক্ষণ থেমে বলল—হুঁ। তব হামারা বকসিস্ মিলেগা ত ?

জরুর ! বলে মাথাটা হেলিয়ে সম্মতি জানালাম। এত আগ্রহ তবে বকসিসেরই জন্য ? ওর পিছু পিছু চললাম। বাগমতীর সেতু পার হয়ে একটা ছোট টিলার ওপরে এলাম। সমস্ত মন্দিরটাই চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে ভিউ ফাইণ্ডারে। ভাল করে দেখে শুনে সন্দেহের কোন অবকাশ না রেখে ফস করে টিপে দিলাম ক্যামেরাটা। বড় আনন্দ হচ্ছে ! নিষিদ্ধ যা কিছু, হয়ত তাই উপভোগে সবচেয়ে বেশী আনন্দ, নয়ত এই ছবি তুলে এত আনন্দ হচ্ছে কেন ?

টিলাটার চারদিকেই ছোট ছোট ঝোপঝাড়। জীর্ণ, ভাঙ্গা, অনেক ছোট ছোট মন্দির। একটু দূরে বাগমতীর তীরে শ্মশান ভূমি। দাউ দাউ করে একটা চিতা জ্বলছে।

খেয়াল করিনি, হঠাৎ হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ ভেসে এল কানে। কিছুটা দূরে একটা ঝাক্ড়া গাছের নীচে, এক জটাজুটধারী তপস্বী বসে আছেন। সামনেটায় একটা ধূনী জ্বলছে। পাশেই চিম্টাটা পড়ে আছে। ইসারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাঙ্গালী হ্যায় ?

মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত করে সম্মতি জানালাম।

সাধুকা লিয়ে চড়াও না কুছ্, যোভি তুম্হারা মৰ্জ্জি।

সাধু দেখছি পয়সার কাঙ্গাল। অগত্যা সামান্য কিছু, ধূনীটার পাশে রেখে দিলাম।

সন্ন্যাসী প্রহৃষ্ট চিত্তে এবার উপদেশ বর্ষন সুরু করলেন। সবই মহামায়ার খেলা, সবই মিথ্যা। শুধু এই মহাশ্মশানই সত্য। সাধু সজ্জনকে দান কর, সেইটুকুই তোমার পুণ্য। আর এই পুণ্যটুকুই থাকবে, যাবে তোমার সঙ্গে, পরজন্মের পাথেয় হয়ে।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। সাধুবাবার অনুমতি নিয়ে উঠলাম। যে পথ ধরে এসেছিলাম সে পথে আর নয়। শিগ্গীর শিগ্গীর চলে যাব বলে নদীর বুকে হেঁটেই পার হলাম। বাগমতীর ধারা

এখানে শীর্ণ। স্রোত নিস্তেজ, জল কোথাও হাঁটু পর্য্যন্ত, কোথাও বা তার চেয়েও কম। পার হয়ে এলাম বিনা আয়াসে।

মন্দির দ্বারে বন্দুক কাঁধে এক সিপাই পাহারা দিচ্ছিল। ভীষণ কঠিন ওদের ব্যবহার। পান থেকে চুনটি খসবার উপায় নেই। কোন রকম ম্লেচ্ছাচার ওরা বরদাস্ত করবে না। ইসারায় জানিয়ে দিল, ক্যামেরা, জুতো ওসব খুলে রাখ। বোঝাগুলোকে রেখে দিলাম এক দোকানীর জিম্মায়। ঢুকে পড়লাম মন্দির প্রাঙ্গণে।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ এই পশুপতিনাথ। এখানকার পাণ্ডারা অত্যন্ত গোঁড়া। যাত্রীদের বিগ্রহ স্পর্শ করবার অধিকার নেই। ফুল, জল, বেলপাতা দিয়ে নিজের ইচ্ছামত তাই কেউ পূজা দিতে পারে না।

চারদিক ঘিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে সঙ্গীরা এসে বসেছে বারান্দার ওপর। সারি বেঁধে ব্রাহ্মণেরা মণ্ডপের অলিন্দে বসে ললিতকণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছে শিব স্তোত্র আর চণ্ডী।

গর্ভগৃহের অন্তর্ভাগে মধুর ছন্দে উচ্চারিত বেদমন্ত্র, প্রাচীর গাত্রে প্রতিহত হয়ে সান্দ্র গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলছে। মাঝে মাঝেই মন্দিরের বহিরঙ্গন থেকে ভেসে আসছে হর হর ব্যোম ব্যোম্ নাদ। চুয়া-চন্দন কুম্‌কুম আর ধূপের সুরভিতে আমোদিত হয়ে আছে মন্দির চত্বর। স্তিমিত ধারাযন্ত্রের গতিতে লিঙ্গের উপর অবিরাম ঝড়ে পড়েছে জলধারা।

পূজার ডালি সাজিয়ে সতী পুরোহিতের হাতে তুলে দিল।

সঙ্গীরা দেওয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। অমিত আর শুচি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, মন্দিরের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছে। ওরা সবাই একমত যে মন্দিরের বেদীটি হাজার

বছরের ও বেশী পুরানো ; কিন্তু এর বহিঃঅঙ্গ আর অন্তঃঅঙ্গ দুইই অনেক পরবর্ত্তী কালের।

অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে নেপালে এসেছিলেন। এই পশুপতিনাথ লিঙ্গ ওরই প্রতিষ্ঠিত।

শিব হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ নিরাকার। ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভূতই বিশ্বশক্তির মূলাধার। পঞ্চাননের এক একটি আনন এরই প্রতীক। প্রত্যেকটি আনন এক একটি শক্তির বিকাশ।

আকৃতি দিয়ে লিঙ্গের পরিচয় অবশ্য কোথাও দেখা যায় না। একমাত্র পশুপতিনাথই এর ব্যতিক্রম। অতি পুরানো হলেও জরাজীর্ণ নয়—মন্দিরের ওপর নেপালাধীশের যথেষ্ট নজর আছে। এর গঠন শৈলী, পুরাতন বৌদ্ধযুগীয় প্যাগোডার মত। নেপালের শিল্প চাতুরীর এক অভিনব নিদর্শন ধরে রেখেছে এ মন্দির।

নেপালের মন্দিরগুলোকে, সাধারণতঃ দুটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। স্তূপ আর চৈত্যাকারে আছে বোধনাথ আর স্বয়ম্ভূনাথ। এরা অতি পুরাতন। এক একটার বয়স দু'হাজার বছরের কম নয়।

মধ্যযুগীয় সমস্ত মন্দিরশীর্ষ আর প্রাসাদ, সবই প্যাগোডার আকারে গঠিত। নেপালের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ধারা—শিল্পশৈলীর এক অপূর্ব্ব বিস্ময়। যুগ যুগ ধরে এরা নেপাল সংস্কৃতির ছাপ ধারণ করে রেখেছে, তবে পাটানের কৃষ্ণমন্দির আর মহাবোধ, স্বতন্ত্রতার দাবী করে। এ দুটি মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ধারায় গঠিত। মন্দিরের বহিরঙ্গে উৎকীর্ণ কারুকাজ, বিশেষতঃ হিন্দু দেব দেবীদের মূর্ত্তি, শিল্প সৃষ্টির পরম পরাকাষ্ঠা, শিল্প জগতের অতুল বৈভব। অনবদ্য এর গঠন সৌষ্ঠব।

মনের সমস্ত মাধুরী ঢেলে শিল্পী সৃষ্টি করেছে, এই সূক্ষ্ম পেলব অর্ঘ্য।

দেবতার কাছে নিবেদন করে, পূজারী ভোগের থালা সতীর হাতে ফিরিয়ে দিল। সবার ললাটে চন্দন কুম্‌কুমে বিজয় টীকাও এঁকে দিল।

ফিরে যাবার পথে মণ্ডপ থেকে নীচে নেমে এলাম। মাধবীর হাতে ছোট একগাছা বেত। একটু কৌতুকের ইচ্ছা সামলাতে পারলাম না।

আরে ওকি! ওটা হাতে নিয়ে ঘুরছ কেন? গুরুমশায়ের মত লাগছে যে। না বাপু, কাছে যেতে সাহস হচ্ছেনা, ভয় হচ্ছে, যদি বসিয়ে দাও দু'চার ঘা!

বিব্রত ভাবে আপত্তি করে উঠল মাধবী। পাল্টা পরিহাস করল—আপনি থাকতে এ গুরুদায়িত্ব নি কেমন করে?

কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল, বানরের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মাধবী এই বেতগাছটা শান্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। "যাকগে—ওটার ত এখন আর দরকার নেই, ফিরিয়ে দিচ্ছি ওর মালিকের হাতে"—মাধবী শান্ত্রীর হাতে লাঠিটা ফিরিয়ে দিল।

ডাইসে পিটিয়ে তোলা তামার পাতে পশুপতিনাথের প্রতিকৃতি নিয়ে একটা ছোট মেয়ে ঘুরঘুর করছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে বিরক্ত করছিল "কুছ ল্যাও বাবু, কুছ ল্যাও।" মেয়েটা অমিতের পেছনে নাছোড়বান্দার মত লেগে রইল।

"ক্যেয়া দিগদারী লাগায়া, ছ্যড়তা ক্যেও পিছু পিছু, ভাগো, ভাগো" বলে অমিত জোড়ে ধমক লাগালো। দমবার পাত্রী নয় মেয়েটা। হাল ছাড়ছেনা কিছুতেই, চলেছে পিছু পিছু।

এক শ্বেতাঙ্গিণী তরুণী ওর সঙ্গীকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তোরণে শান্ত্রী সঙ্গীন উচিয়ে বাধা দিল। পাশ কাটিয়ে যাবার উপক্রম করতেই পথরোধ করে শান্ত্রীটা বলল—"বিধর্ম্মীদের কাছে মন্দির উন্মুক্ত নয়, ফিরে যাও।"
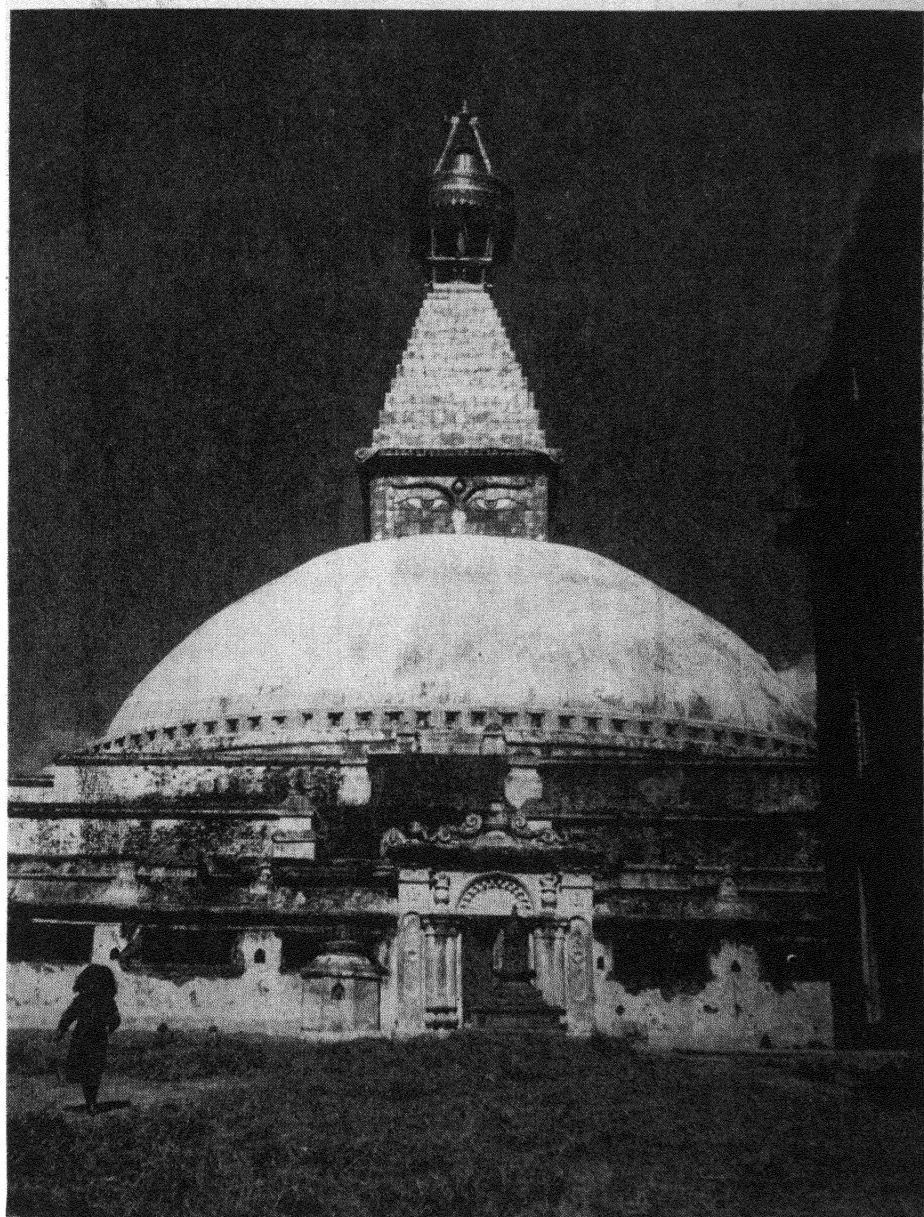
বোধনাথ স্তূপ

অতন্দ্র ওই নেত্র দুটি—সতত সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে ফিরছে কোথা আলো!

কীর্ত্তিপুরের জনপদ
স্তূপীকৃত মেঘজালে আবৃত তুষারশীর্ষ
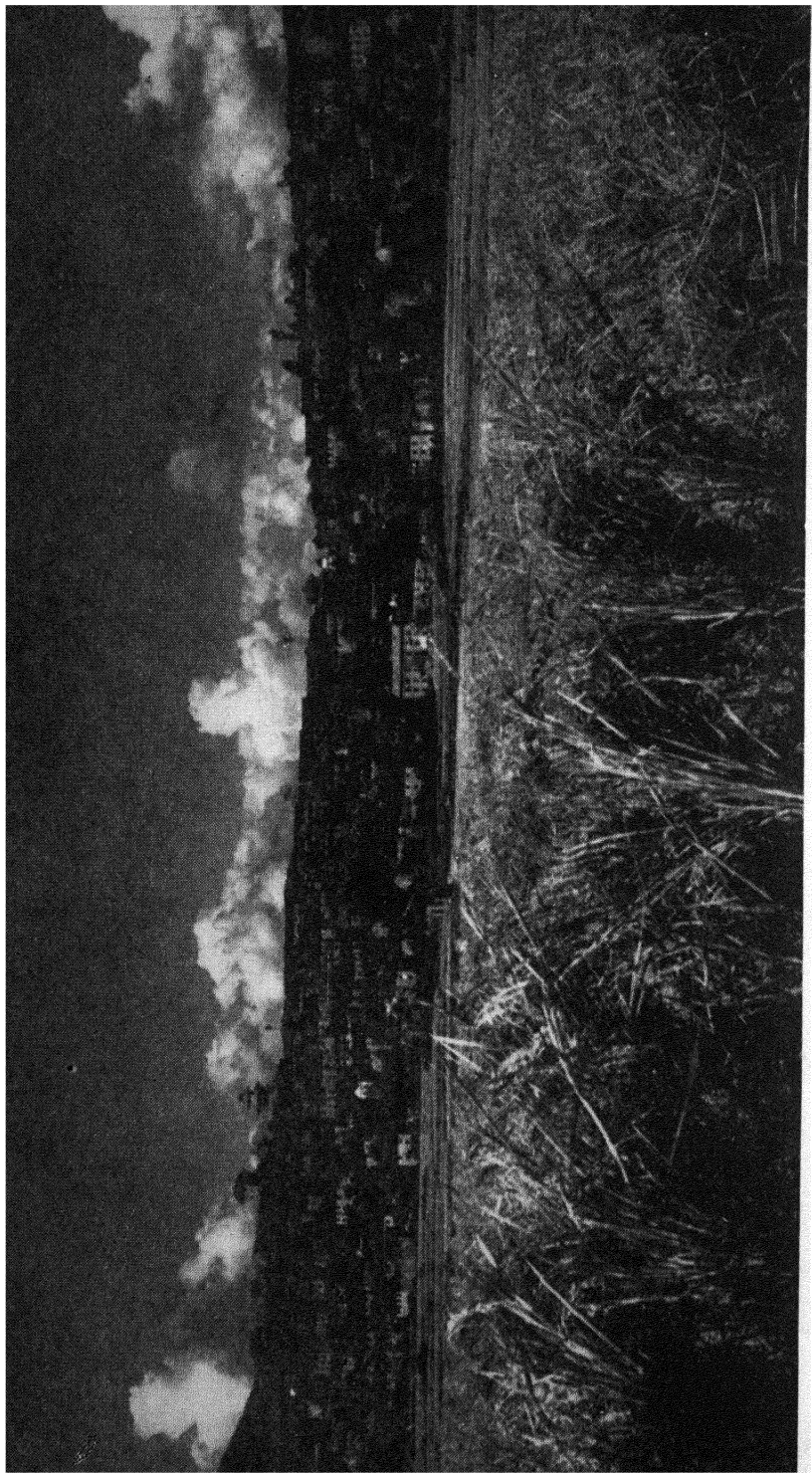
স্থাণুর মত নিশ্চল, স্তম্ভিত—ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল ওরা।

স্তম্ভিত হৃতবাক্ সব। তোলপাড় হচ্ছে বিক্ষুব্ধ চিত্ত।

আক্ষেপ করে উঠল নীরু—এ কি রীতি, কি এ ব্যবহার!

মানুষের অধিকার হতে কেন বঞ্চিত হবে ওরা! এই ব্যবহারে, কি ধারণা নিয়ে ফিরে যাবে ওরা দেশে। এই কি বুদ্ধ শঙ্করের দেশ! কত কুসংস্কার! কত সঙ্কীর্ণতা! মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে বিদেশীর চরণ পাতে!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নীরু।

নীরু বিলাপে অধীর হয়ে উঠল—মানবাত্মা যেখানে অবহেলিত, ভগবান থাকবেন কেন সেখানে! কেমন সে দেশ, মানুষ যেখানে স্বীকৃত নয়! স্বীকৃত শুধু অন্ধ আচার আর অনুষ্ঠান। বেদনামথিত বিলাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে নীরু।

নরনারায়ণ যেখানে অনাদৃত, অস্বীকার কর সেখানকার ধর্ম্মকে, অস্বীকার কর সেখানকার মানুষকে। অস্থির উত্তেজনায় নীরু হাঁপাতে লাগল।

না! এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়, চল ফিরে। বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করল নীরু।

বেপথুমতী! অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে নীরু। মন চলে গেল দূর অতীতে।

"চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈশ্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি।"

সারা ভারতবর্ষ তখন ছেয়ে গেছে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মে। অনাচারে ছেয়ে গেছে দেশ। লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম। যুগ সন্ধিক্ষণে ত্রান-কর্ত্তা হয়ে এলেন শঙ্কর। ম্লেচ্ছাচার থেকে মুক্ত হ'ল দেশ। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করলেন ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম, বাঁচালেন মজ্জমান হিন্দু ধর্ম্মকে। নেপালে এসে প্রতিষ্ঠিত করলেন পশুপতিনাথকে।

এস শঙ্কর—এস আবার। বাঁচাও ভ্রষ্ট এই মনুষ্য সমাজকে। উদ্ধার কর অজ্ঞতার তিমির অন্ধকার থেকে।

কিছুতেই বশ মানছেনা মন, থেকে থেকেই বেদনা-পীড়িত করে তুলছে পশুপতিনাথের ঘটনাটা। জীপে বসেও সহজ হতে পারছেনা কেউ।

ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জীপ চলেছে বোধনাথ চৈত্যের পথে। উচু নীচু, অমসৃণ রাস্তা, তাই জীপের গতিবেগ অতি মন্থর। সামান্য এই পথটুকু, তবুও দশ মিনিটের মত সময় লেগে গেল। বোধনাথ চৈত্যের বেদীমূলে এসে দাঁড়াল জীপ।

শ্বেতা জোর করে চেপে ধরেছে নীরুকে। নীরু নাকি নেপালে আসবার আগে এই সব পুরাতত্ত্বের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। ওর সঞ্চিত থলেতে কি রত্ন রয়েছে তা ওরা দেখতে চায়।

নীরুর কাছ থেকে আজ আর কোন কিছু শুনবার আশা করা দুরাশা বলেই মনে হচ্ছে। তথ্যটা পরিবেশন করবার জন্য নীরু বারবার আমাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে।

পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে সৌন্দর্য্য আর রসবোধের অংশটুকু ছেড়ে দিলে, বাকী যেটুকু থাকে; সেটা বিদগ্ধ.যারা, তাদেরই এলাকাভুক্ত, তাই এ দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করার অর্থ হচ্ছে নিতান্ত এক অযোগ্য লোকের উপর ভার দেওয়া। বানরের গলায় মুক্তোর মালার মত।

পাথরের ভাষা আমার কাছে হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য, আর তা ছাড়া আমি বোধনাথের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আজ এখানে আমি পুরোপুরি শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে থাকব। শুনব। যে কেউ কিছু বলুক আমি শুধুই শুনব।

দৃঢ়ভাবে আমার আপত্তিটুকু জানালাম।

নীরু অতি বিমর্ষ ভাবে বলল—আজ আর কিছুতেই মন নেই। আমার ভেতরের মানুষটিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। রেহাই দাও।

অসীমা রূঢ় ভাবে টিপ্পনী কাটল—সময়েরটা সময়েই ভাল। বসে আছি বোধনাথের বেদীমূলে, বোধনাথের কথা শুনবার, এই ত উপযুক্ত স্থান।

নীরুর এই বিপর্য্যস্ত অবস্থায় কেন যে আজ ওরা এত কঠিন হয়ে উঠল বুঝতে পারছি না।

রাজী হওয়া ছাড়া নীরুর আর কোন উপায় রইল না। বিক্ষিপ্ত মন নিয়েই বলতে লাগল—এই বোধনাথ স্তূপের বয়স কমসে কম দু'হাজার বছর। কম ত নয়ই, বেশীও হতে পারে।

মহাকালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও নির্ব্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছ, ওর অঙ্গের কোন হানি হয়নি। কি নেপালী, কি তিব্বতী, কি ভিন্ন দেশীয়—বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সকলের কাছেই, বোধনাথ সমধিক শ্রদ্ধার বস্তু। অপরদিক থেকে পুরাকালের নেপাল স্থাপত্যের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

গৌতম বুদ্ধ মহানির্ব্বান কালে ওর অনুবর্ত্তী ভিক্ষুদের কাছে অনেক অনুশাসন দিয়ে যান। শুধু নির্ব্বান লাভ করেছেন যাঁরা তাঁদেরই স্মরণে স্তূপ নির্ম্মাণ বিধিসম্মত হল। আকৃতি ও নির্দ্দেশিত হল। স্তূপের গঠনভঙ্গী হবে তণ্ডুল স্তূপের মতন। যোনি আশ্রয়ী বুদ্ধের প্রতিভাস হবে পদ্ম কোরক। এই হচ্ছে স্তূপ পরিকল্পনার মূল বিষয়। প্রায় প্রত্যেক স্তূপের শীর্ষে দেখা যায় মুকুট আর ঐ মুকুটেই স্থান পায় পদ্ম কোরক।

নীরু কিছুক্ষণ থেমে, আবার বলল—তোমাদের হাতে ত দূরবীন রয়েছে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা, একবার পখর করে দেখ।

শোনা মাত্র মাধবী দূরবীনটা তুলে ধরল চোখের সামনে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখতে লাগল। হাত ফেরতা হয়ে দূরবীনটা ঘুরতে লাগল সবারই চোখে চোখে।

তোমাদের হযেছে ত ?

নীরু ওর অসংযত ভাবটা যেন একটু কাটিয়ে উঠেছে। মন ওর ডুবে গেছে কাহিনী বর্ণনায়।

"এবার এস, চল আমার সঙ্গে আর একটু কিছু দেখবে।"

স্তূপ পরিক্রমায় চলেছে নীরু। স্তূপের দেয়ালে, খোপে খোপে সাজান ছোট ছোট মণিচক্র। দেখতে কতকটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। বৈষ্ণবরা যেমন মালা জপে, ঠিক তেমনি, তিব্বতী লামারাও এই মণিচক্র নিয়ে জপ-তপ করে। ওদের হাতে ঘুরে চলে মণিচক্র অবিরত। সারাক্ষণ চলে মন্ত্রপাঠ। "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ"।

আরও দেখ স্তূপ মুকুটের নীচে অতি আশ্চর্য্য দু'টি চোখ। অতন্দ্র ঐ নেত্র দু'টি। ঘুম নেই, ও দুটি চোখে। সতত সন্ধানী দৃষ্টিতে, অহোরহ খুঁজে ফিরছে কোথা আলো!

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

শীতে তুষারপাতে, হিমালয়ের অন্তর্ভাগ যখন বসবাসের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন সিকিম, ভূটান, তিব্বত, চারদিক থেকে আসে তীর্থকামীরা—দূর নিকটের বৌদ্ধ ভিক্ষু আর শ্রমণেরা।

এ চৈত্যের সঙ্ঘনায়ক হচ্ছেন চিনাই লামা। ইনি তিব্বতের দলাই লামারই প্রতিনিধি।

পৌষ আর মাঘ, এই দু'মাস ধরে চৈত্যের চারদিক ঘিরে বসে বিরাট মেলা, চলে উৎসব। জ্বলে সহস্র প্রদীপের শিখা। দিন-রাত্রি উচ্চারিত হয় মন্ত্র-গীতি। উদার উদাত্ত স্বর ছড়িয়ে পড়ে গুরুগম্ভীর নাদে বাগমতী উপত্যকার প্রান্ত থেকে প্রত্যন্ত লোকে।

দূরবীন ঘুরে চলেছে হাতে হাতে। সকলেরই কৌতূহল—নিবৃত্ত হতে কেটে গেল অনেকটা সময়। এই ফাঁকে যূথভ্রষ্ট হয়ে চলে গেলাম অন্যদিকে। জায়গা বেছে, তুলে নিলাম আলোক চিত্র।

ছেঁড়া জামা গায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপন মনে খেলা করছিল। আমার কাঁধে ক্যামেরা দেখে ওদের খেলা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল কিছুটা পথ। উৎসুক চাহনিতে দেখতে লাগল বিদেশী পর্য্যটককে। ঝাঁ করে দৌড়ে চলে গেল আবার চোখের আড়ালে। হয়ত ওদের খেলার কথাই মনে পড়ে গেল।

জীপ ড্রাইভার এসে সম্মুখে দাঁড়াল। বলল—চলুন, আপনার অপেক্ষায় সবাই গাড়ীতে বসে রয়েছে।

সূর্য্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। তাপে জ্বলজ্বল করছে চারদিক। উঠে বসলাম। ছুটে চলল জীপ কাঠমাণ্ডুর দিকে। পার হয়ে গেল সঙ্ঘমিত্রা আর চারুমতী বিহার, ঢুকে পড়ল সহরের ভেতর।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে অলস জটলা। বিজয়া দশমীর প্রীতি সম্ভাষণ আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে পথচারীরা উৎফুল্ল। প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা ঝুলছে। শুভানুধ্যায়ীরা ললাটদেশে পরিয়ে দিয়েছে দধি, চন্দন, মাটি আর ধানেব শীষে তৈরী সুরভিত বিজয় টীকা।

শুনেছিলাম দশেরায় বিরাট উৎসব হয় রাজবাড়ীতে।

রাজা মহেন্দ্র এবার পিকিংয়ে গেছেন। এখনও ফিরে আসেন নি, তাই দরবারের উৎসব নিষ্প্রভ।

নেপাল কংগ্রেসের প্রধান মন্ত্রী, বীরেশ্বর প্রসাদ আর ঐ দলভুক্ত আরও কয়েকজন মন্ত্রী এখন নজরবন্দী। রাজা মহেন্দ্র রাজ্যভার তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। রাজনীতির চাপে জনসাধারণের উৎসব ও তাই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে।

বেলা তখন ভরা দুপুর। জীপ এসে দাঁড়াল হোটেলের দরজায়।

আমাদের অপেক্ষায় কৃষ্ণ বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে।

"কি খবর কৃষ্ণ বাহাদুর! হঠাৎ তুমি যে এখানে! ব্যাপার কি?"

"হুজুর! একটা আরজি আছে।" কৃষ্ণ বাহাদুরের স্বরে কুণ্ঠা, অঞ্জলিবদ্ধ ওর করদ্বয়।

"বলেই ফেল কি তোমার আরজি।"

বিনয়ের সঙ্গে কৃষ্ণ বাহাদুর জানাল—বিজয়া দশমীর উৎসব উপলক্ষে আমাদের সবাইকে যেতে হবে, ওর বাড়ীতে।

হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

"আমার একার মতে ত কিছু হবার যো নেই, আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে দেখছি সবাইকে।"

বিকালের দিকে কোন প্রোগ্রাম ছিল না। প্রস্তাবটা পেশ করা মাত্রই একবাক্যে সকলে রাজী হয়ে গেল।

কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে যেতে হলে গাড়ীর দরকার। কি বোকামীই না করেছি জীপ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে! সারা কাঠমাণ্ডু আজ দশেরা উৎসবে মেতেছে। গাড়ী পাওয়া দুষ্কর, আর যদি বা পাওয়া যায়, ভাড়া দিতে হবে পুরোপুরি ডবল।

অমিত গাড়ীর খোঁজে, বের'ল। সারাটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড, বাস ষ্ট্যাণ্ড তন্ন-তন্ন করে খুঁজে নিরাশ হয়ে ফিরে এল। না, ট্যাক্সি, না জীপ— কিছুই পাওয়া গেল না।

কাঠমাণ্ডু থেকে মচ্ছিন্দ্রনাথ পুরো পাঁচ মাইল পথ। কীর্ত্তিপুর পর্য্যন্ত তিন মাইল জীপ চলে। বাকী দু মাইল রাস্তা নেই। অনন্যোপায় হয়ে চলতে হয় পায়ে হেঁটে, মাঠের আল পথে।

কীর্ত্তিপুরের রাস্তা! সে আর বলে কাজ নেই। মাঝে মাঝেই দগদগে ঘা। খানা ডোবা তৈরী হয়ে, এক অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে এই রাস্তা।

উপায়!

মানবের শরণ নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। ফোনে ডাকলাম ওকে।

মানব আশ্বাস দিয়ে, কিছুটা সময় ফোনটার কাছে বসে থাকতে বলল। গাড়ীর খবর নিয়ে এখনি জানিয়ে দেবে।

ফোনটা বেজে উঠল। গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম। ঠিক আড়াইটার সময় হোটেলে আসবে। যাওয়া আসায় নেপালী মুদ্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া। অপ্রত্যাশিত ভাবে এত অল্প ভাড়ায়, গাড়ী মিলেছে, বরাতটা ভালই বলতে হবে। মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মানবকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেই রাজী হয়ে গেল।

জীপটা ঠিক সময়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল কিন্তু আমাদের প্রস্তুত হতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।

নীরু আমাদের সঙ্গে যাবে না। পশুপতিনাথের ঘটনার পর থেকে ও যেন কেমন একটু অসাধারণ আর বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

বিদেশী পর্য্যটক এড্‌মাণ্ড, হাঙ্গেরী থেকে ভারত হয়ে নেপালে এসেছে। আমাদের হোটেলেই আছে। ভারত পরিক্রমা শেষ করে, এখন নেপালে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোক বেশ হাসি খুসি। চামরাটা সাদা হলেও উন্নাসিকতার কোন বালাই আছে বলে মনে হ'ল না।

ঋষিকেশে স্বামী শিবানন্দের আশ্রমে, এড্‌মাণ্ড কিছু কাল যোগাভ্যাসের শিক্ষা নিয়েছে। ভারতীয় যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে ওর নিষ্ঠা আছে। এখনও অভ্যাস রেখেছে। বই পুঁথিও চর্চ্চা করে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এড্‌মাণ্ড আমাদের সঙ্গে আপন হয়ে মিশে গেছে। নীরুর সঙ্গেও বেশ একটা নিকটতা সৃষ্টি হয়েছে। নীরুকে এড্‌মাণ্ডের জিম্মায় রেখে আমরা মচ্ছিনাথের উদ্দেশে চললাম।

৫।৭ মিনিট চলার পরই সহরের রাস্তা ফুরিয়ে গেল। গাড়ী সহরতলীর কাঁচা রাস্তা ধরেছে। একটু যাচ্ছে, আর ঝপ্‌ করে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে চাকাগুলো। টপ্‌ গিয়ারে অনেকক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে আবার বেরিয়ে আসছে গর্ত্ত থেকে।

এমনি করে উচু, নীচু পথে, গর্ত্ত, ডোবা পার হয়ে, অনবরত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে চলল গাড়ী। মাঝে মাঝেই অতর্কিতে ঝুপ করে বেঞ্চের উপর তুলে আছড়ে দিচ্ছে। ঝাঁকানির চোটে টাল সামলাতে পারছে না কেউই। বিষম এ খেলা। ট্রাপিজের চেয়েও ভয়াবহ।

রাজধানীর আশেপাশে, এমন জঘন্য কোন রাস্তা থাকতে পারে তা কল্পনার বাইরে। ঝাকুনিতে মন্দের ভাল হ'ল। ঐ সূত্র ধরে মানবের সঙ্গে সবাই বেশ হৃদ্যতা জমিয়ে তুলেছে।

সহরতলী ছাড়িয়ে, কাঁচা পথ ধরে, অনেক কসরৎ করে, জীপটা কীর্ত্তিপুরের বহিঃসীমায় দাঁড়াল।

এই কীর্ত্তিপুর—এককালে এই সহরই নেপাল রাজ সদাশিব দেবের রাজধানী ছিল। বহুদিনের পুরানো ঘর বাড়ী, ঘিঞ্জি, ঘিঞ্জি, বসতি। অনেকদিনের পুরানো এই সহর। অনেক যুদ্ধক্ষেত্রের লীলাভূমি, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি, বাঘ ভৈরবের মন্দির। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে রাজা সদাশিব দেব এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কীর্ত্তিপুরকে এখন আর সহর বলা যায় না। বড়জোর একটা বড় গ্রাম বলা যেতে পারে। বিজয়া দশমীর পুণ্যতিথি স্মরণে, জায়গায় জায়গায় নারী পুরুষের দল ভীড় করেছে। সবারই ললাটে বিজয়টীকা আঁকা। এখানে সেখানে, দোলায় দোল খাচ্ছে ছোট ছোট শিশু আর কিশোরেরা। পল্লীগীতির মিষ্টি স্থুর ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।

প্রধান প্রধান উৎসব উপলক্ষ করে দোল খাওয়া, নেপালীদের জাতীয় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোল খেয়ে আনন্দ উল্লাসের প্রকাশ ভঙ্গীটি এদের এক সতস্ফূর্ত্ত ব্যঞ্জনা।

কীর্ত্তিপুর সহর কাঠমাণ্ডু অপেক্ষা প্রায় পাঁচশ ফুট উচু। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু সহরকে দেখা যায় সিনেমার পর্দ্দায় প্রতিফলিত ছবির

মত। বাগমতী আর বিষ্ণুমতীর দুই জলস্রোতকে দেখা যাচ্ছে শুভ্র উপবীত রেখার মত। এঁকে, বেঁকে, সর্পিল গতিতে চলেছে জলস্রোত, জড়িয়ে রয়েছে কাঠমাণ্ডুর অঙ্গে।

জীপ থেকে নেমে, গ্রাম পেরিয়ে মাঠের আল পথে চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর, আমরা এসে গেলাম মচ্ছিনাথ গ্রামের উপান্তে।

কৃষ্ণ বাহাদুর অঙ্গুলির নির্দ্দেশে ওর বাড়ীটা দেখিয়ে দিল। উচু জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে মচ্ছিনাথ গ্রামের ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলাম। বসতি বিরল, ছোট গ্রাম। দূরে দূরে, ছাড়া ছাড়া, বাড়ীঘর। পাহাড়ের স্তরে স্তরে, উচুতে, নীচুতে ছড়ান বড় জোর ২০।২৫টি পরিবারের বসবাস।

দিনমানের অন্তিমক্ষণে, আমরা পৌঁছলাম কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীর অঙ্গনে। গ্রামের সকলে এসে জুটেছে।

ওরা ফুলে আর লতায় পাতায়, সুন্দর করে তোরণ গড়ে সাজিয়েছে, মঙ্গল ঘট ও বসিয়েছে। অতিথিদের অভিনন্দন করল, শঙ্খনাদে। কৃষ্ণ বাহাদুরের মেয়ে দ্রৌপদী, আর ওর মা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল সবাইকে।

কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল দ্রৌপদী। সহজ সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছ বাবুজী! উত্তরের আশায় দ্রৌপদী উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করছে।

হেসে আদর করে বললাম, খুব ভাল চিনতে পেরেছি। মাঁকেও পেরেছ?

ঘাড়টি হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

চারিদিক ঘিরে চলেছে বাজনা বাদ্যি। মুরজ মুরলীর মধুর ধ্বনিতে

উথলে পড়ছে প্রাণপ্রাচুর্য্য। তালে তালে, ছন্দে ছন্দে চলেছে পদক্ষেপ। লোক সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায় মাধুরীমুখর হয়ে উঠেছে আঙ্গিনাটুকু। কামোদের ললিত তানে ঝরে পড়ছে সুধা।

সুন্দর সুললিত বেদমন্ত্র উচ্চারণে, পুরোহিত অতিথিদের বরণ করলেন। ধানের শীষে আর পাতায় গড়া মালা পরিয়ে দিলেন কণ্ঠ দেশে। ললাটে এঁকে দিলেন বিজয় টীকা।

অতিথি বরণের এ এক অভিনব রীতি! এদের আন্তরিকতায় সকলেই মুগ্ধ, অভিভূত।

এদিক থেকে ওদিক, আনন্দের আবেগে চঞ্চল পদক্ষেপে দ্রৌপদী ছুটে বেড়াচ্ছে। ওকে ঘিরে রয়েছে আরও চার পাঁচটি পাহাড়ী কিশোরী।

বেশ বড়সড় হয়েছে দ্রৌপদী। রূপসী ও হয়েছে। ওর গালে আর অধরে রক্তিম আভা।

এ লালিমা নেপালী কিশোরীদের স্বাভাবিক সহজাত সম্পদ। ওরা প্রকৃতির সন্তান। জীবন ওদের গড়ে ওঠে প্রকৃতির সাহচর্য্যে। শ্যামল কোমল পরিবেশ এনে দেয় কমনীয়তা। প্রমদা ওরা—রমণীয় ওদের হাস্যলাস্য। নদী নির্ঝরের উচ্ছল উদ্দামতা থেকে পায় ক্ষিপ্রতা। চঞ্চল ওরা—কুরঙ্গীর ভঙ্গী ওদের গমন ঠমকে। হিমবাহের তীব্র কঠোর শৈত্যস্পর্শ এনে দেয় বজ্রকাঠিন্য। অনমনীয় ওরা—সহনশীল দৃঢ়তা ওদের মজ্জাগত। নিটোল ওদের স্বাস্থ্য, অটুট ওদের দেহের বাঁধন। বরণীয় ওরা—আবেগোচ্ছ্বাসময় ওদের স্বভাব। হাসলে ছড়ায় মানিক, কাঁদলে ঝরে মুক্তা। ওরা ভঙ্গীতে ঋজু, ওরা হাসিতে উচ্ছল। স্বভাবে ওরা সরল, চিত্ত ওদের কোমল। ওরা মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য।

চারদিকে হিমালয়ে ঘেরা ছোট গ্রামটি। কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীর অঙ্গন থেকেই বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত, মিশে গেছে কীর্ত্তিপুরের জনপদে।

তারপর থেকেই স্থরু হয়েছে শ্যামল পাহাড়ের তরঙ্গ, লুটিয়ে পড়েছে শ্বেতধবল, গিরিশৃঙ্গের পদতলে।

বিকালের দিকটায় স্তূপীকৃত মেঘজাল ঢেকে ফেলেছিল তুষারশীর্ষগুলোকে। ক্রমে মেঘমুক্ত হল আকাশ। অপরূপ মহিমায় জেগে উঠল তুষারের অবগুণ্ঠন।

বেলা শেষে ম্লান হয়ে পড়েছে পারিপার্শ্বিক। রক্তিম রশ্মিজালের করুণ আভা পড়েছে ধবলশীর্ষে। রচিত হচ্ছে রজতকাঞ্চন বলয়। মুহুর্মুহুঃ চলেছে রূপান্তর। অভিনব এইরূপে, আবিষ্টের মত মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে সব, বিশ্ব রচয়িতার স্থনিপুন কলাকৌশলের দিকে।

পাহাড়ে ঘেরা, পাথর দিয়ে তৈরী ঘরবাড়ী, পাহাড় গাত্রোৎসরিত নির্ঝর ধারায় সিঞ্চিত ক্ষেত খামার, শস্য শ্যামলা ধরিত্রী, চারদিকে তরুলতার পত্র মর্মর, বনলোকে স্নিগ্ধ রৌদ্রছায়ার খেলা, অলস মন্থর ছন্দের জীবন যাত্রা—মায়াময়, মনোময়, মোহময় এ পরিবেশটি। চিরকাল যদি থেকে যাই এখানে মন্দ কি!

কৃষ্ণ বাহাদুরের পরিবারের সবাই অতিথি সৎকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবার কাছে খাবারের থালা এগিয়ে দিল। টিপটের চা, ঢেলে দিল কাপে কাপে।

ওরা আমাদের দেখছে। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের আত্মীয় স্বজনরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওরা, কৃত্রিম, সভ্য জগতের অধিবাসিদের।

সহর থেকে এতটা দূরে অতিথি সৎকারের এ আয়োজন আর নানা উপকরণ, সত্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার! কেমন করে এত কাপ প্লেট জোগাড় করল কৃষ্ণ বাহাদুর!

দ্রৌপদীর মা সঙ্গিণীদের কয়েকজনকে টেনে নিয়ে গেল অন্দরে। ওর গৃহস্থালী আর ঘর সংসার দেখাচ্ছে। হঠাৎই চাপা আর্ত্তবিলাপে ভেঙ্গে পড়ল। অষ্টমীর রাতে নাকি ওর এক দু'ধেল গাইকে বাঘে মেরে ফেলেছে।

"এমনি অঘটন তো কত ঘটে। তোমার স্বামী রোজগেরে, ক্ষেত, খামার ও আছে। গেছে ত আর কি করবে! আবার হবে।" বেদনার্ত্ত কৃষ্ণ বাহাদুর ঘরণীকে সান্ত্বনা দিল সকলে মিলে।

ওদিকে ওরা থামেনি। গ্রামের ছেলেরা নেচেই চলেছে। গেয়ে চলেছে বিচিত্র ঢংয়ের পল্লীগীতি। অনেকটা সময় কেটে গেল এমনি করে।

গোধূলী লগ্নে, গৃহ-অঙ্গনে ছায়া নেমে এসেছে। চাঁদ ভেসে উঠেছে আকাশের গায়ে। রাত হয়ে গেলে অপরিচিত পথ চলা কষ্টকর হয়ে পড়বে। শুনছি বন্য হিংস্র শাপদের উৎপাত ও আছে। সঙ্গীরা সব ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল।

এক অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতি!

দ্রৌপদী সবাইকে অবাক করে দিল। অবতীর্ণ হল আসরে, অকল্পিত নাচের ভূমিকায়। অনিন্দ্য প্রাণপ্রাচুর্য্যে উচ্ছল ওর দেহ-ভঙ্গী। মদির ভ্রূবিলাসে ধরেছে মোহিনীর মূর্ত্তি। অনেকক্ষণ ধরে নাচল দ্রৌপদী।

এদের এই সরল আতিথেয়তায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রত্যুত্তরে কিছু না বললে অত্যন্ত বেমানান আর অশোভন দেখাবে।

অসীমা অনবরতই উত্যক্ত করছে। ফিস্ ফিস্ করে বলছে যা হয় একটু কিছু বলুন। অতর্কিতে ঠেলে দিল সম্মুখে।

একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। মনে মনে তাই বক্তব্যটা গোছ-গাছ করে নিলাম। সৌজন্যের খাতিরে কিছুটা বলতেই হল।

কি বলে সম্বোধন করব জানিনা। ভাই বোন বলেই ডাকলাম। বললাম—'আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে, এসেছি তোমাদের কাছে, এসেছি হিমালয়ের অপ্রতিরোধ্য টানে। ধন্য হলাম তোমাদের সাহচর্য্যে। তোমাদের সতস্ফূর্ত্ত প্রীতি আর আন্তরিকতায়, তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মন। তোমাদের এই অবদান, এই পরিবেশ, এমন সুন্দর

সন্ধ্যাটি চির জাগরূক হয়ে থাকবে মনের মণিকোঠায়। বয়ে নিয়ে যাব তোমাদের জীবন কথা, তোমাদের লোকগীতি, তোমাদের লোকনৃত্য ভারতের মাটিতে। প্রীতির রসে শিঞ্জিত হয়ে থাকবে এই স্মরণীয় দিনটি। বিদায় ভাই সব, বিদায় দাও আমাদের।

ধীরে সাবধানে, অসমতল বন্ধুর, আলপথ ধরে, ফিরে চলেছি। বন্য জন্তু জানোয়ারের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অনেকেই। আমাদের এ ভাব দেখে, গ্রামের লোকেরা আগুপাছু করে চলেছে আমাদের সঙ্গে। ওরা কীর্ত্তিপুর গ্রাম পর্য্যন্ত এল।

জীপেতে চেপে বসলাম। বিদায় নিয়ে ফিরে গেল ওরা। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে এলাম হোটেলে। আপেক্ষ রইল আজকের এই মনোরম সন্ধ্যাটির আনন্দের লেশমাত্র ভাগও নীরুকে দিতে পারলাম না।

আগামী কালের জন্য ভ্রমনসূচী তৈরী হল। কাল আমরা সুন্দরী-জল যাব। যাবার পথে মানবকে তুলে নেব।

নীরুকে বেশ প্রফুল্লই দেখছি।

ওর মনের আকাশে যে মেঘটুকু জমেছিল, এড্‌মাণ্ডের সাহচর্য্যে তা যেন স্বচ্ছ পরিস্কার হয়ে গেছে।

তবে ? ছাইপাশ চিন্তার বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছি।

জটিল গ্রন্থির পাকে আরও কঠিন হয়ে উঠছে চিন্তাগুলো।

একি ঈর্ষ্যা ? না, আর চিন্তা করব না।

বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

টুক করে একটু শব্দ হতেই উঠে বসলাম। টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল রেখে নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছিল নীরু। ওকে কাছে ডাকলাম। কে জানে, স্বরে চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল কি ! নীরু ফিরে দাঁড়াল।

নীরবে তিরস্কার করে উঠল ওর চোখ দুটো। "চুপচাপ শুয়ে পড় ত" বলেই নীরু নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চলে গেল।

॥ ৭ ॥

পরের দিন। অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখছি নীরুও দাঁড়িয়ে আছে। তখন ও কিছুটা অন্ধকার, তবুও নীরু চেয়ে আছে পূবের আকাশে।

আমাকে দেখে নীরু এগিয়ে এল।

"চলনা একটু ঘুরে আসি টুণ্ডিখেলের দিক থেকে।" অনুনয় ব্যগ্র, নীরুর কণ্ঠস্বর।

"কেন টুণ্ডিখেল কেন?"

"ফাঁকা মাঠ, ওখান থেকে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যটি নাকি অপূর্ব্ব!"

"চল আর দেরী কেন তবে।" মাফ্‌লারটা গলায় জড়িয়ে নিলাম। ত্বরিত পদে চললাম এগিয়ে। কাল রাতের আচরণটুকুর জন্য একটু সঙ্কোচ লাগছে। নীরুর কোন বৈলক্ষণ্য দেখছিনা।

অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নির্ণিমেষ চেয়ে রইলাম পূর্ব্বাশার প্রান্তে। মহাশূন্যে ব্যপ্ত হয়ে পড়েছে অরুনিমাচ্ছটা। পাহাড়ের আড়াল থেকে আবির্ভূত হল ভাস্বর অগ্নিগোলক।

"ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়।"

অস্ফুট গুঞ্জরণে নীরু বন্দনা জানাল তেজোময়কে।

ফিরে এলাম হোটেলে। অনেকেই শয্যা ছেড়ে ওঠে নি তখন।

আজ প্রস্তুত হতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। জীপটা হোটেলের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে। যখন চেপে বসলাম তখন দিনের প্রথম প্রহর অতীত হয়ে গেছে। ড্রাইভার

প্রেমভকতকে নির্দ্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, গাড়ী মানবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

জীপ এসে মানবদের দরজায় দাঁড়াল। আমাদের অপেক্ষায় মানব দাঁড়িয়েই ছিল। অভ্যর্থনা করল—"আসুন, সুস্বাগতম্।"

গাড়ী থেকে নামতে যেন সবাই নারাজ।

"একটু চা খেয়ে পরে গাড়ীতে ওঠা যাবে। সময় নষ্ট করবেন না, তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন।" আগ্রহ অধীর মানবের কণ্ঠস্বর।

আপত্তি টেঁকল না। ইচ্ছায়ই হোক, আর অনিচ্ছায়ই হোক, সবাইকে নামতে হ'ল জীপ থেকে।

সিঁড়ির কাছে কল্পনা দাঁড়িয়ে রয়েছে। "নমস্তে, নমস্তে" করতে করতে, বেচারা একদম হাঁফিয়ে উঠেছে।

ড্রইংরুমে এসে বসলাম। আগের থেকেই ওরা প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলে চায়ের কাপ আর কাজু বাদামের প্লেট এসে হাজির।

চা-পানে আর গল্প গুজবে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল, হয়ত এ সময়টুকু নষ্ট করাও ঠিক হ'ল না। শ্বেতা অস্থির, কেমন যেন করছে।

মানবের দাদা মদনবাবু, খবরের কাগজের রিপোর্টার। ভদ্রলোক এখন নেপালের উত্তর সীমান্তে মস্তাং এ রয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবার কথা।

আলমারী বোঝাই ওর এ্যালবাম, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রূপের মায়া! আন্তঃহিমালয়ের নানা অঞ্চলের, গিরি-প্রস্রবনের, অনুপম রূপ লাবণী ঘেরা, নানা ছবিতে ভরপুর ওর আলমারিটা। ওরই দু' একটা এ্যালবাম টেনে নিলাম। দেখে মোহিত হ'লাম।

সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই, খুকু আর কল্পনা বেশ ভাব জমিয়ে তুলেছে। কল্পনা, খুকুর এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। ও আমাদের সঙ্গে সুন্দরীজল যাবে।

আর দেরী কেন—তাই ত আর দেরী কেন। জীপে এসে বসল সবাই।

বোধনাথ স্তূপকে ফেলে রেখে, এগিয়ে চলল জীপ। সহরের উপকণ্ঠ থেকেই স্বুরু হল উচু-নীচু, অমস্থন পথ।

"ঝকড়-ঝক, ঝকড়-ঝক।" উত্থান পতনের শব্দ তুলে চলল জীপ। নাচতে লাগল চাকাগুলো। নাচ স্বুরু হল আমাদেরও। টাল সামলাতে না পেরে, একে অপরের গায়ে, ঢলে ঢলে পড়তে লাগল।

শ্বেতার হাবভাবে বিমুখতা আর বিরক্তি দেখা গেল। এ সব কষ্ট ও আদৌ সহ্য করতে পারেনা। একবার ফস্ করে বলেও বসল, এ কষ্ট স্বীকার না করে হোটেলে থেকে গেলেই ভাল হত।

কে যেন চাপা স্বরে বলল—সামান্য কষ্টটুকুতেই এত বিরক্তি! তবে কষ্ট করে এতদূর আসা কেন?

শ্বেতা, তিক্ত স্বরে বলে উঠল—আচ্ছা বিপদে পড়েছি বাবা! নিস্তার কি নেই?

ইতিহাসে মহম্মদ তোঘলকের খামখেয়ালীর কথা শুনেছি। আজ হেথা, কাল সেথা, চল ঘুরে ঘুরে। জায়গাটা পছন্দ হল না, অমনি ওঠ, চল, বাঁধ গাঠরী। ওজর আপত্তি করেছ কি, গর্দ্দানটা যাবে। আজ দিল্লী ভাল লাগলনা, কালই চল আগ্রাতে। স্থির হয়ে কোন জায়গাতেই রাজধানী গড়ে তুলতে পারল না। এই করেই ওর জীবনের উজ্জ্বল সময়টুকু হারিয়ে গেল। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল।

বলিহারি দেই তোমাদেরও বাবা! আজ কাঠমাণ্ডু, কাল মচ্ছিনাথ পরশু স্বুন্দরীজল, ঘুরেই চলেছ। শুধুই চরকি পাক খেয়ে ঘুরছ।

শ্বেতা হয়ত ওর কথাস্তে যে ক্রটিটুকু আছে, সেটা লক্ষ করে নি। মানব কিন্তু টিপ্পনী কাটতে ছাড়ল না।

আপনারা সবাই শুনুন—দৌলতাবাদে নয়, মহম্মদ তোঘলক তার

সুন্দরী জলপ্রপাত

ফেনিল বেণী দুলিয়ে নেমে এল সুন্দরী—থাকবেনা বন্দী হয়ে পাষাণ কারায়!

গোকর্ণ শিব

এই শিবের বরে, ভগীরথ মর্ত্যভূমে নিয়ে এলেন জাহ্নবী ধারাকে
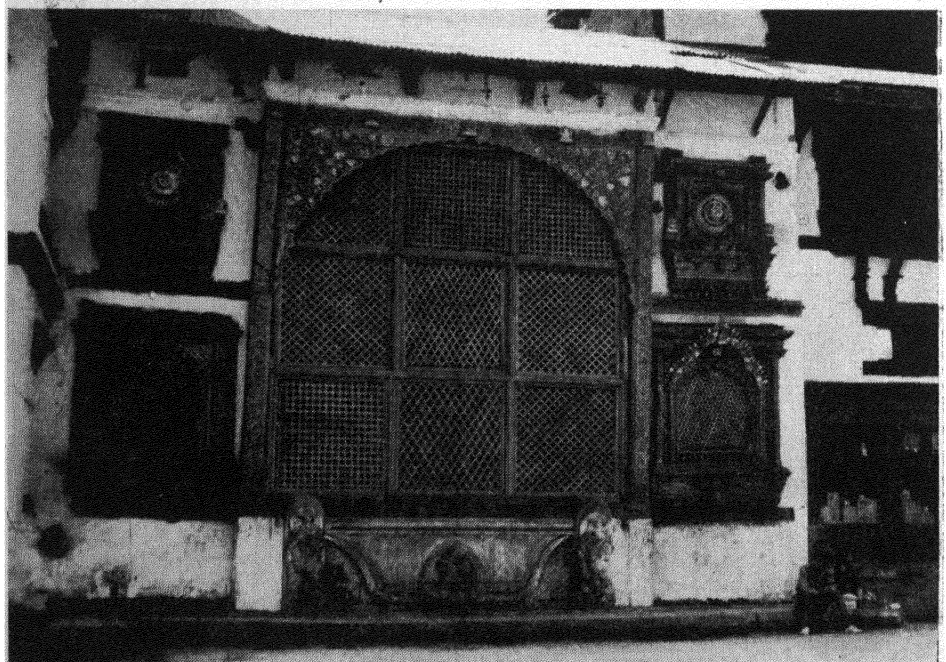
কাঠের কোঠাবাড়ী—জানালায় সূক্ষ্ম জালির কাজ

রাজধানী তুলে নিয়ে এলেন দিল্লী থেকে আগ্রাতে। ইতিহাসের শিক্ষিকার কাছ থেকে একটা নূতন জ্ঞান লাভ হল।

মনে হচ্ছে শ্বেতা ভীষণ চটে গেছে। প্রতিবাদ করে উঠল—আমি ইতিহাস পড়াই না। ইতিহাস আমার বিষয় নয়, আমি সংস্কৃত পড়াই।

মানব ছাড়বার পাত্র নয়, পরিহাস করে বলল, ঐ একই হল। ইতিহাসই হোক আর সংস্কৃতই হোক, পড়ান ত ? অর্থাৎ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করাই আপনার পেশা।

শ্বেতা সহজ হতে পারল না, বরঞ্চ আরও চটে উঠল।

"হঠাৎ মুখ দিয়ে যদি একটা কথা বেরিয়েই থাকে তবে তা নিয়ে অত হৈ চৈ করার কি আছে ?" ক্ষুব্ধভাবে গজরাতে লাগল শ্বেতা।

কথা কাটাকাটি আর রসাল পরিহাসে, সময়টুকু কেটে যাচ্ছিল, বেশ ভাল ভাবেই।

কিছুটা দূরে পাহাড়ের গায়ে, চাঙ্গুনারায়ণের বসতি, আরও দূরে পাহাড়ের উচ্চ স্তরে, শঙ্কুনারায়ণের পল্লী দেখা যাচ্ছিল।

লিচ্ছবী রাজ শাসনে এই ত্নটি বসতি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নেপালের রাজধানী ছিল। এখনও চমৎকার সব কারুকলাযুক্ত স্তম্ভ আর মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য, সেই যুগের উন্নত সংস্কৃতির ছাপ ধরে রেখেছে।

রাস্তার পাশেপাশেই চলেছে শীর্ণকায়া বাগমতী, নষ্টপ্রাণ প্রায়।

পাঁচ মাইল রাস্তা চলে, আমরা গোকর্ণ বনে এলাম। উঁচু পাথর প্রাচীরে ঘেরা নেপাল গভর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত এই গোকর্ণের বনভূমি। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় শাল, সেগুন আর ঝাউ এর সারি। ওক্, দেবদারু, ফার আর ফার্ণ, নানা জাতের মহীরুহে পরিপূর্ণ এই অরণ্যরাজি।

বন প্রাচীরের নীচেই বাগমতী। অপর পারে গোকর্ণ শিবের মন্দির। পাহাড়ের অবরোধ ভেদ করে, এখান থেকেই বাগমতী ঢুকে পড়েছে উপত্যকা ভূমিতে।

অতি প্রাচীন এই গোকর্ণ শিব। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর বংশের সন্তান, ভগীরথ জন্মালেন বিকলাঙ্গ হয়ে। মুনি অষ্টাবক্র একদিন ওদের অতিথি হলেন। বিকলাঙ্গ ভগীরথ,—আভূমি নত প্রণাম জানালেন মুনিকে।

ব্যঙ্গ না উপহাস !

ভগীরথ যে বিকলাঙ্গ, মুনি অষ্টাবক্র তা জানতেন না তাই ওর শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গিতে মুনি ক্রুদ্ধ হলেন। শাপ দিলেন ভগীরথকে, "ওরে উদ্ধত মূঢ়! বিকলাঙ্গের ভঙ্গিতে উপহাস ছলে যে বিদ্রূপ তুমি করলে, তাই সত্য হোক্। নিস্তার নেই তোমার! বিকলাঙ্গ হয়েই থাকবে সারা জীবন।"

পরক্ষণেই আবার মুনির সন্দেহ হল ভগীরথ ত তারই মত বিকলাঙ্গও হতে পারে! তাই আবার উচ্চারণ করলেন—যদি এ অপরাধে অপরাধী না হয়ে থাক, সত্যই যদি তুমি বিকলাঙ্গ, তবে আজ থেকে উত্তমাঙ্গ হও।

অষ্টাবক্রের শাপে বর হল। ভগীরথের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতনুর রূপ নিয়ে গড়ে উঠল। ভগীরথ হয়ে উঠলেন, সুন্দর সুপুরুষ। সগর বংশ উদ্ধার মানসে, এই গোকর্ণ শিবের কাছে তপস্যা করলেন, দীর্ঘকাল ধরে। এই শিবেরই বরে মর্ত্ত্যভূমে নিয়ে এলেন জাহ্নবী ধারাকে।

কোন জায়গা থেকেই মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গটুকু ক্যামেরায় ধরা পড়ছিল না। বাগমতীর সেতু পেরিয়ে, তাই চলে এলাম বন প্রাচীরের কাছে। বসে পড়লাম দেওয়ালের গায়ে। কৃষ্ণ বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অতি অনুগতের মত। অন্যান্য সঙ্গীরা মন্দিরের চত্বরে ভীড় করেছে। ছবি নেবার জন্য এমনি মেতে ছিলাম যে ক্ষণেকের জন্যও মনে হয়নি, জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। ওখান থেকে চলে আসার পর মানবের কাছে শুনেছিলাম মাঝে মাঝে হিংস্র শ্বাপদের দল প্রাচীর টপকে চলে আসে এধারে। কথাটা শুনে গা'টা শিউরে উঠল।

যাক্‌গে, আমার কাজটা ত নির্ঝঞ্ঝাটেই চুকেবুকে গেল।

সুন্দরীজল যেতে হবে। আর দেরী করা ঠিক নয়।

কেমন যেন একটা আলস্য আর অনিচ্ছা ঘিরে ধরেছে। অনেকটা রাস্তা ঘুরে যেতে হবে অথচ নদী পেরিয়ে গেলে পথটুকু সামান্যই। যেই চিন্তা, সেই কাজ। কৃষ্ণ বাহাদুরকে বললাম, দেখ ত কতটা জল ?

কৃষ্ণ বাহাদুর পেরোবার পথ বের করে ফেলল, ওর পিছু পিছু চললাম। মন্দির থেকে সঙ্গীরা হৈ হৈ করে উঠল।

তীক্ষ্ণ স্রোতের টানে বেসামাল হলে, মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। সম্মুখে পাহাড় প্রাচীর, জলস্রোত আছড়ে থেঁতলে দেবে সর্ব্বাঙ্গ। পরিণত হব একদলা মাংস পিণ্ডে।

ফেরো, ফেরো, ওপথে যেওনা! উঠে এস। ভর্ৎসনা আর উৎকণ্ঠার তীব্র অনুযোগ নিয়ে নীরু ফেরাবার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে চলে এসেছি নদীর মাঝ পথে। ফিরে যাওয়া আর চলে না। নিরাপদেই পেরিয়ে এলাম। গাড়ী এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্য ড্রাইভারকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলাম।

সঙ্গীরা সব গাড়ীতে চেপে এল। রাস্তাটা বেশ কিছুটা দূরে। সম্মুখে এসে দাঁড়াল নীরু। কোন কথা বলছে না। কেমন একটু ক্ষুণ্ন, স্তব্ধ। কৃষ্ণ বাহাদুর ততক্ষণে চলে গেছে অনেকটা পথ।

এস—হাত বাড়িয়ে নীরুকে কাছে টেনে নিলাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম আর এমন কাজ কখনও করব না। কে জানে রাখতে পারব কি না!

সঙ্গীরা সকলেই এই একগুঁয়েমীতে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে যেন। আর না ঘাঁটিয়ে তাই চুপটি হয়ে গাড়ীতে চেপে বসলাম।

লোককোলাহল মুক্ত নেপালের পল্লীর পথ। জনবিরল পথ ধরে, গাড়ী এগিয়ে চলেছে অতি সন্তর্পনে। খানা-ডোবাগুলোকে

বাঁচিয়ে, ড্রাইভার সাবধানে চলেছে। সুন্দরীজল আর মাত্র দু'মাইল পথ।

কিছুটা দূর আসবার পর, উচু প্রাচীরে ঘেরা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একটা বড় বাড়ী নজরে পড়ল। এখানে নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বীরেশ্বর কৈরালাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। দ্বারে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে।

রাজনীতির পাশার চালে হেরে গেলেন কৈরালা। মাস তিনেক আগেও তিনি ছিলেন নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারল না, নেপালের রাজনীতির আকাশে চূর্ণ হল এ্যাটম্ বোমা। রাজা স্বহস্তে তুলে নিলেন রাজ্যভার।

দু'চারটে বাগান আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে, উচু নীচু পথ ধরে, গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে গেল সুন্দরীজল পাহাড়ের পাদমূলে।

সুন্দরীজল ছোট একটা গ্রাম। মাত্র দু'চার ঘর বসতি, তাও ছাড়া ছাড়া। চারদিকে শান্ত শ্রী। ঘন সবুজে ঘেরা পাহাড়, অলস মন্থর নিরীহ দু'চারটি পরিবার। সংসার গণ্ডীকে ঘিরে লতানো ফুল আর ফলের বাগান। ওরই নীচে চাষের মাঠ, ভরে আছে সোনালী ফসলে।

"মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।"

সুন্দরীজল পাহাড়ের উপরের স্তর থেকে, ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত। এই প্রপাতের ধারাই, শৈবলিনী বাগমতীর উৎস। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, বিস্তীর্ণ জলাধারে, সুন্দরীকে আটকে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ধারা বয়ে এসেছে নীচে।

ধাপে ধাপে উঠে চলেছে সবাই ওপরের দিকে। এমনি করে দীর্ঘ পথ বেয়ে উঠতে হবে ৭৫০ ফিট, প্রায় ১০০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে।

খুকু আর কল্পনা দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। শুচিও কম যায় না। ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলল। নীরু আর এডমাণ্ড, এগিয়ে চলেছে ধীরে, গল্প বিনিময় করে। বেশ খাড়াই পথ। উঠতে সবারই কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। রুমা, মাধবী আর অসীমা কিন্তু বেশ আছে, চলেছে অত্যন্ত শ্লথ ভঙ্গিতে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে ওরা ওপরে যাবে।

নেপালে অনেক কয়টা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। ওরই একটা রয়েছে এই সুন্দরীজলে। সাবেকী পুরাণো প্রথায় তৈরী করবার একটা কাগজের কারখানাও আছে। এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে বন্দুক, রাইফেল আর গোলাগুলি তৈরীর কারখানা।

বিদেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আনার জন্য নেপালকে চিন্তা করতে হয় না। ওর প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দুক, গোলাগুলি এখানেই তৈরী হয়। বিগত মহাযুদ্ধে, এই কারখানা মিত্রশক্তিকে অনেক রাইফেল যুগিয়েছে।

গন্ধবিধুর কানন-কান্তার। পাহাড়ের গায়ে ঝাউ আর পাইনের বন। অনেকটা নীচুতে, খাদ ধরে বয়ে চলেছে বাগমতী। শোনা যাচ্ছে, শুধু মৃদু ঝঙ্কার। যতই ওপরে উঠছি বাগমতীও ততই উঠছে, আর ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, প্রপাতের মন্দ্র ধ্বনি।

উঠে এসেছি সর্বোচ্চ স্তরে। পাহাড় প্রাচীরকে ভেদ করে, সুরঙ্গ পথে নেমে এসেছে প্রপাতের ধারা। একখণ্ড বড় পাথরের ওপর বসে, খুকু আর কল্পনা দুজনেই পাদুটো দোলাচ্ছে।

জলপ্রপাতের ধারা ওদের মন কেড়ে নিয়েছে। খুকুর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল মৃদুমধুর তান।

"তুমি মধুর অঙ্গে নাচ গো রঙ্গে নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে—
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি"

সুন্দরীর উল্লাস-ধ্বনি শুনছি।

ঐ ধ্বনিতে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে মন। প্রায় দু'শ ফিট উচু থেকে, নীচে নেমে এসেছে এই প্রপাত। উপলখণ্ডে আহত হয়ে, আক্রোশ আস্ফালনে চলে গেছে নীচে, গভীরে।

সুরের রেশ ভেসে আসছে কানে।

"কি সুধা তব সংগীতে কি শোভা তনুভঙ্গিতে
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কি মোহ আনি।"

রনদুর্ম্মদ, অশান্ত ধারা। স্রোতের আলোড়নে সৃষ্টি করে চলেছে ঘূর্ণাবর্ত্ত। উৎক্ষিপ্ত শীকরকণার সূক্ষ্ম বাষ্পজালে, প্রখর কর দীপ্তি পড়ে, ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় অপূর্ব্ব চমক ফুটে উঠেছে।

শ্বেতধারার স্তবকিত কুন্তলে, সেজেছে সুন্দরী। দেখব প্রাণ ভরে, মন দিয়ে।

কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, সম্মুখে। বিপদের কথা চিন্তা না করেই, চলেছি পিচ্ছিল পথ ধরে, পাথর থেকে পাথরে। আতঙ্কিত নিষেধাজ্ঞা পিছন থেকে টেনে ধরছে। ভেসে আসছে কানে সঙ্গীদের আর্ত্ত কণ্ঠ।

আমি নই, কোন যাদুকাঠির স্পর্শে আমি আর আমিতে নেই। সম্মোহিত, মোহাবিষ্ট! বাধা নিষেধের কোন কথাই কানে ঢুকছেনা।

শৈবালাচ্ছন্ন পাথর। মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় পলকে প্রলয় ঘটে যেতে পারে। আতঙ্কিত দুরুদুরু বক্ষে, লাফিয়ে, বসে আর হামাগুড়ি দিয়ে একটা মস্ত বড় উপলখণ্ডের ওপরে এলাম।

সুন্দরীর অপরূপ রূপ, কৃষ্ণ বাহাদুরকেও দোলা দিয়েছে। কৃষ্ণ বাহাদুর বলছে—সাধু সন্ন্যাসীরা জটাজুট আর ছাই ভস্ম মেখে, সংসারের

মায়া ছেড়ে এই রূপেরই টানে, চলে আসে হিমালয়ের অনধিগম্য দুস্তর গিরি কন্দরে।

অনাহত, অনাঘ্রাত, এই রূপসুষমার কাছে তুচ্ছ কামিনী কাঞ্চন, তুচ্ছ পার্থিব বৈভব।

মনে মনে বলি সাবাস! এ যে আমারই অন্তরের কথা।

নয়ন ভরে, তন্ন তন্ন করে, দেখছি সুন্দরীকে। ক্ষুব্ধ প্রবাহ অট্টহাস্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। দারুণ রোষে, ফুলে ফুলে উঠছে ফেনিল বারি ধারা। না! থাকবে না বন্দী হয়ে পাষাণ কারায়। যাবে উপত্যকায়, যাবে শস্য প্রান্তরে, করবে সৃষ্টি শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

ভুলে গেছি সব কিছু। আনমনে বসে দেখছিলাম তো দেখছিলামই।

গড়িমসি করে বেলা গড়িয়ে গেল। সঙ্গীরা সব নেমে আসছে। ওদের সঙ্গে মিলতে হবে। অতিকষ্টে, সন্তর্পণে, শঙ্কাসঙ্কুল পথ ধরে ফিরে এলাম আবার। বিপত্তি কিছু হল না।

ওদের কাছে এসে দাঁড়াতেই, অভিযোগের তীক্ষ্ণ শরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সব যুক্তি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, প্রশ্নের বাণে জর্জ্জরিত করে দিল।

কেন এই দুঃসাহসিক কাজ করেছি! কেন এই অদ্ভুত খামখেয়ালী!

উত্তর না দিয়ে চুপ করেই থাকি।

ওরা কিছুটা শান্ত হবার পর কাচুমাচু ভাবে বললাম—একটা চমকপ্রদ কাহিনী শোনাব বলে, এতক্ষণ পাঁয়তারা কষলাম, তা আর হল না। তোমাদের শাসনে গুলিয়ে গেছে সব। অপরাধী আমি, যা হয় দণ্ড দিতে পার। মাথা পেতে নেব। চল জীপে গিয়ে বসি।

হৈ চৈ করে উঠল সকলে। না, না, তা হবে না। আপনাকে দণ্ড ভোগ করতেই হবে আর সে দণ্ড হচ্ছে—এখানে এই মুহূর্ত্তেই, বিবৃত করতে হবে কাহিনীটা।

ওরা কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারছে না।

"কই স্মুরু করুন" সকলের চোখেই প্রচণ্ড ঔৎসুক্য।

ওরা আমার পূর্ব্ব আচরণ একেবারে ভুলে গিয়ে চক্রাকারে বসে পড়ল মাটির ওপর।

শোন তবে বলি—নেপালবাসীদের কাছে শোনা যায় অনেক রূপকথা, উপকথা আর পুরাকথা। এমনি একটা স্মুন্দর কাহিনী আছে স্মুন্দরীজলকে কেন্দ্র করে।

গৌতম বুদ্ধের দেশ নেপাল। ওর শিষ্যদের কার্য্যকলাপে ছেয়ে আছে এই দেশ। তিব্বত যাওয়ার পথে, অতীশ দীপঙ্কর এসেছিলেন নেপালে। ভগবান তথাগতেরই আর এক শিষ্য—মঞ্জুশ্রীদেবও এসেছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য্য।

এই স্মুন্দরীজলের পাহাড়ে, এসেছিলেন মঞ্জুশ্রী। শৈলকন্দরে বসে তপস্যা করেছিলেন অনেকদিন ধরে। দেখতে পেয়েছিলেন, গিরির বাহুবন্ধনে আবদ্ধা স্মুন্দরীকে।

মুক্তির পথ নেই!

মর্দ্দিতা স্পৃষ্টা স্মুন্দরীর কাতর আর্ত্তনাদে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মঞ্জুশ্রী। চূর্ণ করে ফেললেন তাই গিরিগাত্র, খড়্গের এক আঘাতে। পাহাড়ের অবরোধ ভেঙ্গে, ফেনিল বেণী দুলিয়ে, অধীর উল্লাসে, তটিনীর রূপ ধরে নেমে এল স্মুন্দরী। মার্জ্জিত করল গিরি উপবন, সৃষ্টি করল মৃন্ময় সমতল। মায়ের স্তনধারায় পুষ্ট শিশুর মত, বাগমতীর স্রোতধারায় পুষ্ট হল কাঠমাণ্ডু উপত্যকা। বিশ্বাস কর আর চাই না কর। এই হ'ল বাগমতীর জন্ম কথা।

উপকথাটি শেষ হল। মৃদুমন্থর পদক্ষেপে এসে বসল সবাই জীপে। ফিরে এলাম কাঠমাণ্ডু সহরে। আজকের মত শেষ হল পথ চলা।

হিমালয়ের অন্তঃস্থলে, প্রাকৃতিক সম্ভারের যত মনিকুট্টীম রয়েছে, কেদার-বদ্রী ছাড়া অন্য কোন স্থানেরই তুলনা হয় না নেপালের সঙ্গে।

কাশ্মীরই বল, কুলু-কাংড়াই বল, আর কুমায়ুনই বল, ম্লান হয়ে যাবে সব, নেপালের কাছে। এর বৈচিত্র আর বর্ণবৈভব কল্পনার অতীত, অমৃতের অতীতও বলা যেতে পারে।

রূপ সৌন্দর্য্যের পূজারীর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য, এই নেপালের প্রকৃতি। বর্ণাঢ্য এ চিত্রন, নেপালের যত্র তত্র। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে আধুনিকতার ছাপ লাগলেও খুঁজে পাওয়া যায়, প্রকৃতির অনেক রূপ-লেখা। এর আকাশ বাতাস ফুল গন্ধ ভারে সুরভিময়, এর প্রতিটি গৃহকোণ রোমাঞ্চ মধুর, প্রতিটি অঙ্গণ মাদকতায় ভরপূর। রূপকথা, উপকথা আর পুরাণো কাহিনী, মিশে আছে এর প্রতিটি ধূলিকণায়। বৃন্দাবনেরই মত পথে ঘাটে ছড়ানো আছে দেব-দেউল। দেবতাত্মা হিমালয়ের তুষারমৌলী এর মেখলা, প্রকৃতি এখানে দিগম্বরী।

সহর থেকে একটু ফাঁকায় চলে এস দেখবে, কে যেন খুলে দিয়েছে অমৃতলোকের দ্বার। দেখতে পাবে একই সঙ্গে, একই পংক্তিতে সহস্র তুষারশীর্ষ। কিছুতেই বসে থাকতে পারবে না ঘরে। স্বপ্নে, ঘুমে, জাগরণে, আবেগ উদ্বেল করে তুলবে তোমার প্রাণ সত্বাকে। বেরিয়ে তোমাকে আসতেই হবে।

॥ ৮ ॥

পরের দিন—আজ সারা দিন ঘুরব আমরা পথে পথে। মন্দিরে মন্দিরে, বনে, উপবনে। যাব স্বয়ম্ভূনাথ, মঞ্জুশ্রী চৈত্য, বালাজু আর বোধ নীলকণ্ঠ।

ঝুড়িতে বোঝাই অনেক খাবার নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ বাহাদুর ওর ঘরণীকে নিয়ে এসেচে। আজ ওরা দুজনে যাবে আমাদের সঙ্গে। কল্পনা আর মানবও এসে গেছে। আমরাও তৈরী হয়ে পড়েছি।

বসবার সঙ্গে সঙ্গেই জীপ চলল মিউজিয়মের দিকে। এই মিউজিয়মের বয়স হয়েছে প্রায় ১০০ বছর। গোর্খা আমলের নেপালের

সভ্যতা আর সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় আছে এখানে। তবে উল্লেখ যোগ্য অংশ অধিকার করে আছে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, কুঠার আর আনুসঙ্গিক অস্ত্র শস্ত্র।

মিউজিয়মের একটা সংরক্ষিত অংশে অনেক হাতে লেখা পুঁথিও রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো, রাণা বংশের পূর্ব্বপুরুষদের তৈলচিত্র আর রাজা-রাণীদের প্রতিকৃতি। আশ্চর্য্য লাগল, একটা জিনিষ দেখে। নেপোলিয়নের ব্যবহৃত তলোয়ারটা সযত্নে রাখা আছে এখানে। ফরাসী গর্ভণমেণ্ট, রাণা জঙ্গ বাহাদুরকে এটা উপহার দিয়েছিলেন।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এলাম। চলেছি স্বয়ম্ভূনাথের দিকে। পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে স্বয়ম্ভূনাথ। শীর্ষদেশটি দেখতে ঠিক গম্বুজের মত।

অল্প সময়ের মধ্যেই জীপ এসে দাঁড়াল পাহাড়ের নীচে।

ছোট ছোট গাছপালার আড়ালে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে নানা ধাঁচের অসংখ্য বুদ্ধ মূর্ত্তি। সম্মুখেই মন্দিরের সোপান শ্রেণী। ধাপে ধাপে ৫০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা যায় মন্দিরে। দুরূহ খাড়াই পথ।

খুকু, কল্পনা আর মানব, বয়সে কাঁচা—ওরা শ্রমকাতর নয়, ছুটে চলে গেল ওপরে।

দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছুটা আয়াস না করলে দেবতার দর্শন মিলবে না। সঙ্গীরা সব চলেছে ঢিমে তালে। সময় চলে যায় যাক্ ওরা কষ্ট করবে না। ওদের মন্ত্র "চল ধীরে ধীরে।" দু'চার ধাপ উঠছে, পিছনে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে, কতটা উঠেছে! দাঁড়িয়ে রইল হয়ত কিছুক্ষণ অলস ভঙ্গিতে। যুদ্ধং দেহি মনোভাব ওদের নেই। সিঁড়ির কাছে ওরা পরাজিত।

ওরা উঠে চলেছে, যেন নেহাৎ অনিচ্ছাতেই উঠছে।

পাল্লা দেবার বয়স অনেক আগেই ছেড়ে গেছে। প্রতিযোগিতার

মধ্যে আমি নেই। ধীর স্থির ভাবেই এগিয়ে চলেছি। নীরু এগিয়ে চলেছে—যেন যন্ত্রচালিত পুতুল, ভাববিকার হীন।

স্বয়ম্ভূনাথে জনাকয়েক বিদেশী পর্য্যটকদের সঙ্গে দেখা হল। ওদেরই একজন মিঃ ফিলিপ্‌স্‌ ইটালী থেকে এসেছেন। অনবরত ঘুরিয়ে চলেছেন, ওর হাতের ম্যুভি ক্যামেরা। কিছুক্ষণের জন্য ভদ্রলোক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কত ছবি তুললে?

ওর ম্যুভি ক্যামেরা আর আমার রোলি কর্ড। কে জানে হীনমন্যতায় পীড়িত কিনা। তাচ্ছিল্য ভরেই বলি, সে অনেক, ৬।৭টা স্পুল ত নিশ্চয়ই।

কেমন হবে মনে হচ্ছে?

মন্দ হবে এমন কোন আশঙ্কা বা সংশয় নেই।

সঙ্গীরা সকলে উঠে পড়েছে সর্ব্বোচ্চ ধাপে। আমার এখনও প্রায় ১০০ টি সিঁড়ি ভাঙ্গতে বাকী আছে। নীরুর হয়ত দু'একটা কম।

নীরু হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঝপ্‌ করে একটা ধাপের উপর বসেই কাতর ভাবে বলে উঠল—পারছি না আর। পারব না ওপরে উঠতে। দমটা বন্ধ হয়ে আসছে।

ওর পাশে গিয়ে বসলাম। আলতোভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। দরদ মাখান স্বুরে বললাম, ভয় নেই কিছু; একটু জিরোও, সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। দিব্যি চলে যেতে পারবে।

সান্ত্বনার ছলে কথাগুলো বললেও সন্দেহ হচ্ছে। ফেঁকাসে, রক্তহীন—ওর পাণ্ডুরাভ মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবনাই হল। সঙ্গীদেরও কেউ কাছে পিঠে নেই। নিজেকেও কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। জলের পাত্র থেকে একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলাম ওর চোখে মুখে।

আঃ কি শান্তি! আলগোছে নীরু দেহটা কাত করে দিল সিঁড়ির কোণে। এবার ফ্লাস্ক থেকে একটু দুধও গলায় ঢেলে দিলাম।

চোখ বুজে, নিঃশব্দে পড়ে রইল নীরু।

ওকে ডাকলাম। চোখ মেলে তাকাল একবার।

"চল ওপরে যাই। এখন ত ভালই আছ।" সাগ্রহে জানালাম কথাটুকু।

"না, ওরা যখন নীচে নেমে যাবে তখন ওদের সঙ্গেই ফিরে যাব। ওপরে আমি উঠব না।" ক্লান্ত, বিষাদভরা নীরুর কণ্ঠস্বর।

"ভয় কি, আমি ত রয়েছি। চল, ওঠ। আমার কাঁধে ভর দিয়ে এস।" হাত বাড়িয়ে দিলাম নীরুর দিকে।

আর দ্বিরুক্তি করল না—নীরু ওর ক্লান্ত দেহটা পরম নির্ভরতায় এলিয়ে দিল আমার ওপর। ধীরে, ধীরে, উঠে এলাম ওপরে।

এই ত আমরা এসে গেছি! ঐ যে সঙ্গীরা সব দাঁড়িয়ে আছে। দুটো কি তিনটে সিঁড়ির ব্যবধান মাত্র।

নীরু একটু জোর পেয়েছে! আমার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে একা একাই ওপরে উঠে গেল।

ওর গমনভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইলাম। অল্প কিছুটা পর আমিও মিললাম ওদের সঙ্গে।

কি ব্যাপার! এত দেরী যে! হুমরী খেয়ে পড়ল সবাই।

পাশ কাটিয়ে বললাম—"কি চমৎকার মন ভুলান দৃশ্য দেখ ত!"

কাঠমাণ্ডু সহরের দিকে আঙ্গুলটা বাড়িয়ে দিলাম।

"সত্যিই ত কি সুন্দর, কি চমৎকার!" এক সঙ্গে সকলে কণ্ঠ মেলাল।

ছবি তুললাম কিনা অনেকগুলো—তাই দেরী হয়ে গেল। তোমরা কি ভাবছিলে আমরা হারিয়ে গেছি?

স্বয়ম্ভুনাথ! বয়সে অতি প্রবীন। কমপক্ষে দু'হাজার বছরের

পুরাণো এই সৌধ। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, ঝড়, ঝঞ্ঝা, আর ভূ-কম্পের আলোড়নে, বহুবার বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তবু আপত্তি জানায়নি কখনও। সহ্য করেছে সব উৎপীড়ন, নীরবে, নির্ব্বিকার চিত্তে! বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের এক ঐতিহ্যপূর্ণ নিদর্শন ধরে রেখেছে ওর অঙ্গে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভিনিবেশে দেখছি সব কিছুকে। ইতিহাসের সুদূর অতীতের পাতায়, তত্ত্ব আর তথ্যের সন্ধানে আপনিই হারিয়ে গেল মন।

নিষ্প্রাণ গাম্ভীর্য্য আবার ঘিরে ধরেছে নীরুকে। স্বয়ম্ভূনাথকে প্রদক্ষিণ করে হঠাৎই সবাইকে ছেড়ে আবার লুকিয়ে পড়ল কোথায়! এক অতি নির্জ্জন কোণে ওকে পেলাম।

ওর পাশে দাঁড়ালাম।

কি হয়েছে তোমার, ঠিক করে বল ত ?

"জান—বনের বাঘকে মানুষ তবুও এঁটে উঠতে পারে, কিন্তু মনের বাঘকে পেরে ওঠে না কেউ।" ওর গোপন কথাটুকু জানবার আশায় উৎসুক হয়ে রইলাম।

নীরু চুপ করেই রইল।

"কেন তোমার এই আত্মপীড়ন! দূর করে দাও তোমার অতীতকে, নূতন করে সুরু কর জীবন। আবেগের কোন স্থান নেই বাস্তব পরিস্থিতিতে। যদি কখনও প্রাধান্য দাও হেরে যাবে নিশ্চয়ই।"

কুণ্ঠায় মূক হয়েই রইল নীরু।

"কেন, কেন এ বিরাট শূন্যতার মাঝে কাটাবে তোমার জীবন, কাটাবে তোমার ভবিষ্যৎ!" আবেগের আবেদনে নীরুকে নাড়া দিলাম।

"চূরমার করে ফেল কোমল বৃত্তিকে, মুছে ফেল মন থেকে, সোমনাথ তোমার কেউ নয়।" গলার স্বরটা এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিলাম।

পাষাণের কণ্ঠে এবার ভাষা এল। চেষ্টা ত করি, পারি কই ? ক্লান্ত নীরস কণ্ঠে উত্তর দিল নীরু।

বেশ উত্তাপের সঙ্গেই বললাম—পারতে তোমাকে হবেই। দেহের

মৃত্যু ঘটিয়ে আত্মা কি শান্তিতে থাকতে পারে? এ যে শুধুই বঞ্চনা আর ব্যর্থতা। নারীমর্য্যাদার অবমাননা। পরাজয়ের গ্লানি।

বিবশ, বিকল নীরু। সহজ শান্তভাবেই বলে দৈহিক কোন কামনাই আর এ জীবনের প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারবেনা। তাই ত নিয়েছি বেছে এ জীবন। মীমাংসা যদি খুঁজে না পাই তবে ঘুরেই মরব।

"এই তোমার শেষ কথা? এমনি করে জীবনপাত করবে তুমি?"

"হ্যাঁ তাই।"

নির্ব্বাক, নিশ্চল, হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল নীরু। বড় বড় চোখ দুটোতে মুক্তোর মত টলটল করছে জমাট বারিবিন্দু।

বিষাদ আবেগে ভেঙ্গে পড়া কণ্ঠে বলে উঠল—আমাকে দুর্ব্বল করে দিও না। তুমি যাও! তুমি যাও!

ত্রস্তে আমার সান্নিধ্য কাটিয়ে চলে গেল নীরু।

হতভম্ব হতবাক—বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চিরকালই দুর্ব্বোধ্য, দুজ্ঞেয় হয়ে রইল নীরু।

স্বয়ম্ভূনাথকেই দেখছি। স্তূপশীর্ষে সোনার পাতে মোড়া গম্বুজ আর বোধনাথের মতই সেই দুটি অতন্দ্র নেত্র। পেছনের দিকে রয়েছে, বিরাট পরিধির মনিচক্র আর পৃথক সৌধে আছেন সোনার পাতে তৈরী বুদ্ধ।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য, একই দেবাঙ্গণে দুই ভিন্ন ধর্ম্মীয় দেউল—বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুগ স্তূপ আবার হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত শীতলাদেবী। সহ-স্থিতির এক পরম আদর্শ, এই স্বয়ম্ভূনাথ।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসী নেওয়ার জাতির লোকেরা সবাই বৌদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে ভারতের নানা অঞ্চলের বাসিন্দারা আসে নেপালে, সঙ্গে নিয়ে আসে হিন্দুদের সংস্কৃতি। বর্ত্তমানে নেপালে দুই ধর্ম্মের লোকেরাই বসবাস করে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বা ধর্ম্ম নিয়ে কোন কলহ, ঝগড়াঝাটির কোন কথা, শোনা যায় নি কখনও।

নেপালের যত্রতত্র, নগরে, জনপদে, পল্লীতে, দেখা যায়, অনেক বৌদ্ধ স্তূপ। ওরই আশেপাশে ছড়ান আছে, নানা আকারের নানা ভঙ্গির প্রশান্ত বুদ্ধ মূর্ত্তি। অমনি আবার দেখা যায় শিব আর শক্তির মন্দির।

দূর অতীতে এ রাজ্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবান্বিত ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্ত্তমান রাজগোষ্ঠী, রাজপুতেরা রাজ্য বিস্তারে আসে নেপালে, ঐ সঙ্গে নিয়ে আসে, ওদের কলা-কৃষ্টি আর আচার, তাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রসার হতে থাকে ক্রমে ক্রমে।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী বনে। নেপালেরই তরাই অঞ্চলভুক্ত কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন। মাতা মায়া দেবী, সিদ্ধার্থকে শিশু অবস্থায় রেখে মারা যান। বিমাতা গৌতমী পরমযত্নে লালন করেন শিশুকে, তাই সিদ্ধার্থের নাম হ'ল গৌতম।

রাজপুত্র হলেও, শিশুকাল থেকেই সাধু সেবা আর ঈশ্বর ধ্যানে গৌতমের তৃপ্তি হত। ওর সব আচরণ আর নানা সহজাত লক্ষণ দেখে, পিতা শুদ্ধোধন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অশোকভাণ্ড উপলক্ষ করে, শ্যালক দণ্ডপানির কন্যা, গোপার সঙ্গে গৌতমের বিয়ে দিলেন। গৌতমের বয়স তখন মাত্র ১৯ বৎসর।

পূর্ণ দশ বৎসর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার পর সিদ্ধার্থের আবার ভাব বিপর্য্যয় স্থুরু হ'ল। ভাবের আলোড়নে স্ত্রী পুত্র রেখে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলেন। কিছুকাল ধরে বৈশালী নগরে দর্শন আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে রাজগৃহে এলেন। ঋষি রুদ্রকের কাছে দীক্ষা নিলেন, তারপর কিছুকাল তপশ্চারণে ব্রতী হলেন। এরপর সিদ্ধার্থ নিজেই হলেন গুরু। পাঁচজন শিষ্য, সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নিলেন ওঁর কাছে। এবার সিদ্ধার্থ এলেন গয়াতে। বোধিদ্রুম মূলে, সাধনায় ব্রতী হয়ে পেলেন বুদ্ধত্ব। বোধিদ্রুমের আশ্রয় ছেড়ে

বুদ্ধ চললেন আবার ধর্ম্ম প্রচারে। সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলেন। নানাস্থানে ভিক্ষুসঙ্ঘ গঠন করলেন, চৈত্য আর বিহার প্রতিষ্ঠা করলেন।

স্ত্রী গোপা দীক্ষা নিলেন স্বামীর কাছে। গোপা হলেন স্ত্রী-ভিক্ষুনীদের সঙ্ঘ-নায়িকা। তদানীন্তন রাজশক্তি এল সাহায্যে, পুষ্ট হল বৌদ্ধ ধর্ম্ম। নৃপতি বিম্বিসার দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নিলেন বুদ্ধ ভ্রাতা নন্দ আর পুত্র রাহুল। নূতন ধর্ম্মের প্লাবনে সারা ভারতবর্ষ মেতে উঠল। কঙ্কালসার হিন্দু ধর্ম্ম তখন মৃত্যুশয্যায়।

একাদিক্রমে ৪৫ বছর ধরে, বুদ্ধ ঘুরে বেড়ালেন ভারতে, ভারতের বাইরে, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম আর সিংহলে, তথা সমগ্র প্রাচ্যে। উড়িয়ে এলেন বুদ্ধ ধর্ম্মের জয় পতাকা।

ওর ধর্ম্মমত উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই মতবাদকে স্বীকার করলেন না। অস্বীকার করলেন যাগযজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ।

"সর্ব্বম অনিত্যম সর্ব্বম্ শূন্যম্" এই হল বুদ্ধের মতবাদ।

বসে আছি স্বয়ম্ভু মন্দিরের চত্বরে। স্বতঃই মন-মানসে ভেসে উঠছে, সব পুরাণো কথা, আর একটি মহাপুরুষের কথা। আলোড়িত হতে লাগল সমগ্র যুক্তিজাল।

ভাবছি। ভেবে আশ্চর্য্য লাগছে—যে বুদ্ধের জন্ম হল এই নেপালে, যে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব হলেন ভারতে, সারা জীবন যাঁর কাটল ভারতভূমিতে শেষে কিনা সেই বুদ্ধেরই প্রচারিত ধর্ম্ম বিস্মৃত হল ওর জন্মভূমি, বিদূরিত হল ওর সাধনক্ষেত্র থেকে।

গলদ নিশ্চয়ই কিছু ছিল, নইলে এতবড় একটা ধর্ম্ম মত, বুদ্বুদের মত নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে ভাবতেও পারা যায়না। হয়ত পরবর্ত্তী কালে, হাল ধরবার উপযুক্ত ধর্ম্মপাল ছিলেন না কেউই, নয়ত এমনটা হবে কেন?
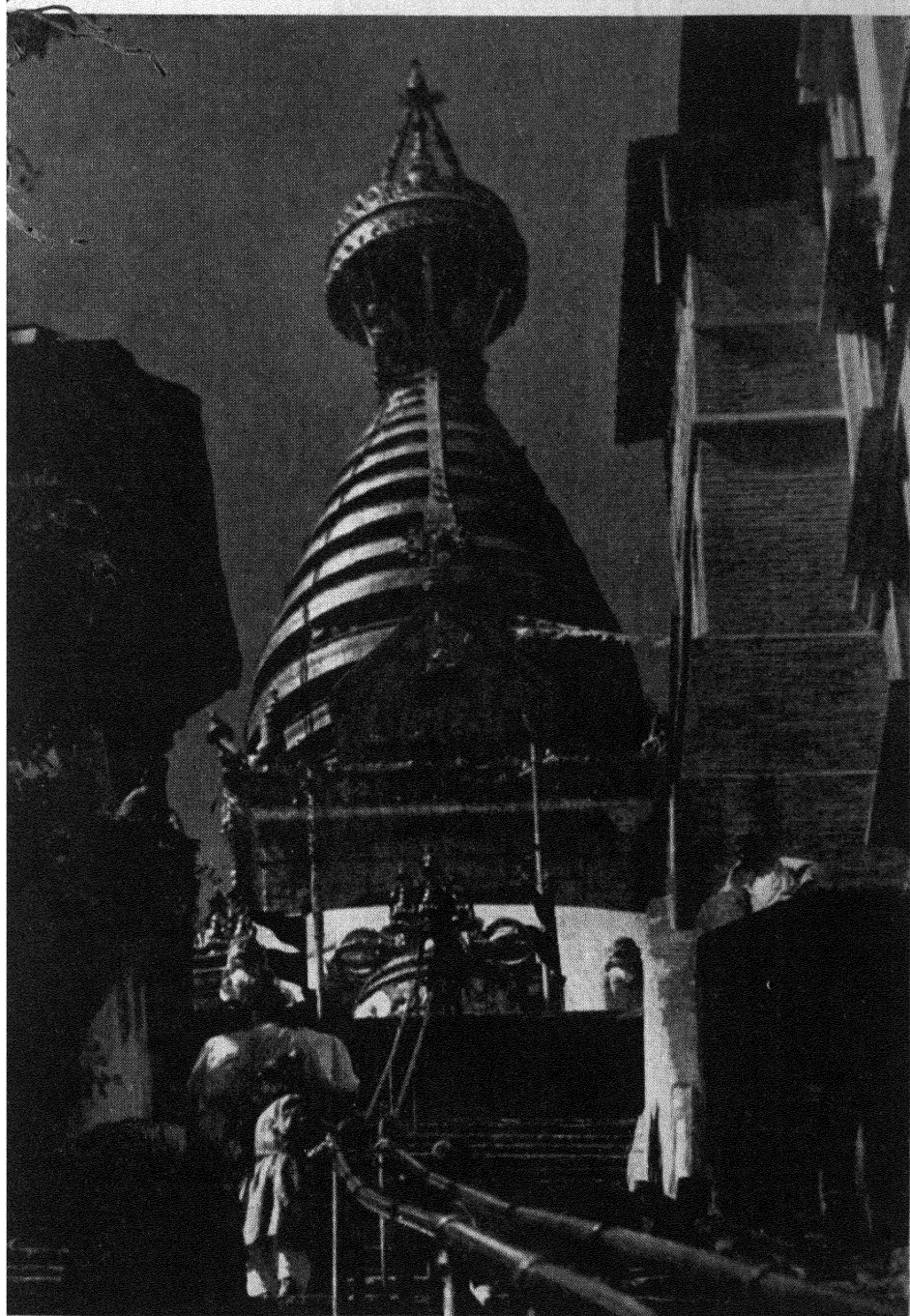
জ্যোতিপুঞ্জে উদ্ভাসিত হল কমলদল—এই স্বয়ম্ভূ !

কৃষ্ণমন্দির (পাটান)

নেপালের চিরাচরিত স্থাপত্য ধারা থেকে স্বতন্ত্র—দ্বারকার কৃষ্ণমন্দিরের অনুরূপ

শোনা যায়, বুদ্ধের পর, ক্রমে ক্রমে, অনেক তান্ত্রিক অনাচার—মারণ, উচাটন, পিশাচসিদ্ধি এমনি আরও কুসংস্কার ঢুকেছিল এই বৌদ্ধ ধর্ম্মে। আচারের নামে ব্যাভিচারে বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল এই ধর্ম্ম।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সনাতন ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, ত্রিবাঙ্কুরের মালাবার অঞ্চলে কালাদি গ্রামে, ৭৮৮ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হলেন শঙ্কর। লোকাতীত প্রতিভা আর মনীষার অধিকারী হয়ে জন্ম নিলেন জাতিস্মর এই মহাপুরুষ।

অনেক লোকশ্রুতি শোনা যায় এই প্রতিভাধর মহাপুরুষ সম্বন্ধে। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। অতি শৈশবেই মার কাছে সন্ন্যাসের অনুমতি চাইলেন। কিছুতেই রাজী হলেন না, শঙ্কর বিহনে মা চোখে অন্ধকার দেখেন।

একদিন শঙ্কর মায়ের সঙ্গে কুমীরে সমাকীর্ণ আলোয়াই নদীতে স্নান করতে এলেন। হঠাৎ মায়ের হাত ছাড়িয়ে চলে এলেন অনেকটা দূরে।

মায়ের কাছ থেকে সন্ন্যাসের অনুমতি আদায় করতেই হবে। ছল করে মাকে বললেন—মা, আমি কুমীরের পেটেই যাব। শুনেছি শুদ্ধাত্ম লোক কুমীরের পেটে গিয়েও ব্রহ্ম লাভ করে।

মাগো! সন্তানকে ধরে রাখতে চাইলে বুকে, আজ ত কই ধরে রাখতে পারছ না!

হতচকিত মা। ওরই চোখের সামনে শঙ্কর ক্রমেই চলে যাচ্ছেন গভীর জলে আর অবিরত আর্ত্তনাদ করছেন কুমীরে ধরে নিল—মা, কুমীরে ধরে নিল যে! আর কিন্তু ফিরে পাবেনা তোমার সন্তানকে।

এখনও অনুমতি দাও। তোমার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই বেঁচে যাব এ যাত্রা। স্নুরু হবে আমার নূতন জীবন।

হৃতজ্ঞান মায়ের সম্বিৎ ফিরে এল। বললেন—তোমাকে এমান করে হারাতে আমি পারব না। অনুমতি দিচ্ছি, উঠে এস।

তীরে উঠে এলেন শঙ্কর। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এবার প্রব্রজ্যা নিয়ে বের হলেন পথে। নর্ম্মদা তীরে শ্রীগোবিন্দ পাদাচার্য্যের কাছে অধ্যয়ন করলেন নানা ধর্ম্মশাস্ত্র। রচনা করলেন যাবতীয় দর্শন—বেদ, উপনিষদ আর পুরাণ ভাষ্য। শিক্ষা সমাপ্ত হল বারাণসী ধামে। পরিক্রমা করলেন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত। নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে, রসাতলে পাঠালেন বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মকে।

আপন মহিমায় ভাস্বর—শঙ্কর প্রচার করলেন বৈদিক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম। বদরীক্ষেত্রে যোশী মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ—ভারতের চার প্রান্তে স্থাপিত করলেন চারটি মঠ। সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু ধর্ম্ম। নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল শিব আর বিষ্ণু মন্দির। নেপালের এই পশুপতিনাথ শঙ্করেরই প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম বিজয়ের স্বাক্ষর।

শঙ্কর বাঁচালেন সনাতন ধর্ম্মকে, বাঁচালেন মরনোন্মুখ হিন্দু জাতিকে, মিশে রইলেন হিন্দুর রক্তে, মিশে রইলেন হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে। বেঁচে রইল বেদ, বেঁচে রইল বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম।

"স্বল্পশ্চায়ুঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" শঙ্কর কখনও উপেক্ষা করেন নি এই ঋষি বাক্য। মাত্র ৩২ বছর বয়সে কেদার ধামে দেহান্তর হলেও দূরদর্শী শঙ্কর হিন্দু জাতির কাছে রেখে গেলেন পরম ধন, অমিয় জ্যোতি।

অনেক সময় কেটে গেল, স্বয়ম্ভু মন্দির চত্বরে। উল্টো পথ দিয়ে মঞ্জুশ্রী চৈত্য আর আনন্দকুঠি হয়ে নীচে নেমে এল সকল সঙ্গীরা।

ড্রাইভার প্রস্তুত হয়েই ছিল। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে চঞ্চল হয়ে উঠল এঞ্জিন, গাড়ী এগিয়ে চলল বালাজুর পথ ধরে।

বেলা প্রায় তুপুর হয়ে গেছে, এমনি সময়ে বালাজুতে এলাম। বালাজুর এই জায়গাটুকু ছোটখাট একটা বাগানের মত। ছোট একটি জলাধারের মধ্যে অর্দ্ধ নিমজ্জিত পাষাণ বেদীর উপর অনন্ত শয়নে বিশ্রাম করছেন বিষ্ণু মূর্ত্তি। কাছেই আর একটি জলাধারে রোহিত জাতীয় ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য মাছ চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। উদ্যান বাটিকার চারদিকে শান্ত শ্রী। স্থানীয় যাত্রী, দেশী, বিদেশী, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেরও তু' চারজনকে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। যাত্রীরা সকলেই বেশ ধীর স্থির। এই পরিবেশে আমরা যেন কিছুটা বেমানান। সকলেই হৈ হুল্লোর আর উচ্চরোল তুলেছে। ওদের মন্থর পদক্ষেপ আর আমাদের চঞ্চল চরণ-পাতে ক্ষণেকের জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল উদ্যান বাটিকা।

মধ্যাহ্নের রৌদ্র তাপে জ্বলজ্বল করছে পাহাড়শীর্ষ! নীচে অরণ্যের মসীকালো ছায়া ঢাকা শ্যামল বনশ্রী। পাহাড় প্রাচীরে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল, ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে আছে নাগার্জ্জুনের সারি। ওরই গা বেয়ে নীচে নেমে এসেছে নৃত্যপরায়ণ উৎস। কৃত্রিম উপায়ে ধরে আনা হয়েছে এই জলধারাকে। ভিন্ন ভিন্ন ২২টি নল পথে চালনা করা হয়েছে জল স্রোত, তাই বালাজুর আর এক নাম ২২ ধারা। এই ধারাই আবার নেমে গেছে নীচে, মিশেছে বিষ্ণুমতীতে।

বেশ হাসিতে খুশিতে কিছুটা সময় কেটে গেল।

বালাজু থেকে চলেছি এবার বোধ নীলকণ্ঠে।

উচু নীচু, বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলল জীপ। কুপিত গুরুমশায় যেমন ছেলেকে কান ধরে ওঠ বস করায় ঠিক তেমনি করে জীপটাও অনবরত গদীর ওপর ওঠ-বস্ করিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে। রাস্তার পাশে গ্রামের চিহ্ন নেই। চারদিকে শুধুই ধান ক্ষেত।

মেয়ে পুরুষেরা একসঙ্গে কেটে চলেছে ধান।

বাংলা দেশের লোক, আমাদের একটু আশ্চর্য্যই লাগল। বাংলার চাষী পরিবারের মেয়েকে কখনও মাঠের কাজে হাত লাগাতে দেখা যায় না। অবশ্য সাঁওতাল মেয়েরা এর ব্যতিক্রম। ঠিক এর বিপরীতটা দেখছি নেপালে। এখানে বাইরের কাজে, মেয়েরা পুরুষদের চাইতে কম ত নয়ই বরং বেশী। নেপালী মেয়েরা বেশ পরিশ্রমী আর সহিষ্ণুও।

ওপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ, নীচে সোনালী ধানক্ষেত। মন্দ মধুর হাওয়া ভেসে আসছে তুষারশৃঙ্গের দিক থেকে। মেয়েরা মাঠে কাজ করতে করতে গান গেয়ে চলেছে। পুরুষ মেয়েতে অবাধ মেলামেশা। হঠাৎ মাঝে মাঝে হেসে উঠছে খিল খিল করে। উপচে পড়ছে সোনার ফিনকি ঐ হাসিতে।

সোনা ছড়ান নেপালের সর্ব্বত্র। সোনা ক্ষরিত হচ্ছে ঐ তুহিনশীর্ষে, সোনা ঝরছে রৌদ্র ঝলমল আলোতে। সোনার খনি ঐ আঁটি বাঁধা ধানের স্তূপে, সোনা দেবদেউলের অঙ্গে। সোনা ঐ পাহাড়ী মেয়েদের গালে, সোনা ওদের চটুল চাহনিতে। চারদিকে সোনার বন্যা। সোনায় মোড়া সারা বাগমতী উপত্যকা।

খেয়াল নেই কখন যে গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে গেছে বোধ নীলকণ্ঠে। সোপুরি পাহাড়। নীচে খানিকটা সমতল ভূমির ওপর ছোট্ট মন্দির। দেবতা কিন্তু মন্দিরে নেই। উন্মুক্ত আকাশের নীচে জলাশয়ের মাঝে শেষ-শয়নে রয়েছেন পদ্মনাভ।

চারদিক ঘুরে ফিরে মন্দির অঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এল সঙ্গীরা।

মানব আর কৃষ্ণ বাহাদুরকে আমাদের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি না। গেল কোথায়?

জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা হাজির হল। মানব উত্তর করল—বন ভোজনের একটা জায়গা দেখে এলাম, চলুন ওদিকে যাই।

কৃষ্ণ বাহাদুর আর দ্রৌপদীর মা ঝুড়িটুরিগুলো হাতে করে নিল। আমরা চলে এলাম এক স্রোতস্বিনীর কোলে। ঝির্‌ঝির্ শব্দে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী। বক্ষে ধরে রেখেছে ছোট বড় নানা আকারের উপলখণ্ডের মালা। শ্রী মণ্ডিত ক্ষীণধারা বয়ে চলেছে বিরামবিহীন, উপলখণ্ডে আহত হয়ে ঝরে পড়ছে সুরের ধারা।

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে
সেই ধ্বনিতে চিত্ত বীণায় তার বাঁধিব বারে বারে।"

স্রোতস্বিনীর কূলে বসে আছি। মেয়েরা সবাই মিলে হাত লাগাল। ক্ষিপ্রহাতে এগিয়ে দিল খাবারগুলো সবার হাতে হাতে।

তন্ময় হয়ে দেখছি। পাষাণ শৃঙ্খলে আঘাত হেনে চলেছে সুরধুনী। কান পেতে শুনি ঐ সুরের মূর্চ্ছনা। প্রাণ মন ভরে ওঠে কানায় কানায়। ভাবুক করে ফেলেছে এই পরিবেশ।

সারাদিন ঘুরেছি অনেক। খুঁজেছি ঈপ্সিত ধন। নির্জ্জন ঝর্ণা-তলায়, স্থির হয়ে পড়েছে চাওয়া পাওয়া; স্থির হয়ে পড়েছে সবাই, এই প্রাকৃতিক পরিবেশে। এমন কি চঞ্চল খুকু আর কল্পনাও স্থির হয়ে পড়েছে।

খুকু ওর কণ্ঠ থেকে ঢেলে দিল মধু।

"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥"

বিষাদে ভরে ছিল নীরুর মন, হয়ে উঠল বিপরীত। গলা ছেড়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

সুন্দর, সুন্দর, এ জগৎ। কে বলে "সর্ব্বম্ অনিত্যম্, সর্ব্বম্ শূন্যম্। বিশ্বাস করিনা, মানিনা এ কথা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল ঝর্ণাতলায়। ফিরে চলেছি আবার কাঠমাণ্ডুর পথে। মানব, কল্পনা আর খুকুকে রাণীপুকুরীতে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম হোটেলে।

কৃষ্ণ বাহাদুর আর ওর ঘরণীকে যা হোক কিছু একটু ভদ্রতা করতে হয়। অসীমা আর মাধবীর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। ওরা জীপ থেকে নেমেই চলে গেল বাজারে। সুন্দর একটা শাড়ি, আর কিছু জামার কাপড় কিনে এনে, তুলে দিল দু'জনের হাতে। খুসী মনে, প্রহৃষ্ট চিত্তে, বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা।

মদনবাবু মাস্তাং থেকে ফিরে এসেছেন। ওর নিমন্ত্রণ নিয়ে মানব, খুকু আর কল্পনা হোটেলে এল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সবাই। প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও ভদ্রতার খাতিরে না করতে পারল না কেউ। গড়িমসি করে বেরোতে দেরী হয়ে গেল অনেকটা। পথে যখন পা বাড়ালাম তখন রাত প্রায় আটটা। শুক্লপক্ষের চাঁদের সুষমা ছড়িয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্না কিরণের বন্যা নেমেছে টুণ্ডিখেলের ময়দানে। বিন্দুবিন্দু শিশির জমেছে ঘাসে। অলস মন্থর পা ফেলে, চলেছে সবাই। গরম জামা কাপড় গায়ে থাকলেও বেশ শীত লাগছে।

আমরা এসে গেলাম মদনবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায়। ভদ্রলোক সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। নানা ভ্রমণ আর অভিযানের কথা চলতে লাগল। এভারেষ্ট শৃঙ্গবিজয়ে যখন ক্যাপ্টেন হিলারী আর

হাণ্টের দল কাঠমাণ্ডুতে এসেছিল তখন ক্যাপ্টেন হিলারী মদনবাবুকে একটা কনট্যাক্স ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন। ওটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

নিজেরই ম্যুভিতে তোলা—হিমলোকের ছবিগুলো মদনবাবু পর্দায় প্রতিফলিত করছেন। একের পর এক ছবিগুলো মিছিল করে চলতে লাগল। ওরই সঙ্গে সঙ্গে, মদন বাবু তিব্বত মালভূমির বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন। তুষারমৌলীর অপরূপ চিত্র—কখন বা বস্তির ছবি, কখন বা গ্রামের অলস মন্থর জীবন, নয়ত বিচিত্র হিমালয়ের চূড়া। এমনি করে পার হয়ে যাচ্ছে ছবিগুলো ক্রমে ক্রমে।

মেঘে রৌদ্রে, প্রভাতে সন্ধ্যারাগে, দিনের নানা সময়ের তোলা নানা ছবি। পরম আশ্চর্য্য রূপ ছড়ান রয়েছে হিমালয়ের অন্তঃস্থলের পথে পথে। মাঝে মাঝে সঙ্কটসঙ্কুল পথ ধরে চলেছে আরোহণ। মালের বোঝা টেনে চলেছে পাহাড়িয়া মুটে, সঙ্গে চলেছে নিঃশঙ্ক নির্ভীক, বিকারবিহীন শেরপা।

অনেকটা রাত হয়ে গেল। কাঠমাণ্ডু সহর নিঃঝুম হয়ে পড়েছে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হলাম। বেশ শীত শীত করছিল। জানালার খোলা পাট বন্ধ করে গুড়িশুড়ি মেরে ঢুকে পড়লাম কম্বলের নীচে।

বেড়াতে এসেও, ভাবনা চিন্তার হাত থেকে মন ছাড়া পায় না। নীরুর কথাই চিন্তা করছিলাম। কেন এমন করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে ওর জীবন! কেন হয়ে থাকে ম্রিয়মান! কেন উন্মোচিত হয় না ওর স্বাভাবিক পুরাণো ব্যবহার। নীরস, শিথিল, উত্তাপহীন হয়ে পড়েছে কেন ওর গতি?

না! এ রোগ থেকে, ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে। যেমন করেই

হোক, ওর ব্যথাবিষণ্ণ, তাপক্লিষ্ট জীবনে, প্রলেপ বুলিয়ে দিতে হবে। দিতে হবে নূতন রূপ।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। বন্ধ দরজায় টুক্ টুক্ করে মৃদু করাঘাত হল। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

কে? জিজ্ঞাসা করতেই, বাইরে খুকুর গলা শোনা গেল। দরজা খুলে দিলাম।

ভোর পাঁচটায় যায় ঘুম ভেঙ্গে যার তার আজ এত দেরী কেন? শরীর ভাল আছে ত? খুকুর কণ্ঠে একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল।

উত্তরে জানালাম—খারাপ কিছুই নয়। ভালই আছি। এমনিই শুয়ে ছিলাম বিছানায়, আজ ত আর কোথাও যাবনা, তাই। খুকু চলে যাচ্ছিল, ওকে একটু চা পাঠিয়ে দিতে বললাম।

॥ ৯ ॥

আর একটী রাতও কেটে গেল। ভোরের কাঠমাণ্ডু—আকাশের নীলাম্বরীতে কে যেন ছুড়ে দিয়েছে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা। চলেছে বিচিত্র রংএর খেলা। রূপ-রঙে ভরা বায়ুস্তর, এ এক পরম বিস্ময়!

সঙ্গীদের আত্মীয় পরিজনের ফরমাস আছে অনেক। নীরু আর খুকু ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল বাজারে।

একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

কাঠমাণ্ডু সহরটার কিছুই দেখা হয় নি। চলে এলাম হনুমান-ঢোকায়। রামভক্ত অঞ্জনাতনয়ের এক বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি রয়েছে এখানে তাই এ জায়গটার নাম হয়েছে হনুমানঢোকা। অনেক দিন ধরে সিন্দুরলিপ্ত হয়ে, এমন অদ্ভুত রূপ নিয়েছেন অঞ্জনাসুত, যে ভাল করে না দেখলে চেনবারই উপায় নেই।

এই হনুমানঢোকারই এক অংশে দাঁড়িয়ে আছে সাবেক রাজ-প্রাসাদ। ওখানেই কাষ্ঠমণ্ডপ, বাজার, হাট, কুমারীর মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির আরও অনেক মন্দির।

সহরের রাস্তার দৃশ্য দেখছি; দেখছি লোকজন আর ফেরীওয়ালাদের। মাংস নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে ফেরীওয়ালা। বিস্ময় লাগছে, কাঁধের বাঁকে ঝোলান খণ্ডিত মোষের মাংসের টুকরোগুলো দেখে। দোকানের সামনে, মন্দিরের কার্ণিসে ঝোলান রয়েছে মাংসের টুকরো আর শুকনো মাছ।

কি বৌদ্ধ, কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক না কেন, আমিষ আর নিরামিষ—খাবার নিয়ে, গোঁড়ামী নেই এদের।

একটা ফিল্ম কিনব বলে ঢুকেছি রাজ ষ্টুডিয়োতে। অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল মানবের সঙ্গে।

"কাঠমাণ্ডুতে কিছুই ত দেখলাম না, আবার বিকালে যাব ললিতপুরে। সহরটা একবার দেখিয়ে দাও না।"

মানবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলাম।

"আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" তরল হাসিতে জবাব দিল মানব। চোখটা ঘড়ির দিকে দেখে বললাম—হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছ কেন? সময় বেশী হয়নি, মাত্র নটা। আশা করি দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে।

মানবকে নিয়ে একটা রিক্‌শায় চেপে বসলাম। মানব রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করে নিয়েছে—ঘণ্টা পিছু এক টাকা।

ভীমসেন স্মারক স্তম্ভ, রেডিও ষ্টেশন, রাজপ্রাসাদ—সারাটা সহর চক্কর মেরে আমরা হাজির হলাম সিংহ দরবারের তোরণে।

উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারদিক। ভেতরে মস্ত বড় অঙ্গণ। প্রাচীর প্রাকারের বেড় প্রায় দুমাইল।

দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী দেখে ভয় হচ্ছিল। যেতে দেবে কি দেবেনা! এগিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করছি এমনি সময় ধুতি পরা এক নেপালী এসে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। ওর মুখে বাংলা কথা শুনে অবাক্ হলাম। পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কলকাতা থেকে আসছেন ত?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্রী আর ওই ভদ্র-লোকের মধ্যে কি যেন কথা হল। সান্ত্রী পথ থেকে সরে দাঁড়াল। ওকে সঙ্গে করে সিংহ দরবারের অলিন্দপথে এসে দাঁড়ালাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ভদ্রলোক বৃটীশ আমলে গুর্খা রেজিমেণ্টের ব্যাণ্ডমাষ্টার হয়ে, অনেক দিন আলিপুরে ছিলেন। হয় ত তাই বাঙ্গালী দেখে এই প্রীতি।

সিংহ দরবার!

চমকেই উঠলাম। হ্যাঁ—সিংহদেরই দরবার। এ যেন ময় দানবের তৈরী ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী, পাণ্ডবদের সভাগৃহ। বিরাট এ প্রাসাদ, বিচিত্র এর কারুকলা। প্রায় ১৮০০ শত প্রকোষ্ঠ রয়েছে এই প্রাসাদপুরীতে। সারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে এর সমতুল্য দ্বিতীয় আর কোন হর্ম্ম্য নেই।

মানসপটে ভেসে উঠল নেপালের অতীত শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা, বিশেষ করে রাণাদের সিংহ পরাক্রমের কথা।

এক কালে এ প্রাসাদপুরী রাণা মন্ত্রীদের আবাস স্থল ছিল। রাণাশাহীর বিলুপ্তি ঘটেছে। আজ আর রাণারা এখানে বসবাস করেননা।

আচ্ছন্নের মত ধীর পদক্ষেপে অলিন্দপথে ঘুরে চলেছে মানব। হাসিখুসীতে উচ্ছল তরুণ, হয়ে উঠেছে বিষাদ-গম্ভীর, মুখমণ্ডলে পড়েছে বেদনার ছাপ।

মানব ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ! খিন্ন ব্যথা করুণ দৃষ্টি তুলে উদাসের মত চেয়ে আছে জ্বলন্ত আকাশের প্রান্তে।

কেন এ ভাবান্তর! কে বলবে তবে বিরাট ইতিহাসে ভরা এ পাষাণপুরীর মর্ম্মকথা! কে খুলবে ওর মন-অর্গল?

আকুল আবেদনে মানবকে মুখর করে তোলার চেষ্টা করলাম।

বৃথাই হল, মানব সাড়া দিল না।

স্বপ্নাচ্ছন্ন। একটা ছায়ামূর্ত্তির মত, এগিয়ে চলেছে মানব।

ওর সূক্ষ্ম অনুভূতির অস্ত্রে আঘাত দিবার চেষ্টা করলাম। ওকে চমকে দেবার জন্য তাই বলি আবার—রাণাদের কতবড় মহৎ কীর্ত্তি এই প্রাসাদ!

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল হয় ত! স্বপ্নোত্থিতের মত করুণ বিলাপে ভেঙ্গে পড়ল মানব। না, না, কীর্ত্তি নয়! রাণাদের অপকীর্ত্তির এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর এই প্রাসাদ।

মোহাবিষ্টের মত—ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে মানব।

কেন, কেন এ বৈর ভাব? মানবের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে ধরলাম।

যেই কে সেই, কোন উত্তর করল না মানব। আচ্ছন্নের কালিমা ওকে ঘিরে ধরেছে। বিজাতীয় জুগুপ্সার উর্ণনাভ জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে মানব। উদভ্রান্ত—বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে মানব।

ওকে সচেতন করে দেবাব জন্য এবার জোরে ঠেলে দিলাম।

"কেন এ আত্মহারার মত ব্যবহার! কতক্ষণ আর অপেক্ষা করে থাকব বলতে পার?"

না, না অযথাই আপনাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলাম। আমি বলছি, শুনুন তবে—এ প্রাসাদ নেপালের দলিত মথিত আত্মার করুণ ক্রন্দন। নির্ম্মম ব্যথাভরা নগ্ন সত্য এর কাহিনী। রোমাঞ্চকর বিস্ময়ভরা—ইতিহাসে এমনি কোন দ্বিতীয় কাহিনী তুর্লভ।

বিরাট এ প্রাসাদের মর্ম্মকথা এক লহমায় বলা যায় না, বোঝা যায়না এত অল্প সময়ে। এর দেওয়ালে, এর প্রতিটি ইটে যে অদৃশ্য-লিপি উৎকীর্ণ হয়ে আছে তা উদ্ধার করা সহজ না হলেও চেষ্টা করব।

এ প্রাসাদের ইতিকথা বলার আগে নেপালের অধিবাসিদের সম্বন্ধে তু'চারটা কথা না বললে অনেক কিছুই না বলা হয়ে থাকবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে প্রাসাদের ইতিকথা।

গৌতম বুদ্ধের দেশ—এর আকাশে বাতাসে ছড়ান রয়েছে

স্বাত্ত্বিকতার বীজমন্ত্র। অহিংসা নেপালবাসিদের মূলমন্ত্র। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, শাসকগোষ্ঠি চিরকালই এদের হেয় জ্ঞান করে এসেছেন।

এদের মনের খবর রাখে কজনা ? আচারে, ব্যবহারে, স্বভাবে এরা সম্পূর্ণ শান্তিপ্রিয়। এদের মত শান্তিপ্রিয় জাত আর কোথাও আছে কিনা জানি না। অথচ আশ্চর্য্যে কথা, সারা পৃথিবী এদের যুদ্ধাপ্রয় জাত বলেই জানে।

এরা—শুধু এরা কেন, প্রায় সব পাহাড়িয়া জাতই স্বভাবে কিছুটা বন্য। আদিমতার আভাস পাওয়া যায় এদের ব্যবহারে।

"এটা ত অতি সহজ সত্য। প্রকৃতির পরিবেশে এই ত স্বাভাবিক পরিণতি।"

মানবের কথায় সায় দিলাম।

মন্তব্যটুকু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানব পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে এল। বলতে লাগল—এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, নেপালের অন্তঃস্থলে ঘুরে আসুন, কোথাও এর বিপরীত কিছু দেখতে পাবেন না।

আপাততঃ এদের কথা স্থগিত রেখে প্রাসাদের কথাই বলছি। অনেক আগে অনেক দূরে যাবনা। মধ্যযুগ থেকেই সুরু করছি।

নেপালের মধ্যযুগ—সূর্য্য বংশীয় রাজপুত মল্ল রাজারা তখন নেপালের শাসক। মল্লরাজত্বের যুগ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।

মধ্যযুগের শেষভাগ—সেটা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ। সুকবি, বিদ্বান, জ্ঞানী, বিদগ্ধ, বহুভাষায় পণ্ডিত—নেপালাধীশ তখন প্রতাপ মল্ল। এরই লিখিত কালিকা স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন ১৫টি ভাষায় হনুমানঢোকার শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

মল্ল রাজত্ব তখন গরিমার সর্ব্বোচ্চ শিখরে। সেটা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ রাজা তখন জয়প্রকাশ মল্ল।

"অভ্যুত্থায় হি পতনম্"

মহাজন বাক্য সত্য বলে প্রমাণিত হল।

মল্লরাজত্বের দুর্য্যোগের দিন—পতনের সময় আসন্ন হ'ল। রাজা জয়প্রকাশই মল্লরাজত্বের শেষ যবনিকা টেনে দিলেন।

কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, কি যেন ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছে। স্থানুবৎ নিশ্চল, নিঃশব্দ—প্রায় সম্বিৎহীন হয়ে পড়েছে মানব। ইতিহাসের ব্যথাভরা করুণ কাহিনী ওকে আরও করুণ করে তুলেছে।

আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসল—মল্লরাজত্ব কেন ধ্বংস হল বলতে পারেন কি ?

ওর চোখের তারা দুটো শাণিত ছুরির ফলার মত জ্বলে উঠল। চমকে উঠলাম ওর কণ্ঠস্বরে।

ইতস্ততঃ করতে দেখে জবাবটা ও নিজেই দিল।

হ্যাঁ—"দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রম্।"

এই হল মল্লরাজত্বের পতনের কারণ। প্রবাদ বাক্যটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

ভাগ্যাবিড়ম্বিত জয়প্রকাশ! দুর্ভাগা জয়প্রকাশ! সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই অশেষ বিপদজালে জড়িত হয়ে পড়লেন। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আর অমাত্যদের শঠতা—কুচক্রীদের চক্রান্ত ওকে ঘিরে ধরল.

হয়ত এও সহ্য হত, কিন্তু নির্ম্মম মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলেন আপন সহধর্ম্মিনীর কাছ থেকে। ওকে গদিচ্যুত করার জন্য ওর সহধর্ম্মিণীও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, গৃহবিবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব শঠতা আর প্রবঞ্চনায় নির্বীর্য্য হয়ে পড়লেন জয়প্রকাশ। রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ ২৫ বছর কেটে গেল। স্থির হয়ে বসার আগেই গোর্খারাজ পৃথিনারায়ণ কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করলেন। সেটা হল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

অমিত বিক্রম গোর্খারাজ পৃথ্বিনারায়ণ ! অপচয় করলেন না—মল্লরাজের দুর্ব্বলতার সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলেন। পাটান, ভকতপুর আর কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে রচনা করলেন অবরোধ।

ভারতের শ্বেতকায় শক্তির কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন জয়প্রকাশ। নিষ্ফল, ব্যর্থ হল সব। ইংরেজ শক্তি পৃথ্বিনারায়ণের কাছে পরাজিত হল। দীর্ঘ ১১ বৎসর অবরোধের পর পরাজিত হলেন জয়প্রকাশ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল গরিমাময় মল্লরাজত্ব।

এতদিনের সাহচর্য্য ! বিচ্ছেদকাতরা শোকাতুরা হল কি বাগমতী ! থরথর স্পান্দত হল কি বাগমতীর নীরধারা !

সূচনা হল নূতন এক ইতিহাস। অঙ্কুরোদগম হল গোর্খা রাজত্বের। সেটা হল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ।

গোর্খা রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বিনারায়ণ। বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী নায়ক ! অনেক রাজনীতিবিদেরা ওকে নেপালের বিসমার্ক আখ্যায় ভূষিত করে থাকেন। এই পৃথ্বিনারায়ণ—ছিন্ন ভিন্ন, টুকরো টুকরো খণ্ড বিখণ্ড নেপালকে একতার গ্রন্থিতে গাঁথলেন। শ্বেতকায় ইংরেজদের বিশ্বাস করেন নি। ভারতের সঙ্গে যোগসূত্রের পথঘাটগুলো তাই সুরক্ষিত করলেন। শ্বেতকায়দের নেপালে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন।

"দিন যায় ক্ষণ যায়। অতীতের স্মৃতি মুছে ফেলে কালের রথচক্র এগিয়ে চলে।

নির্ব্বিকার, নিথর, নিস্পন্দ ! নেই কোন ব্যঞ্জনা, অচঞ্চল বয়ে চলে বাগমতী।

এ রাজত্বও বুঝি আর টেঁকে না।

রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম তখন রাজগদীতে সমাসীন। রাজার দুই

রাণী। প্রধানা রাণী এলেন পাণ্ডে বংশ থেকে, দ্বিতীয়া থাপা বংশ থেকে।

অহি-নকুলের সম্বন্ধ ছিল এই পাণ্ডে আর থাপাদের মধ্যে। দুই রাণীর মধ্যেও তাই। অহর্নিশি লেগে রইল দ্বন্দ্ব আর কলহ।

প্রথমার সন্তান সুরেন্দ্র বিক্রম। দ্বিতীয়ার রণেন্দ্র বিক্রম।

সুরেন্দ্র বিক্রম ভাবী যুবরাজ তাই দ্বিতীয়া রাণীর মনে শান্তি নেই।

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"।

ভাগ্য আর কাকে বলে! হঠাৎই মারা গেলেন প্রথমা মহিষী। দ্বিতীয়ার এবার সুবর্ণ সুযোগ। ওর প্রাধান্যে হস্তক্ষেপ করার আর কেউ রইল না।

একদিকে ন্যায্য উত্তরাধিকার, অন্য দিকে লালসা আর চক্রান্তের দ্বন্দ্ব।

ধ্বংসের দানব রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল।

অপদার্থ রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম! দ্বিতীয়া রাণীর খেলার পুতুল হয়ে রইলেন। উচ্চবাচ্যের কোন ক্ষমতা রইল না।

রাজ-অমাত্য গগন সিংএর সঙ্গে রাণী মেতে উঠলেন গোপন ষড়যন্ত্রে। অবাধে চলল গোপন চাতুরী। নিজ পুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসাবার জন্য কূট চক্রান্ত চলতে লাগল।

মাতবীর সিং তখন প্রধান মন্ত্রী।

মাতবীর ভাগিনেয় জঙ্গ বাহাদুর সবেমাত্র সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন। ২২ বৎসরের নবীন যুবক, বিরাট সম্ভাবনায় ভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করতে হবে—রাণী মাতবীরকে প্ররোচিত করলেন।

জঘন্য এ প্রস্তাবে মাতবীর রাজী হলেন না।

দুর্ভাগা মাতবীর! জানেন না যে রাণীকে অসন্তুষ্ট করা আর বিষধর ফণিনীর সঙ্গে খেলা করা একই কথা।

রাণী ক্রুদ্ধা সর্পিণীর ক্রুর হিংসায় জ্বলতে লাগলেন।

পথের কাঁটা মাতবীর। নিজ পুত্রের উন্নতির অন্তরায় সুরেন্দ্র বিক্রম।

শান্তি নাই! যতদিন এরা দুজন জীবিত থাকবে, ততদিন শান্তি নাই!

অশান্ত, ক্ষুব্ধ রাণী! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করলেন মাতবীর ভাগিনেয় জঙ্গ-বাহাদুরকে।

রাণী জঙ্গ বাহাদুরকে ডাকলেন।

একহাতে তুলে দিলেন বিষপাত্র, অন্য হাতে দিলেন একটা রাইফেল। মাতবীরকে হত্যা, নয় বিষপানে মৃত্যুবরণ—দুটো প্রস্তাবের যে কোন একটা বেছে নিতে হবে।

রাণী প্রলুব্ধ করলেন জঙ্গ বাহাদুরকে। প্রতিশ্রুতি দিলেন—মাতবীরের হত্যার বিনিময়ে মিলবে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ। কিছুতেই ব্যর্থ হবেনা এ প্রতিশ্রুতি।

কঠিন সমস্যা!

দুরূহ সমস্যায় হাবুডুবু খেতে লাগলেন জঙ্গ বাহাদুর।

একদিকে পিতৃতুল্য মাতুলের নিধন, অন্যদিকে বিরাট ভবিষ্যৎ। সপ্নময় সম্ভাবনা পূর্ণ ভবিষ্যতের ছবি।

স্বপ্ন দেখছেন জঙ্গ বাহাদুর!

রচনা করে চলেছেন সুদূরপ্রসারী আকাঙ্খা-সৌধ। শুধু কি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে!

না, না—হতে হবে নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা। চাই সার্ব্বভৌমত্ব।

লালসা কবলিত হলেন জঙ্গ বাহাদুর।

রাজ্যের আশা, খ্যাতির আশা, প্রতিপত্তির আশা!

বিকারে আচ্ছন্ন হলেন জঙ্গ বাহাদুর। সুযোগ বারবার আসে না। এ প্রস্তাব অবহেলা করলে আক্ষেপ আর আফসোসের পরিসীমা থাকবেনা।
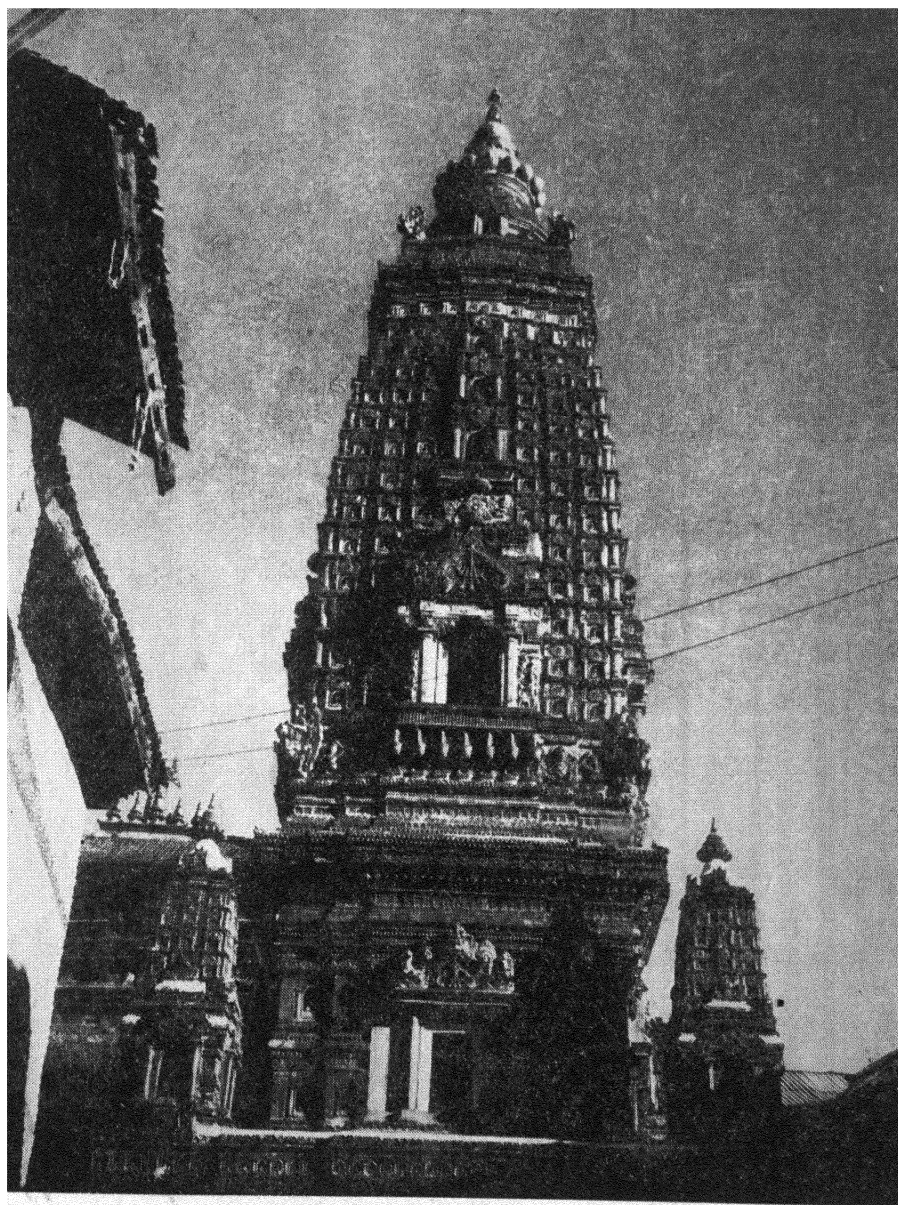
মহাবোধ (পাটান)

জন্ম থেকে মহানির্ব্বাণ—নানা ভঙ্গির বুদ্ধমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ এর বহিরঙ্গ
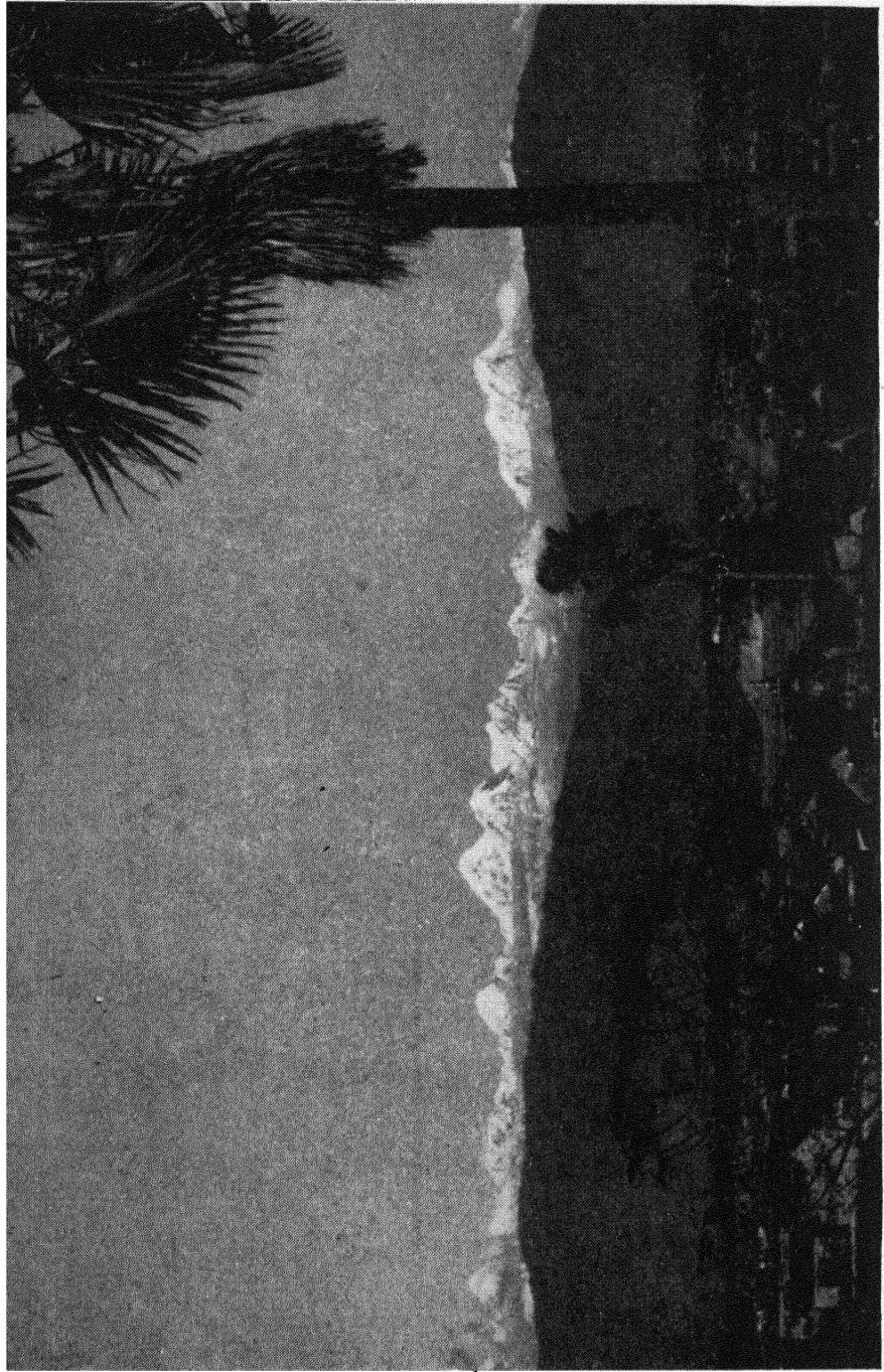
ভকতপুর থেকে নগরকোট যাবার পথে—তৃণশ্যাম গিরিশৃঙ্গের উপর তুষারশুভ্র জটাজাল

জঙ্গ বাহাদুর—নেপালের ম্যাকবেথ। অবশেষে ছলনাময়ী লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

মৃত্যু নয়, চাই অমৃত—নেচে উঠল ধমনী প্রবাহ। চাই ক্ষমতা, চাই একনায়কত্ব।

রাণীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন জঙ্গ বাহাদুর।

রাণী ছল করে মাতবীর সিংকে ডেকে পাঠালেন। হঠাৎ গর্জ্জে উঠল রাইফেল। হতভাগ্য মাতবীরের দেহ লুটিয়ে পড়ল প্রাসাদ সোপানাবলীর ওপর।

মৎস্যন্যায়ের চূড়ান্ত!

মাৎসর্য্য আর হিংসার বিষ বাষ্পে আচ্ছন্ন হল কাঠমাণ্ডুর আকাশ। এক সন্ধ্যায় রাণীর প্রিয়পাত্র গগন সিংকে কে যেন হত্যা করল।

ক্ষিপ্ত, উন্মাদপ্রায়—প্রমত্তা রাণী ছুটে এলেন কোত দরবারের আঙ্গিনায়। ঘোষণা করলেন—চাই রক্তের বদলে রক্ত, হত্যার বদলে হত্যা, প্রাণের বদলে প্রাণ। রাণী গণ্যমান্যদের ডাকলেন।

একান্ত অনুগতের মত এলেন জঙ্গ বাহাদুর। চতুর, ধূর্ত্ত জঙ্গ বাহাদুর! গগন সিংয়ের হত্যার দায় চাপিয়ে দিলেন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল অভিমান সিংয়ের ওপর। তরবারির ক্ষিপ্র আঘাতে উড়িয়ে দিলেন অভিমানের শির।

ভীত, সন্ত্রস্ত সব গণ্যমান্যরা।

নীতি বিবর্জ্জিত মানুষ আর পশুতে প্রভেদ কতটুকু! খুনের নেশা চেপে ধরল জঙ্গ বাহাদুরকে। পশুবৎ আচরণে মত্ত হলেন জঙ্গ বাহাদুর।

বীভৎস অরাজকতা!

পলায়নপর, মৃত্যু-ভীত, মানুষের আর্ত্তনাদে কেঁপে কেঁপে উঠল রাত্রির আকাশ।

অসিবলের কাছে পরাজিত হল ন্যায়নিষ্ঠা। আধিপত্য বিস্তার করল ধ্বংসের দানব।

চারদিকে বিভীষিকা।

ন্যায়নিষ্ঠা, বিচার বিবেচনা, নীতির অনুশাসন কোথায় উধাও হয়ে গেল। চলল অবাধ হত্যালীলা। কোত দরবারের আঙ্গিনা ভেসে গেল রুধির স্রোতে। রাজা পালিয়ে গেলেন প্রাসাদ থেকে। সারা রাত কাটালেন পথে পথে।

চঞ্চল হল কি বাগমতীর স্রোতধারা! না—বিকার বিহীন! অচঞ্চল বয়ে চলে রক্ত লোলুপা বাগমতী।

স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

হতভাগ্য রাণী! অপরিণামদর্শী রাণী! কতবড় সর্ব্বনাশটা করলেন জঙ্গ বাহাদুরকে ডেকে!

খাল কেটে কুমীর নিয়ে এলেন।

হল ভরাডুবি।

শুধু নিজের কপালটাই পোড়ালেন না। নিজে পুড়ে ছারখার ত হলেনই, পোড়ালেন দেশকে, দশকে, শান্ত, নিরীহ, বোবা প্রজাগুলোকে।

কবরের নীচে পাঠিয়ে দিলেন পৃথ্বিনারায়ণের কষ্টলব্ধ গোর্খা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকে। অনায়াসে তুলে দিলেন অজ্ঞাতকুলশীল এক উদ্ধত যুবকের হাতে।

হয়ত এই ছিল বিধিলিপি!

সব শেষ হয়ে গেল।

হত্যা পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গ বাহাদুরের নারকীয় উল্লাসধ্বনিও থেমে গেছে। কোতদরবারের আশেপাশে তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

প্রত্যূষের নবারুণ রাগে রক্তিম হল কাঠমাণ্ডুর আকাশ। রক্তিম রুধির স্রোতে ভাসছে কোত দরবারের আঙ্গিনা। আকাশে রক্ত, মাটিতে রক্ত। চারদিকে রক্ত গঙ্গা। কালো চাপ বাঁধা রক্তের স্তূপ।

ভয়ে ভয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন রাজা।

বাগমতীর সৈকতে পত্তন হবে আর এক নূতন ইতিহাস।

যন্ত্রণা অধীর! প্রসবব্যথা কাতরা বাগমতী।

ভীত শঙ্কিত রাজা, চকিত সন্ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন জঙ্গ বাহাদুরকে—এতগুলো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, রক্তপাত, জীবন নাশ! কি লাভ হল?

উপায় ছিল না!

রাণীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্যই, এই জঘন্য, নারকীয় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে হল। মহারাজ ক্ষমা করুন!

নাটকীয় সংঘাতের মাঝেই অভিনীত হয়ে গেল শেষ অঙ্কটী।

বিনয়, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা! অনুশোচনায় কতই যেন অনুতপ্ত!

অভিনয়, হ্যাঁ অভিনয়ের চরম, নিখুঁত অভিনয় করলেন জঙ্গ বাহাদুর।

মহারাজ! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন। এই রইল আমার তরবারি, রইল উষ্ণীষ।

রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন জঙ্গ বাহাদুর।

ভীত অভিভূত রাজা, তুলে ধরলেন রাজমুকুট। আচ্ছন্ন, মন্ত্রমুগ্ধের মত পরিয়ে দিলেন জঙ্গ বাহাদুরের শিরে। প্রচার করে দিলেন আজ থেকে জঙ্গ বাহাদুরই শাসন করবে নেপাল রাজ্য। ওঃ উত্তরপুরুষও এ সম্মানের অধিকারী হবে।

কুঠারাঘাত! নিজের পায়ে নিজেই কুঠার হানলেন রাজা।

ভাগ্য, ভাগ্য, সবই ভাগ্য।

ভাগ্য আর কাকে বলে! সাধারণ এক সৈনিক হলেন নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

প্রসব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হল বাগমতী। রাণাশাহীর জন্ম হল। আর এক নূতন পর্ব্বের সূত্রপাত হল। ইতিহাসের পাতায় আঁচর

পড়ল—সৃষ্টি হল নূতন এক অধ্যায়। রাজা ক্রীড়নক মাত্র হয়ে রইলেন রাণাদের হাতে।

রাণাশাহীর অন্তরালে হারিয়ে গেলেন রাজা।

হায়রে কপাল! হায়রে পৃথ্বিনারায়ণের অধঃপতিত উত্তরপুরুষ, হায়রে অভিশপ্ত রাজবংশ! এই কি তার শেষ পরিণতি!

কাঁদল কি কেউ? কাঁদল কি বাগমতী!

বাগমতীর সৈকতে কিছুকালের মত হারিয়ে গেল রাজবংশের ইতিহাস। সেটা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

পুরুষস্য ভাগ্যম্!

উদ্যোগী পুরুষসিংহ! ইস্পাতের মত কঠিন—জঙ্গ বাহাদুর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি। ওর তখন একাদশে বৃহস্পতি।

বোলবোলা—ফেঁপে ফুলে উঠল রাণাশাহী।

নূতন সুযোগ এল আবার—সেটা ১৮৫৭ সাল। ভারতের মাটিতে তখন জ্বলে উঠেছে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। বৃটিশের সঙ্গে হাত মেলালেন জঙ্গ বাহাদুর। বিদ্রোহ দমনে সফল হল ইংরেজ। ইংরেজ ওর বন্ধু হল।

জঙ্গ বাহাদুরকে তখন পায় কে? রাজ্যলক্ষ্মী বন্দী হল ওর সুদৃঢ় নিগড়ে। রাণারা পূরো ১০০ বছর ধরে শাসন করলেন নেপাল।

উত্তেজিত ভাবে একটানা এতগুলো কথা বলে, বিষাদক্লিষ্ট মন্থর পদক্ষেপে মানব বেরিয়ে এল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবশ—আত্মহারার মত তাকিয়ে রইল প্রাসাদশীর্ষের দিকে।

সূর্য্য উঠে এসেছে মাথার ওপর। পেটেও জ্বালা ধরেছে। মানবকে সচেতন করে দিলাম। নড়েচড়ে উঠল মানব।

"হ্যাঁ—চলুন ফিরে যাই।"—মানব এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারেনি যেন।

চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গেই রিক্সা এগিয়ে চলল রাণীপুকুরীর দিকে।

বেলা ১॥০ টায় পাটান যাবার বাস ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করবে বলে মানব বিদায় নিল। আমিও চলে এলাম হোটেলে।

হিল ভ্যু হোটেলের নিরামিশ আহারে অরুচি ধরে গেছে, তাই আমিশ খানার ব্যবস্থা হয়েছে "সুইট নেপাল" রেস্তোঁরাতে। চেয়ার টেবিল দখল করে বসেছে সবাই।

অমিত আগেভাগেই সবাইকে সাবধান করে দিল—"কিছু ফিরিয়ে দেবে না কিন্তু। বেশী হয়েছে মনে হলে চালান করে দেবে এদিকে। ম্যাজিকের মত হাওয়া হয়ে যাবে সব।"

হো — হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। কিছুমাত্র অপ্রস্তুত বোধ করল না, অমিত ও হেসে উঠল। নির্ব্বিকার চিত্তে অনেকেরই উদ্বৃত্ত খাবারগুলো টেনে নিল।

গোগ্রাসে কিছুটা গিলে, স্বার্থপরের মত টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম।

তোমরা পরে এস, আমরা চললাম। উত্তরের অপেক্ষা না করে নীরুকে তুলে নিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাবার পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম, মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে গেলাম।

উদ্‌গ্রীব মানব, আমাদের জন্য অস্থির পাদচারণে অপেক্ষা করছিল। পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাস ছেড়ে গেল। কাঠমাণ্ডু থেকে পাটানের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। কি হবে তাড়াহুড়ো করে? তাই পরের বাসটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

· বিস্মিত হলাম স্থানীয় যাত্রীদের শৃঙ্খলা বোধ দেখে। লাইন করে ধীর স্থির ভাবে অপেক্ষা করছে বাসের জন্য। ব্যস্ত চঞ্চলতা থাকলেও অন্যায় ভাবে একজনকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যায়না পেছনের যাত্রী। সম্ভ্রম জাগে সরল নিরীহ যাত্রীদের নিয়মতান্ত্রিকতা বোধ আর শালীনতা জ্ঞান দেখে।

আবার একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। হৈ-হল্লা না করে, পর পর যাত্রীরা উঠে এল। বাসের ভেতরেও কোন গুঞ্জন বা অস্থিরতা নেই।

সুন্দর সমতল পিচ্ ঢালা পথ ধরে এগিয়ে চলল বাস। বাগমতী সেতুর পরই পাটান সহরের এলাকা। সহরের উপকণ্ঠে ইট, কাঠ আর পাথরের তৈরী ছোট ছোট ঘর বাড়ী।

উন্মুক্ত উদার উত্তর দিগন্তে তাকালেই চোখে পড়ে প্রকৃতির বন্য সৌকুমার্য্য। ঘন নীল সবুজ গিরিতরঙ্গের শীর্ষে ধ্যানমৌনী শঙ্করের শুভ্র জটাজাল—অচল, অটল, অনড়। বিরাট এককত্ব আর সংহতির ইঙ্গিত, দৈববিস্ময়, বিশ্বরচয়িত্রীর রূপত্যুতির অনিন্দ্য ব্যঞ্জনা।

পাটানের টারমিনাসে এসে বাস থেমে গেল। নেমে দাঁড়ালাম পথে। চোখ মেলে দেখলাম পাটানকে। কৃত্রিমতার কোন জৌলুস নেই। বাড়ী, ঘর দোর, রাস্তা, ঘাট, সব কিছু অঙ্গে ধরে রেখেছে পুরাতনের ছাপ। কাঠের জানালার জালির কাজ, ইট পাথর সব পুরাণো কালের। কত শত বৎসর আগেকার ঘর বাড়ী, ধোঁয়া আর কালিতে মলিন। অধিবাসিদের পর্য্যন্ত আধুনিক হবার সুযোগ ঘটে ওঠে নি। চাকচিক্য নেই কোথাও। সম্পূর্ণ পরিবেশটাই সহজ সরল—হয়ত দারিদ্র্যই এর নিহিত কারণ।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণ মন্দির আর রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছি।

নীরু আকস্মিক ভাবেই মানবকে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা, বল ত পাটানকে অনেকে দেবপত্তন আবার অনেকে ললিতপুরই বা বলে কেন ?

মানবকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে, নিজের প্রশ্নের উত্তর নীরু নিজেই দিল। যতদূর জানা যায় সম্রাট অশোক নেপালে এসেছিলেন—অবশ্য রাজ্যলিপ্সু হয়ে নয়। এসেছিলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্র প্রচার মানসে। কন্যা চারুমতীকে এখানকারই এক ক্ষত্রিয়কুমার দেবপালের হাতে তুলে দেন, তাই দেবপালের নামে এ

জায়গার নাম হয়েছিল দেবপত্তন। এই সহরেই নেপাল সভ্যতার প্রথম বিকাশ, আর একে কেন্দ্র করেই নেপালের ললিত কারুকলার জন্ম হয়েছিল বলে এর আর এক নাম ললিতপুর। মহামতি অশোকের অনেক কীর্ত্তি, ভগ্নস্তূপ আর মন্দিরও আছে এখানে।

মানবের দিকে চেয়ে নীরু একটু হেসে বলল—কেমন ঠিক বলেছি ত?

কাঁধটা হেলিয়ে মানব সম্মতি জানাল।

কথায় পেয়ে বসেছে নীরুকে, নীরু বাক্মুখর হয়ে উঠেছে। আবার ও মানবকে প্রশ্ন করল—অনেকদিন ধরে আছ ত এই কাঠমাণ্ডুতে, নেপালের ওপর লেখা কোন নেপালী ইতিহাসবিদের, ভাল বই আছে কি?

দীনভাবে মানব উত্তর করল—মল্লরাজাদের আমলে, সভ্যতা আর সংস্কৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল নেপাল। গোর্খারা, জয় করে নিল এ রাজ্য। তারপর সংস্কৃতি, সভ্যতা কিছু বা বজায় রইল কিন্তু রাণাশাহীর অব্যবস্থায় শিক্ষা দীক্ষা একেবারে নির্ব্বাসিত হল। নেপালী ভাষায় তেমন কোন বই আছে বলে জানা নেই, আর থাকলেও কোন উচ্চ শ্রেণীর তথ্য তাতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

আশ্চর্য্যের কথা, এই উৎপীড়ক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও বীর শামসের আর চন্দ্র শামসের—এ দুজনের নাম স্মরণ না করে পারা যায় না। বীর সামশের কাঠমাণ্ডুতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। চন্দ্র সামশের সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন আর মুক্ত করে দিয়েছিলেন নেপালের সমস্ত ক্রীতদাসদের। শিক্ষা প্রসারের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। রাণা আর রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাঙ্গণ, উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন সর্ব্বসাধারণের কাছে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেপাল রেলওয়েজ আর রোপওয়েজ। এমনি করে বহির্জগতের সঙ্গে নেপালের যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন চন্দ্র শামসের।

একার প্রচেষ্টায় এগোলেন অনেক, তাহলেও পরবর্ত্তী রাণাদের দৃষ্টির অভাবে, যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল নেপাল। শিক্ষা

দীক্ষার প্রসার আর হল না। রাণাদের শাসন ব্যবস্থায় প্রজারা পঙ্গু হয়েই থেকে গেল।

জনসাধারণ জানবার সুযোগ পেলনা নিজেকে। পৃথিবীটা কত বড় জানতে পারলনা, চিনতে পারলনা নিজের দেশকে। বিড়াল কুকুর যেমন বেঁচে থাকে এরা শুধু তেমনি বেঁচেই রইল। মহামারী, রোগ আর শোক তাপে ভুগে, জরা কবলিত হয়ে শুধু অদৃষ্টেরই দোহাই দিল এরা। না মানুষের উপর, না ভগবানের কাছে—কোথাও এদের কোন অভিযোগ ছিল না।

জায়গা নেই, জমি নেই, নিরন্ন এরা—দিনমজুরী খেটে নয়ত বনের কাঠপালা কেটে রোজগার করত কিছু কিছু। অনশনে অর্দ্ধাশনে ঝিমিয়ে কেটে যেত এদের দিন। জীবন ধারণের জন্য ছিল না খাদ্য, রোগের জন্য ছিল না পথ্য, পরনে ছিলনা বসন। বলিষ্ঠ দেহের অধি-কারী হয়েও এরা ছিল আর্ত্ত। বেঁচে আছে তাই হয়ত বিশ্বাস করত না। ওদের ধমনীতে রক্ত চলাচল করত কিনা, শ্বাস প্রশ্বাস বইতো কিনা কে জানে? এরা মুখটি বুজে পড়েছিল পথের ধূলি ধূসরিত দেহে। এদের জন্য কেউ কখনও ভাবেনি।

সংখ্যানুপাতে নেপালীরা শতকরা পাঁচ থেকে ছয় জন পুরুষ শিক্ষিত। নারী শিক্ষার দাবী ওরা করতে পারে না। তবে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না, জনজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে।

রাজা মহেন্দ্রবিক্রম উদ্যোগী পুরুষ, প্রশস্ত ওর দৃষ্টিভঙ্গী।
"থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে ব'লে"—এই আদর্শকে
অনুসরণ করে দ্রুত এগিয়ে চলবে নেপাল ভাবীকালের পথ ধরে।

নীরু অত্যন্ত উৎসুক ভাবে আবারও প্রশ্ন করল মানবকে—নেপালের যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে পুরাণো ইতিহাস। এত তথ্য, এত সম্পদ, কত প্রাচীন ধর্ম্মমত, কত পুরাণো এর সভ্যতা! তুমি ত ইতিহাসের ছাত্র, একে ভিত্তি করে কিছু একটু লেখ।

মৃদু হেসে উত্তর করল মানব—দেখা যাক ভবিষ্যৎ কোন পথে চলে, আপনার আশাকে রূপ দেবার ইচ্ছা রইল। অমনি যোগ করল, বিদেশী পর্য্যটকদের লেখা অনেক বই আছে কিন্তু। চলুন বাসায় ফিরে, দেখাব আপনাকে "ল্যাণ্ডরের" লেখা বইটা। চিত্রে আর বর্ণনায় নেপাল আর তিব্বত মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যেন! সুন্দর ছবি আর দৃশ্যতে বোঝাই বইটা।

পথ চলতে চলতে এমনি করে আমরা চারদিক প্যাগোডা শীর্ষে ঘেরা দরবার স্কোয়ারে এসে গেলাম। বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত এ রাজপ্রাসাদ।

দরবার স্কোয়ার ছেড়ে এবার কৃষ্ণ মন্দিরে এসেছি। অমিতও সদলবলে এসে গেছে। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।

দেখছি, দরবার স্কোয়ারে ঢুকছে ওরা।

এই কৃষ্ণ মন্দির নেপালের চিরাচরিত স্থাপত্য ধারা থেকে স্বতন্ত্র। প্যাগোডা ষ্টাইলে নয়, সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে গড়া এই মন্দির. দ্বারকার কৃষ্ণ মন্দিরের অনুরূপ। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা সিদ্ধিনরসিংহ মল্ল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দিরটি। ভাস্কর্য্যে আর শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ এই কৃষ্ণ মন্দির—স্তম্ভ আর প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ হয়ে আছে মহাভারতের নানা আলেখ্য।

নীরু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সব খুঁটিনাটি ওর চোখেই বেশী করে ধরা পড়ছে। পার্থসারথির অংশটুকু দেখে হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠল নীরু।

কৃষ্ণ মন্দির থেকে বেরিয়ে বসলাম এসে একটা চায়ের দোকানে। দোকানের স্বত্বাধিকারিণীর চেহারাটা বেশ মিষ্টি।

গল্প সল্প করতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে নিম্‌কির টুকরো ভেঙ্গে ভেঙ্গে একটু একটু চা গলায় ঢেলে দিচ্ছিলাম। বলতেই হবে চায়ের গুণ আছে, কোথায় দূর হয়ে গেল সব ক্লান্তি আর অবসাদ।

অমিত ওর দল নিয়ে কোথায় রয়েছে জানা গেল না। কালক্ষেপ না করে এগিয়ে চললাম মহাবোধের খোঁজে। এদিক ওদিক ঘুরে একটা গলি পথ ধরে মন্দিরে এসে হাজির হলাম। অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েগেলাম।

"Full many a flower is born to blush unseen
And wastes its sweetness in the desert air"

কবির কথাটুকু যে খাঁটি সত্য মহাবোধে এসে তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। একটা ঘিঞ্জি বস্তীর আড়ালে, গলিপথের অন্তে কে জানে এত বড় একটা রত্ন লুকিয়ে আছে !

খুব হাসি খুসি, চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ছে। নীরু বলল—তোমরা হবে পড়ুয়া আর আমি হব মাষ্টার মশাই। আমি বলব আর তোমরা শুনে যাবে সুবোধ ছেলেটির মত।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে মহাবোধের রাজা পণ্ডিত অভয়ার, তীর্থ পরিক্রমায় গিয়ে ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ আর বিহারগুলো দেখে এলেন। মনের পটে গেঁথে রাখলেন বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি, অভিলাষ পূর্ণ করলেন ওরই অনুকরণে এই মন্দিরটি তৈরী করে। ঐ দেখ মন্দিরের বহিঃ অঙ্গে চারদিক ঘিরে ছোট ছোট অসংখ্য খুপরি, সংখ্যায় ছ'হাজার তিনশ-পঞ্চাশটা।

বাধা দিয়ে বললাম—এক এক করে গুণলে কখন ?

প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নীরু বলল—না গুণেও বলা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন করে ?

নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করল নীরু—জ্যোতিষী জানি কি না !

অমনি আবার মুরুব্বিয়ানার চালে বলল—যাক্‌গে,....চুপ করে শোন, কথার মাঝে ফোড়ন কেটনা বলছি।

জন্ম থেকে মহানির্ব্বাণের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের নানা ভঙ্গীর বুদ্ধ মূর্ত্তি রয়েছে ঐ কুলুঙ্গিগুলোতে। যাচাই করে দেখ, বলে, চুপ হয়ে গেল নীরু।

মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে বুদ্ধ মাতা মায়াদেবীর পাষাণ মূর্ত্তি। বৌদ্ধদের কাছে এ মন্দির অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু। দূর দূরান্তর থেকে যাত্রীরা আসে এই মন্দির দেখতে। মন্দিরটি স্তরে স্তরে তিনটি ভাগে সাজান রয়েছে। বাইরে থেকে বোঝবার উপায়টি নেই। অতি কষ্টে আমরা উঠে এলাম সর্বোচ্চ স্তরে। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম উত্তর দিগন্তে চেয়ে।

বেলা শেষ প্রহর হলেও রবিরশ্মির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়নি একটুও। শুভ্র তুষারের উপর দীপ্ত হয়ে উঠেছে কনক কিরণ, চলেছে খেলা মেঘে আর কিরণে। ধ্যানমগ্না গরিয়সীর মত চেয়ে আছে নীরু নির্ণিমেষে ঐ দিকে, চলেছে সংলাপ অন্তরের অন্তরতম পুলক আর হর্ষ বিনিময়ে। মাঝে মাঝে এমনি একাত্ম হয়ে মিশে যায় নীরু প্রকৃতির সঙ্গে।

শুনতে পাচ্ছি নীরুর গীতালাপ—

"আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে!

কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে বিরহ বিধুর সুরে।"

বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হল ওর জন্য তাই হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার আর অমোঘপাশ লোকেশ্বরকে সময় দিয়ে দেখা হল না।

বেলা পড়ে এসেছে। সোজা চলে এলাম তাই বাস ষ্ট্যাণ্ডে। চলেছি ফিরে কাঠমাণ্ডুতে। সামান্য কিছুটা যাবার পর মাধবী রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

কি করছ এখানে একা একা—আর সব কোথায়? জিজ্ঞাসা করতেই মুখটা তুলে মাধবী উত্তর করল—এখানেই আছে। এটা জীবন্ত কুমারীর মন্দির। ওরা ভেতরে গেছে।

জীবন্ত কুমারী! সে আবার কি? কৌতূহল হল একটু।

সন্দেহ আর থাকে কেন—চলুন না ভেতরে। কথাটুকু বলে মাধবী এগিয়ে চলল।

এই কুমারীকে কেন্দ্র করে বেশ চিত্তাকর্ষক একটা কিংবদন্তী আছে।

মধ্যযুগীয় নেপাল—অন্যান্য দেশের মতই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ভূত প্রেত দৈত্য দানো,—অস্তিত্বহীন, যুক্তিহীন, নানা রকমের কুসংস্কারে আর আচার আচরণে বিশ্বাস করত। গাছ, সাপ, পাথরকেও দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত। বাঘের ভয়ে ওরা আজও কীর্ত্তিপুরের বাঘভৈরবের পূজা করে। এদের বিশ্বাস মানুষ মানুষীদের মধ্যেও এমনি অনিষ্টকারী পিশাচ, ডাইনী আর অপদেবতা আছে। ইচ্ছা করলেই ওরা সাধারণের অনিষ্ট করতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়—শেষ মল্লরাজ জয় প্রকাশ মল্লের যুগ। ঐ সময় কাঠমাণ্ডুতে ছোট এক কুমারী মেয়ে ছিল। অনেকেরই ধারণা যে এ মেয়েটির কোপদৃষ্টিতে অনেক অঘটন হতে পারে। অপদেবতার মত ভর করে মেয়েটী যে কোন লোকের ওপর অত্যাচারও করতে পারে।

কে যেন কথাটা রাজার কানে তুলে দিল। রাজার জেরার উত্তরে মেয়েটী নিজেকে দেবী অংশ সম্ভূতা বলে দাবী করল। ওতে কর্ণপাত না করে রাজা ওকে কাঠমাণ্ডু থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

অদ্ভুত! অলৌকিক এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। কুমারীর নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে, রাণীরও মানসিক বিকৃতি দেখা দিল। রাণী বিকারগ্রস্তের মত মাঝে মাঝেই চীৎকার করে বলে উঠতেন "কুমারী আমার উপর ভর করেছে।"

এই বিস্ময়কর ব্যাপারে রাজা বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাই কুমারীকে ফিরিয়ে এনে জাঁকজমক সহ শোভাযাত্রা করে সহর প্রদক্ষিণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই থেকে কুমারীপূজা নেপালের এক বিশেষ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

প্রতি বৎসর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বর্ষারাণী রূপে আর শান্তির প্রতীক হিসাবে কুমারীকে রথে চাপিয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে মহাসমারোহে উৎসবটি প্রতিপালিত হয়।

জীবন্ত কুমারী আর কুমারী-পূজার জন্য, পাটানে আর কাঠমাণ্ডুতে

প্রচুর বিত্ত, বিস্তর জমিজমা রেখে দেওয়া আছে। সাধারণতঃ এক একটি কুমারী ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকে। পণ্ডিতেরা লক্ষণাদি বিচার করে পরবর্ত্তী কুমারীকে স্থির করেন।

এ পদের অধিকারিণীরা সামাজিক স্বীকৃতি পায়না আর বিবাহের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় তাই অনেক সময় এদের পরবর্ত্তী জীবন দুঃসহ গ্লানিময় হয়ে ওঠে।

ললিতপুর থেকে ফিরতে বিকাল গড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর সবাই ঘুরতে বেরোবে বলে স্থির করেছে। প্রতিবন্ধক হয়ে মদন বাবু হোটেলের দরজাটা আগলে দাঁড়ালেন। অগত্যা ফিরে আসতে হল।

আসর জঁাকাতে হলে চা একটু চাই-ই। সতী চায়ের ট্রে হাতে বেয়ারাকে নিয়ে এল।

নেপালের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার টুকিটাকি শোনবার জন্য সবাই মদনবাবুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। একথা সেকথা বলে মদনবাবু পাশ কাটাবার চেষ্টা করছেন।

"ওটি হবার যো নেই"—সমস্বরে অনুরোধ জানাল সবাই।

অগত্যা মদনবাবু রাজী হলেন। ভনিতা করে বললেন—উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেকদিন থেকে নেপালে নানা রকমের কুসংস্কার চলে আসছে। গ্রাম্য লোকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হলে কথাটুকুর তাৎপর্য্য বুঝতে দেরী হবে না।

যদিও কাঠমাণ্ডু, ভকৎপুর, ললিতপুর—এসব জায়গার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে বৌদ্ধ স্তূপ আর মন্দিরগুলো তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই এগুলো এখন মৃতের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যেমন মিউজিয়ম দেখে ঠিক তেমনি, কলের পুতুলের মত সবাই চোখ বুলিয়ে যায় এগুলোর ওপর। স্তূপ আর মন্দিরগুলো চিরকাল প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বস্তু হয়েই থাকবে।

একদিকে স্তূপ আর বৌদ্ধ মন্দির অন্যদিকে শিব আর শক্তির মন্দির সারা বাগমতী উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে। পশুপতিনাথ, গোকর্ণেশ্বর এ সব শিব মন্দির। গুহ্যেশ্বরী, তালেজুভবানী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, খড়্গযোগিনী আর দক্ষিণকালী, এই কয়টি শক্তির মন্দির তথা দেবী পীঠ।

বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠির রীতি নীতির প্রভাবে নেপালের অধিবাসিরা এক্ষণে প্রায় সবাই শক্তির পূজারী। রাজাকে কিন্তু সবাই বিষ্ণুর অবতার বলে মানে।

শক্তির পূজারী অঘোরীবাবা। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এই তান্ত্রিক সাধু। আজ আপনাদের কাছে এরই কথা বলব।

নেপালের শক্তি-পূজা সম্পূর্ণ তান্ত্রিক মতেই হয়। বলিদান এ পূজার অন্যতম অঙ্গ আর মাঝে মাঝে এমনি পূজায় নরবলির কথাও শোনা যায়।

এক কালে অবশ্য ভারতেও দেবীর পূজায় নর শোণিতের ব্যবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই। নেপালে কিন্তু এই জঘন্য প্রথাটুকু এখনও বন্ধ করা হয়নি। কিছুদিন আগেও মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার আসামীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নরদেবীর কাছে বলি দেওয়া হত। রক্তলোলুপা বাগমতী কত যে রুধির লেহন করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

যা বলছি তা গল্প নয় আমারই অভিজ্ঞতার এক নিদারুণ সত্য কাহিনী।

প্রায় বছর দেড়েক আগে আমি একদিন গৌচর বিমান ঘাঁটি থেকে বনের পথ ধরে মোটর বাইকে কাঠমাণ্ডুর দিকে চলেছি। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্জ্জন বনপথে চলতে গা'টা বেশ ছম্‌ছম্‌ করছিল। বাইকের সন্ধানী আলোতে ঠিক ঐ সময় দেখতে পেলাম বনের ধার ঘেঁসে অঘোরীবাবা যেন কি করছেন।

রাত আটটায় প্রেস রিপোর্টারদের সঙ্গে মহারাজার সাক্ষাতের কথা

ছিল। কোনদিকে লক্ষ্য না করে তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছি আর সাইকেলের গতিবেগটাও বাড়িয়ে দিয়েছি।

কি আপদ! আমি লক্ষ্য না করলে কি হবে, অঘোরীবাবার নজর কিন্তু এড়াল না। হেঁকে উঠলেন, আরে মদন বাবু যে! এস, এস। কোথায় ছিলে এত দিন। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। একটু বোস এখানে।

ইতঃস্তত আর উসখুস করছি দেখে বললেন—একটু বোসে যাও, ঠিক সময় পৌঁছে যাবে, চিন্তা কি?

গাড়ীটা রাস্তার এক পাশে হেলিয়ে রেখে ওর কাছে গিয়ে বসলাম।

এই সব সাধুদের একটু ভয় ভয়ই করে, তাই কোন কথা না বলে চুপ করেই রইলাম।

তারপর খবর কি গুপ্তজী? জিজ্ঞাসা করতেই বললাম—মোটামুটি ভালই আছি।

দেখতে পেলাম অঘোরীবাবার পাশটাতে একটা নরকপালের মধ্যে সামান্য কিছু পানীয় আর খাদ্য জড় করা রয়েছে।

অঘোরীবাবা রহস্যময় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—খাবে নাকি একটু?

স্পষ্ট ভাবে আমার অনিচ্ছাটুকু জানালাম। বললাম—খাদ্য, পানীয় কোনটারই আমার দরকার নেই।

"আমার আবার সাথী না পেলে খাওয়া হয় না। তুমি ত রাজী হলেনা, দেখি অন্য কোন সাথী জোটে কিনা।" এই বলেই অঘোরীবাবা চুক্‌চুক করে একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

ইন্দ্রজাল না কি?

একটা কুকুর আর একটা শেয়াল এসে হাজির হল। তিনটি জীব, একই পাত্রে মুখ লাগিয়ে পরম আনন্দে খেয়ে নিল।

দৃশ্যটা যেন নিজের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে এমনি অবস্থায় খুকু বলে উঠল—মাগো! কি ঘেন্নার কথা!

মদন বাবু বললেন—আমিও ঐ সময়ে ঠিক এই কথাটাই ভেবে ছিলাম। পালাতে পারলে বাঁচি তখন।

আমার ভাবখানা দেখে অঘোরীবাবা ধমকে উঠলেন—"জীব মাত্রেই শিব!" নাক সিঁট্‌কাচ্ছ কেন?

খুব ভয় খেয়ে গেলাম, কি আর করি একেবারে চুপটি করে বসে রইলাম।

ওর খাওয়া শেষ হতে প্রায় দশ মিনিট উৎরে গেল। "যাই" এ কথাটি আর আমাকে বলতে হলনা। নিজেই বললেন—তোমার যখন এত তাড়া তখন আর একদিন আমার কথাগুলো বলব। আচ্ছা তুমি তবে এস।

আমি বাইকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অঘোরীবাবা পিট্ পিট্ করে হাসতে লাগলেন। সব কিছু ভুলে আমি হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, প্রায় কাণ্ডজ্ঞান হারা।

কই, যাওনা এগিয়ে, দেরী হয়ে যাবে যে! তবে কথা হচ্ছে তোমার বাইকটা চলবে ত?

কি রকম?

বাইকটা ত তোমার খারাপ হয়ে গেছে, সন্দেহ হচ্ছে নাকি!

কি এ হেঁয়ালী!

কথাটুকু শুনে ভাবছি লোকটা পাগল না কি?

কি আশ্চর্য্য! পায়ে করে বারবার ষ্টার্টারটা ঠেলছি কিন্তু কোন সাড়া দিচ্ছে না এঞ্জিনটা। একি হল!

অঘোরীবাবা অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বললেন—ওহে নাস্তিক! সাধুটাধুদের একটু বিশ্বাস করো!

ওর কথায় কান দিলাম না।

এদিকে টুক্‌টাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করে গলদঘর্ম্ম হয়ে পড়েছি। এঞ্জিনটা কোন কথাই বলছেনা। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম।

আমার দুর্দ্দশায় অঘোরীবাবা মজা দেখছেন।
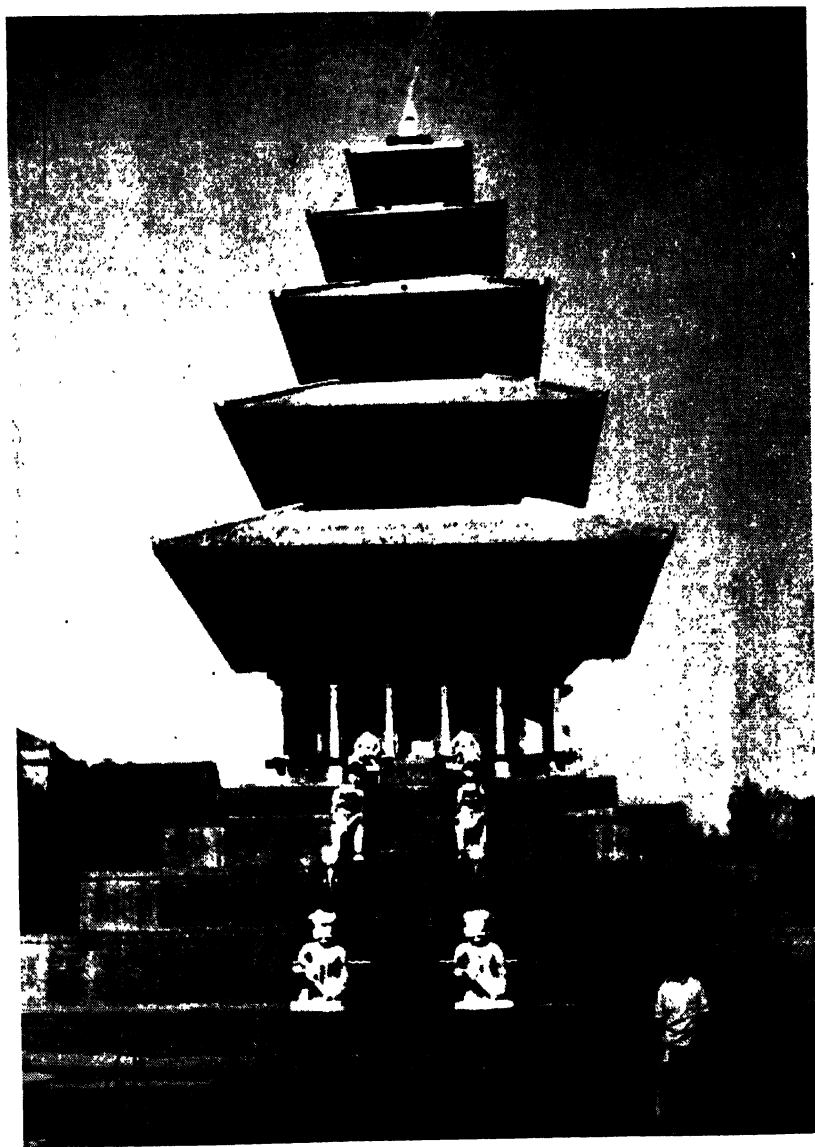
ভকতপুর

দেবী ভবানীর মন্দির—পঞ্চস্তরে উঠে গেছে শূন্যলোকে

(এমনি একটী মন্দির আছে জাপানের হোরিয়ুজিতে)

ভকতপুর দরবার স্কোয়ার

সোনার পাতে মোড়া তোরণ দ্বার—স্বর্ণ শিল্পীদের অতুলনীয় অবদান

খুব রাগ হল।

আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে হয়ত একটু অনুকম্পা হল। তাই সহানুভূতির সুর টেনে অঘোরীবাবা আবার বললেন—আর একবার চেষ্টা করে দেখ, মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে, এবার এঞ্জিনটা চলবে।

অবাক্ কাণ্ড! ষ্টার্টারটা চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনটা সত্যিই গর্জ্জে উঠল।

যাদুকর পি, সি, সরকার যে!

খুকুর কণ্ঠে উত্তেজনা আর বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হল।

পরক্ষণেই মদন বাবু ওর প্রসঙ্গে ফিরে বললেন—এখনই কি হয়েছে, আরও আছে শোন। চলতে উদ্যত হয়েছি, এমনি সময় অঘোরীবাবা বললেন—তোমাকে আটকে রেখে একটু কষ্ট দিলাম। তবে ওটা তোমার আখেরের ভাল'র জন্যই করেছি।

কি রকম? প্রশ্ন না করে পারলাম না।

কর্ত্তৃত্বের সুর টেনে অঘোরীবাবা বললেন—একটু এগিয়ে গেলেই আমার কথাটুকুর তাৎপর্য্য বুঝতে আর বাকী থাকবে না। বোধনাথ স্তূপের কাছে দেখবে বিপরীতগামী দুটো মোটরের সংঘর্ষে প্রলয় ঘটে গেছে। তোমাকে আটকে না রাখলে তুমিও ঐ দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেতে না। অনিবার্য্য ছিল তোমার মৃত্যু। জোর বেঁচে গেছ। বিশ্বনিয়ন্তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দাও।

অবিশ্বাস আর সংশয়ের দোলায় এগিয়ে চললাম।

সত্যিই অদ্ভুত! বোধনাথ স্তূপের কাছে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে আছে দুটো মোটর গাড়ী।

আরে! ভবিষ্যৎ গুণতে জানেন নাকি?

আতঙ্কিত খুকু—বড় বড় চোখ দুটো কপালে তুলে তাকিয়ে রইল।

যা এতক্ষণ রহস্য বলে উড়িয়ে দিয়েছি, পাগলের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় ভেবেছি—তা ত নয়!

তবে?

রহস্যময় হয়েই রয়ে গেলেন অঘোরীবাবা।

স্বেচ্ছায় আবার আর একটা গল্প সুরু করলেন মদন বাবু।

এই অঘোরীবাবা মাঝে মাঝে কাঠমাণ্ডু ছেড়ে কোথায় যে চলে যান কেউ তা জানতে পারে না। সেদিনের কথা—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে মুঙ্গেরের ছোট একটা গ্রামে।

বন্যাপ্লাবিত এলাকাটার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে চারদিকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। সন্ধ্যার পর রাতটা কাটাবার জন্য উচু ডাঙ্গার ওপরে একটা পরিত্যক্ত কুড়েতে ঢুকেছি।

চারদিক থৈ থৈ করছে জল। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, কুড়ের খুঁটিতে একটা কচি ছাগল বাঁধা রয়েছে দেখে।

সঙ্গের বেয়ারা, আলোটা জ্বেলে ষ্টোভে একটু চাল ডাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছিল। অস্বচ্ছ আলোতে দেখতে পেলাম—একধার ঘেঁসে দশাসই একটা দেহ আপাদ-মস্তক চাদরে মুড়ে পড়ে আছে। একটু ভয় ভয় করছিল।

ষ্টোভের গর্জ্জনে হয়ত ঘুমের ব্যাঘাত হল—দেহটা নড়েচড়ে উঠে বসল।

যা দেখলাম, অবিশ্বাস্য বলেই মনে হল। চোখ দুটোকে রগড়ে বড় বড় করে আবার তাকালাম। না, অঘোরীবাবাই! বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে যে?

উত্তর করলেন—ভাগাড়ে এসেছি, পেটের ধান্ধায়। চোখের উৎসুক জিজ্ঞাসা দেখে বললেন—মগজটা তোমার গোবরে ভরা। যাও, বিরক্ত করো না।

কেমন সব মিয়নো মনে হচ্ছে যেন! কথাটা বলে মদন বাবু উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন।

বেশ বুঝতে পারা গেল, মদন বাবু গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চান।

সতী হেঁকে উঠল—সন্তন, সবার জন্য এক কাপ করে চা নিয়ে এস।

নড়েচড়ে সহজ হয়ে মদন বাবু ওর তৃতীয় গল্পটি শুরু করলেন—এই অঘোরীবাবার সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল, খুবই আকস্মিক ভাবে নরদেবীর মন্দিরে।

সময়টা সন্ধ্যা। কীর্ত্তিপুর থেকে কাঠমাণ্ডুর পথে এগিয়ে চলেছি। চন্দ্রগিরি পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য্য। পাহাড় শীর্ষের শূন্যলোক ফাগের রাগে দপ্‌ করে জ্বলে উঠে ক্রমশঃ আঁধারে মিলিয়ে যেতে লাগল। প্রদোষক্ষণের ক্ষীণ তমসার আবরণ জাল নেমে এল ধরণীর বুকে। অন্যমনস্ক হয়ে ভুল পথে চলে এসেছি নরদেবীর মন্দিরের সম্মুখটায়।

গা'টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আরে—এই ত সেই শিলাখণ্ড! ওর ওপরই যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীদের বলি দেওয়া হয়।

কটর-কট্‌ শব্দ হচ্ছে। শ্মশানের শেয়ালগুলো মৃতের হাড়গোড় চিবোচ্ছে। ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। মূর্ত্তিমান যমসদৃশ—সম্মুখে এসে ধমক লাগালেন অঘোরীবাবা। রাত বিরাতে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? এখনি চলে যাও এখান থেকে।

ভেবে কুল পাই না—যত ভাবি ততই অতলে তলিয়ে যায় চিন্তা। কে এই অঘোরীবাবা! কেন ওর এই অদ্ভুত আচরণ?

কথার কুশল বাঁধুনিতে সবাইকে অভিভূত করে ফেলেছেন মদন বাবু। স্তব্ধ আচ্ছন্নতায় কিছুটা সময় কেটে গেল। বিদায় নেবার জন্য মদন বাবু উঠে দাঁড়ালেন। সময় হয় ত কাল আবার আসব বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

সময় হয় ত মানে? ওসব কপটতা ছাড়ুন, নিশ্চয়ই আসতে হবে। আসবেন কিন্তু, ভুল হয় না যেন! সকলে মিলে চাপ দিয়ে ওর প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করে নিল।

মদন বাবুর আজগুবি গল্প মনের উপর কোন রেখাপাত করতে পারেনি। সারাদিনের পরিশ্রমক্লিষ্ট দেহ—বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেকগুলো লোকের ব্যস্ত কণ্ঠস্বরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। আলোটা জ্বেলে নিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কাঁটাদুটো রাত্রির শেষ প্রহর গুণছে।

বেশ বিরক্তির ভাব নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

এ কি ভূতুরে কাণ্ড রে বাবা! বারান্দাটা জলে থৈ থৈ করছে। হোটেল ম্যানেজার তুবেজী—সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে কোমর বেঁধে জল সেচাতে লেগে গেছেন।

তাজ্জব ব্যাপার—জল এল কোথা থেকে! প্রশ্ন করতেই তুবেজী আক্ষেপ করে উঠলেন—তুরদৃষ্ট! সবই তুরদৃষ্ট মশাই, তা না হলে এই শীতের রাতে এমন তুর্ভোগ হবে কেন?

দোতলার জলের পাইপটা কে যেন খুলে রেখেছিল। সারা রাত জল গড়িয়ে এই অনাসৃষ্টি। জলে ভেসে গেছে বারান্দা, ঐ জল ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর, ভিজে গেছে কার্পেট, সতরঞ্চি। চাকর বাকরগুলো ব্যস্ত—চটের থলে আর বস্তা চাপা দিয়ে জলের রেখাটুকু মুছে নিচ্ছে।

ঘুম আর হল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ। বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম ছাদে।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। গতায়ুপ্রায় রাত্রির আঁধারের আবরণটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটু পরেই জেগে উঠবে হোটেলের বাসিন্দারা।

॥ ১০ ॥

এ কয়দিন অনবরত ঘুরে ঘুরে, সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বিছানা ছেড়ে উঠতে বেশ দেরী হয়ে গেল। প্রাতঃরাশের

টেবিলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা ন'টা। টেবিল ছেড়ে অলস মন্থর গতিতে উত্তেজনাহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম রাণীপুকুরীর বাস ষ্ট্যাণ্ডে।

আজ আমরা ভকতপুরে যাব। মানব আমাদের জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। কেউ বাসে চেপে যাবে না—ক্লান্ত শরীরটা একটু আরাম চাইছে। জীপের ড্রাইভারদের সঙ্গে দরদস্তুর হচ্ছে, কিন্তু বনিবনাও হচ্ছে না। হোটেলেই ফিরে যাব ঠিক করেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে এসে দাঁড়াল প্রেমভকত—আমাদের পুরাণো ড্রাইভার।

প্রেমভকত কাল জানিয়ে দিয়েছিল আজ ওর গাড়ী পাওয়া যাবে না। অথচ দেখছি গাড়ী নিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডেই দাঁড়িয়ে আছে।

কি খবর প্রেমভকত—যাবে নাকি ভকতপুর ?

যাবনা কেন—নিশ্চয়ই যাব ! আমাদের পেয়ে প্রেমভকত হয়ত খুসিই হল।

হুজুর !

প্রেমভকত কিছু একটু বলতে চাইছে যেন।

একটা আরজি আছে হুজুর !

সংক্ষেপেই সেরে ফেল।

সামান্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে—এক্সেলটায় একটু দোষ রয়েছে, ওটা সারিয়ে নি।

যত তাড়াতাড়ি হয় দেখ—বলে নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

খুট্‌খাট্‌, ঠুক্‌ঠাক্‌—ঠোকাঠুকি করে ঠিক্‌ঠাক করতে পনের মিনিটেরও বেশী সময় চলে গেল।

গাড়ীর নীচেতে শুয়ে আছে প্রেমভকত। ওখান থেকেই বলল—ঠিক হয়ে গেছে হুজুর, উঠে পড়ুন।

গাড়ীর নীচ থেকে বেরিয়ে এসেই প্রেমভকত ষ্টিয়ারিং ধরে বসল।

গাড়ী এগিয়ে চলল। পরপর দুটো পেট্রল সার্ভিস ষ্টেশনে তেল না পেয়ে গাড়ী আর একটায় ঢুকল। এখানে তেল জুটল।

মানবকে প্রশ্ন করলাম—প্রথম ষ্টেশন দুটো তেল দিল না কেন?

মানব জানাল—নেপালে এমনি তেলের অভাব হয়। এখানে কোন পাইপ লাইন নেই। রক্সৌল থেকে ট্যাঙ্কে করে তেল আসে। পরিবহনের অসুবিধায় মাঝে মাঝেই এমনি অবস্থা হয়।

সহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। মোড়ের মাথায় ট্রাফিক পুলিশ দু'দুবার আমাদের গাড়ীটাকে রুখে দিল। বেশী যানবাহন চলাচল করে না তাই নেপালের ট্রাফিক পুলিশকে খুব একটা কর্ম্মব্যস্ত থাকতে হয় না। এদের যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গিটি বেশ মনোগ্রাহী। হাতের নির্দ্দেশ আর অঙ্গুলি আন্দোলনটুকু নৃত্যের মুদ্রাভঙ্গির মতন। অঙ্গুলি পরিচালন ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও আন্দোলন হয় একটু।

নিঃসীম ঘন নীলিম—অকলঙ্কিত আকাশ। কোথাও একফালি মেঘ দেখা যাচ্ছে না। ঝল্‌মল্‌ উদার প্রান্তর। সম্মুখে সুদূরপ্রসারী ফেনশুভ্র তুষার তরঙ্গ।

হঠাৎ একটা লোকের হাতের ইসারায় গাড়ীটা থেমে গেল।

ছোট একটা গ্রাম—নামটা থিমি।

লোকটা জোর করেই আমাদের গাড়ীতে দুটো যাত্রীকে তুলে দিতে চাইছে। আমরা আপত্তি তুললাম—এটা রিজার্ভ গাড়ী, অন্য যাত্রীর জায়গা হবে না।

কে কার কথা শোনে! আপত্তি গ্রাহ্য না করে লোকটা ড্রাইভারকে ধমকের সুরে বলল—ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিও। যেন কেনা গোলাম—কোন উচ্চবাচ্য না করে ড্রাইভার নিঃশব্দে বসে রইল।

এ কি জুলুম রে বাবা! শুনলাম লোকটা পুলিশে কাজ করে। কলকাতারই মত—এ জায়গার ড্রাইভাররাও দেখছি পুলিশকে যমের মত ভয় করে।

সামান্য কিছুটা পরেই গাড়ী ভকতপুরের দক্ষিণ সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। গ্রামের ভেতর আর যাবে না। হেঁটেই চলল সবাই।

ভকতপুর—যেদিকে তাকাও শুধুই মন্দিরের চূড়া। মন্দিরের চূড়া ঢেকে ফেলেছে তুষার চূড়াকে। বিস্ময় জাগে—মন্দিরের উচু আকাশ ছোঁয়া চূড়াগুলো দেখে। একটি নয়, দুটি নয়, অসংখ্য মন্দির আছে এই ভকতপুরে। বৃন্দাবনেরই মত—উচু উচু মন্দির চূড়া। বিশাল স্থান জুড়ে আছে বিরাটকায় এক একটা মন্দির।

প্রশ্ন জাগে মনে—আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিলনা, এমনি এক সময়ে শিল্পীরা কি ভাবে গড়ে তুলেছিল এই সব দৈত্যকায় মন্দির—জাগতিক বিপর্য্যয়কে উপেক্ষা করে যা আজও দাঁড়িয়ে আছে নির্বিবচল।

বিশ্বরচয়িতার তুষারমৌলী, নদীনির্ঝর খুবই সুন্দর, অকৃত্রিম এর উদারতা। বিশ্বশিল্পীর রচনার সঙ্গে অবশ্য তুলনা হয়না কোন কিছুরই, তা হলেও এ সব শিল্পকে অস্বীকার করি কেমন করে? এ ধরণের মৌলিক কারুকলাতে যে শিল্পীমনের ধ্যানের পরিচয় ফুটে ওঠে।

ভকতপুরের আর এক নাম ভক্তপুর। স্থানীয় লোকেরা বলে ভাতগাঁও। অতীত যুগে ভগবান তথাগতের ভক্তরা এই জায়গাটুকুকে আশ্রয় করে বসবাস করত বলেই হয়ত এই নামটি হয়েছে।

পুরাতন ঐতিহ্য নিদর্শনের পরিবেশটুকু সবাইকে গম্ভীর দার্শনিক করে তুলেছে। অতীত স্মৃতির স্তুতিচারণে মগ্ন, মানব বলছে—

বহু জাতি অধ্যুষিত এই নেপাল রাজ্য। হ্যাতিয়া, ভূটিয়া, শেরপী, মাগার, গুরুং, নেওয়ার, রাই, লিম্বু, কিরান্তি—এরাই হল এ রাজ্যের প্রাচীন বাসিন্দা। কাঠমাণ্ডুর বর্ত্তমান রাজবংশ এসেছে অনেক পরে, আজ থেকে মাত্র ২০০ শত বছর আগে।

বিভিন্ন জাতির বসতি আর বৈচিত্র্যই নেপালের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির

উৎস। সমস্তকালের রাজাদেরই কাঠমাণ্ডুতে রাজধানী ছিল বলে এই কাঠমাণ্ডুই এদেশের ঐতিহ্য সমন্বিত সংস্কৃতির ধারক, বাহক তথা প্রাণকেন্দ্র। অবশ্য কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন নাম ছিল কান্তিপুর।

কাঠমাণ্ডুর আশেপাশে, কীর্ত্তিপুর, ললিতপুর, আর ভকতপুর—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাময়িক ভাবে রাজধানী গড়ে উঠেছিল বলে এসব নগরীতেও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

স্থানীয় কিরাত বংশীয়েরা, পরে সোমবংশীয়, সূর্য্যবংশীয়—ভারতের রাজপুতেরা, আর কর্ণাটবংশীয় রাজারাও পরপর অনেকেই প্রাচীন নেপালে রাজত্ব করে গেছেন। এই রাজ্য কিছুকাল গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের অধীনেও ছিল। লিচ্ছবীবংশীয় রাজারাও প্রায় ৫০০ শত বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। এদের নানা প্রাচান কীর্ত্তি এদিক সেদিক দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে নেপালে রাজত্ব করেছিলেন রাজপুত মল্লবংশীয়েরা। নেপালের যা কিছু ঐতিহ্য, যা কিছু সমৃদ্ধি আর যত কিছু কীর্ত্তি তা সবই প্রায় মল্লরাজাদের। মহাকালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে, এখনও অম্লান রয়েছে এদের কীর্ত্তি। আর কতদিন এভাবে থাকতে পারবে কে জানে।

মল্লবংশীয় যক্ষমল্লের আমলে কাঠমাণ্ডুর শাসন ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায় আর সেই থেকেই আর দুটো রাজধানী গড়ে ওঠে ভকতপুর আর পাটানে।

অনেকেই ইতিহাসটুকু শুনতে নারাজ। আপত্তি জানিয়ে বললাম—নীরস হলেও ইতিহাস আমার তোমার মত পুরাণো যুগের মানুষেরই কথা। রসিক সুজন যারা, তারাই পারে শুষ্ক মরুভূমি থেকে রস নিঙরে নিতে।

ইতিহাস বর্ণনা ক্ষুণ্ণ হবার বাধাটুকু সরে দাঁড়াল। মানবকে অগ্রাহ্য করতে পারল না কেউ। সবাই ওর দিকে আবার মন দিল।

ভকতপুর অনেক দিনের পুরাণো সহর। আমরা দরবার স্কোয়ারে

দাঁড়িয়ে আছি। মল্লরাজারা হারিয়ে গেছে কিন্তু আজও বেঁচে রয়েছে ওদের স্মৃতি। এই রাজ দরবার থেকেই নেপালের মধ্যযুগীয় শিল্পশৈলী আর শিল্পীমনের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সোনার পাতে মোড়া মন্দির তোরণটি স্বর্ণশিল্পীদের এক অতুলনীয় অবদান—অঙ্গে ধরে রেখেছে নেপালের সমসাময়িক বিত্ত বৈভবের পরিচয় চিহ্ন।

মল্লরাজারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবান্বিত হলেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখে মনে হয় ওরা নিজ ধর্ম্মেই অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজ অন্তঃপুরে দেখতে পাওয়া যায় দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি। দেওয়ালে উৎকীর্ণ অসংখ্য ফ্রেস্কো—ওতে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু দেবদেবীদের আলেখ্য।

আমরা অলিন্দ পথে ঘুরে চলেছি। গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে মন, কারুকলার দিকে। শিল্পীমনের গভীর অনুভূতিকে উপলব্ধি করছি।

শিল্পীরা রূপের উপাসনা করে আর সেই উপাসনালব্ধ রূপানুভূতি ফুটে ওঠে ওদের সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টিতে।

কেঁদে ওঠে মন—আজ কোথায় ওই সব শিল্পীরা!

আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়, সৃষ্টির উপর স্রষ্টার যদি কোন দরদ থাকে তবে বলতেই হবে ওই সব শিল্পীর নয়ন থেকে অবিরত ঝরে পড়ছে আক্ষেপ বিগলিত কান্না বারি।

অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণা! হায়, কি অব্যক্ত দুঃখ! কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে ওদের আর্ত্তবিলাপ—ওদের উত্তরপুরুষ বাঁচিয়ে রাখতে পারলনা ওদের সংস্কৃতিকে, ওদের শিল্পকে।

রাজদরবার থেকে এবার গ্রামের প্রান্তে এলাম। চারদিকে

সোনালী ধানক্ষেত, ওরই সীমান্তে সবুজ পাহাড় শীর্ষের তরঙ্গ। শ্যামছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ের শীর্ষ ব্যাপী রূপোলী জড়ির পারের মত—সেঁটে আছে তুষারমালা। হিমগিরির রূপরাজির দিকে চেয়ে চেয়ে মেটেনা রূপতৃষা।

এই হিমবাহ! দর্শনমাত্র গন্ধময় জীবন ভরে ওঠে কাব্য কথায়। সন্দেহ, সংশয় অবলুপ্ত হয়ে যায় চিরতরে। অবিশ্বাসী ফিরে পায় দৃঢ় বিশ্বাস, আত্ম সংযমে হয়ে ওঠে যোগক্ষেম।

কাননকুন্তলা এই ধরিত্রী। এর মঞ্জু পরিবেশ, নদীনির্ঝরের কলতান, পয়োধর আর তুষার কিরীটীর লুকোচুরি, অরণ্যঘন বিটপীর আলো-ছায়ার খেলা—চোখে বুলোয় মায়াঞ্জন, সৃষ্টি করে কুহেলী, বিস্তার করে মায়াজাল।

প্রকৃতি রাণীর রহস্যের কূলকিনারা মেলা ভার!

ফিরতি পথে প্রথমে দত্তাত্রেয় মন্দিরে, তারপর এলাম আশ্চর্য্য অপর এক মন্দিরে। পাঁচটি ছাদ—বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে শীর্ষদেশ উঠে গেছে শূন্যলোকে।

স্থাপত্যশিল্পের এ এক অদ্ভুত বিস্ময়—স্থপতির নিপুণ চাতুরী! জাপানের হোরিয়ুজিতে ঠিক এমনি আর একটি মন্দির আছে।

বেলা দুপুর। ভকতপুর থেকে ফিরে চললাম কাঠমাণ্ডুর দিকে।

আজ বিকেলের দিকে আর কোন কাজ নেই। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে সঙ্গীরা সহর ঘুরতে বেরোল। কেনবার মত যদি কিছু মিলে যায় তবে কেনাকাটাও করবে।

একরাশ জুতোর বোঝা নিয়ে ওরা ফিরে এলো। দড়িতে তৈরী এই জুতো, নেপালের কুটীর শিল্পের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ওপরটা ভেলভেটে মোড়া। বেশী দামী যেগুলো তাতে জড়ি আর চুমকীর কাজও আছে।

কিছুটা আগে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর জটলা করছি। মদন বাবু এসে ঢুকলেন। পিছু-পিছু মানব আর কল্পনাও এল। মদন বাবুর খবর পেয়ে হোটেলের মালিকও আসরে এসে উপস্থিত।

কুশল বাচনভঙ্গিতে মদন বাবু আসরটাকে জমজমাট করে তুলেছেন। ঐন্দ্রজালিকের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সবাইকে ভুতুরে গল্পের দিকে।

মদন বাবু নেপালের পার্ব্বত্যলোকে ঘুরেছেন। ভূটিয়া, শেরপাদের গ্রামে থেকেছেন, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছেন, ওদের ভাষায় কথাও বলতে পারেন। ইয়েতি তথা তুষার মানব সম্বন্ধে অনুসন্ধান আর তা নিয়ে সংবাদপত্রে অনেক তথ্যও পরিবেশন করেছেন।

মদন বাবু তিব্বত অঞ্চলের কথা বলছেন।

উনি ঐ অঞ্চলে অনেক পিশাচসিদ্ধ আর তান্ত্রিক যাদুকরদের দেখেছেন। অনেক যোগী তপস্বীকে দেখবার সুযোগও হয়েছিল। ১৬০০০ হাজার ফুট উচু তিব্বতের মালভূমির গুম্ফায় তুষারবল্মীকে আবৃত সাধু মহাপুরুষদের দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ওদের পরমায়ুর নাকি কোন হিসেব নেই।

এতক্ষণ ছোট খাট চুটকি মামুলি কথায় বেশ উপভোগ্য রোমাঞ্চের কোন খোরাক না থাকায় শ্রোতারা অধীর হয়ে বলে উঠল—একটু কিছু চমকপ্রদ, কিছু একটু রোমাঞ্চ চাই।

মদন বাবু, তাই আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে আসরে নেমে এলেন। ঝুলি থেকে ঝেড়ে দিলেন এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্প।

মূল কাহিনীতে আসার আগে বললেন—অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। কুসংস্কারই বলুন আর যাই বলুন—চোখে যা দেখেছি শুধু তাই সত্যি আর কিছু সত্যি নয়, এই বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না সব কিছু।

মদন বাবু কিছুটা সময় চুপ করে থেকে শ্রোতাদের মুখমণ্ডলের ভাবক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চট্‌পট্ বলে ফেলুন—অমিত মদন বাবুকে তাড়া দিল।

মদনবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন—তর সইছে না যে! এদিকে ত আমাকে একটা মস্ত বড় গুলবাজ বলে প্রচার করে দিয়েছ। অধীর হয়ো না বন্ধু—বলছি।

কয়েক বছর আগে নেপালের অনেক গৃহস্থেরই ছোট ছোট শিশু সন্তান চুরি হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই এমনি ছেলে চুরি যেতে লাগল। অনেক অনুসন্ধানেও পুলিশ কিনারা করতে পারল না কারা ছেলে চুরি করছে। ব্যাপারটা জটিল রহস্যপূর্ণই থেকে গেল।

বেশ একটা গুমোট ভাব—অস্থির অধীরতা প্রকট হয়ে উঠেছে সবার হাবভাবে।

শ্বেতার কণ্ঠ থেকে অনুযোগ বেরিয়ে এল। বলুন—এমনি থেমে থেমে বললে কিন্তু রসভঙ্গ হয়ে যায়।

একটু জিরোতে দেবেনা কি! বলছি, বলছি। একটু সবুর কর।

রসাল ভাবটা ফুটিয়ে তোলার জন্য মদন বাবু একটু একটু বলছেন, আবার চেপে যাচ্ছেন। সবার তাড়া খেয়ে আবার বললেন—বছর পাঁচেক আগে শিবচতুর্দ্দশীর মেলায় স্থানীয় আর দেশবিদেশ থেকে দূর দূরান্তের অনেক যাত্রী এসেছিল পশুপতিনাথ দর্শনে। মন্দিরের আশেপাশে তীর্থযাত্রীদের জন্য অনেক ছোট কুঠরী রয়েছে, আপনারা তা দেখেছেন। ওরই একটা ছোট কুঠরীতে দ্বারভাঙ্গার এক পরিবার এসে বাসা নিল। পরিবারের পুত্রবধূ সবিতা, মানত নিয়ে এসেছে পশুপতিনাথের কাছে। ছোট এক শিশু ওর কোলে। বৃদ্ধা শ্বাশুরী আর স্বামীও সঙ্গে রয়েছেন।

শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে পাশেরই এক যাত্রী পরিবারকে দেখবার কথা বলে ওরা সকলে মিলে দেব দর্শনে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন বিছানায় ছেলে নেই।

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। এদিকে মায়ের আর্ত্ত বিলাপ, ওদিকে বাপ ছুটোছুটি করে হয়রাণ। শ্বাশুরী মুহ্যমান।

পুলিশে খবর দেওয়া হল। যাত্রীদের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেল, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা শিশুকে। জীপে করে পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল। কেউই কোন পাত্তা করতে পারল না।

যাত্রীরা সব মায়ের ব্যথায় বিমূঢ়।

মদন বাবু গল্পের শেষটুকু আর বলছেন না। শ্বেতা আর সতী—ওকে উত্যক্ত করে তুলল।

তোমরাই বলনা শেষটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াল—দেখি তোমাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনার দৌড়টুকু। মদন বাবু রহস্যটুকু ভাঙ্গছেন না।

ছেলেটা বাগমতীর জলে পড়ে গেল কি ?—শ্বেতা উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন করল।

হতেও পারে। নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করলেন মদন বাবু।

সমধিক উৎকণ্ঠায় সতীও প্রশ্ন করল—শেয়াল কুকুরে নিয়ে গেল না ত ?

ভাবলেশহীন মদন বাবু বলেন—কে তা বলতে পারে ?

সবার দৃষ্টিতে বেশ অধীর আগ্রহ আর অব্যক্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল, সারা আসরটা উষিপুষি করতে লাগল।

—না, ওসব কিছু না। তোমরা যখন বলতে পারলে না, তখন রহস্যটুকু ভেঙ্গেই দিচ্ছি।

চোর ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ে গেল এক অশুভক্ষণে।

সে এক বিশ্রী, বীভৎস ব্যাপার।

চোর নয়, নরভুক্ রাক্ষসী—এক ডাইনী। মায়ের কোলে ছোট শিশুকে দেখে রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিল পিশাচী। তাকে তাকে ছিল, মায়ের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে কোন এক ফাঁকে চুরি করে নিল শিশুকে।

পশুপতিনাথ মন্দিরের ওপারে জঙ্গলের ভেতর বসে পরম পরিতৃপ্তিতে শিশুর হাড়গোড় চিবিয়ে খাচ্ছিল ঐ ডাইনী—ঠিক ঐ সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

বিচার হল। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষসীটা বলল—বড় মিষ্টি শিশুদের রক্ত, বড় সুস্বাদু ওদের কচি মাংস।

আমরা কোথায় আছি—একি গুলির আড্ডা। যত সব ধাপ্পাবাজী। অমিতের কণ্ঠ রাগে ফেটে পড়ল।

আমারই ভুল হয়েছে। সন্দেহ করেছিলাম আমিও—আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না—ক্ষুণ্ণ আর ক্ষুব্ধ স্বরে মদন বাবু একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

যাক্‌গে—শুধু শুধুই কিছুটা সময় নষ্ট হল। একটা নমুনাতেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন! অমিত বাবু ত দেখছি একেবারে চটে লাল।

মদন বাবু উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা আজ তবে আসি, বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

ওকি—ওকি—সতী আর শ্বেতা ভদ্রলোকের হাত দুটো চেপে ধরল।

কোথায় যাচ্ছেন, ওসব চলবে না। চুপটি করে বসুন ত। ওরা দুজন মদনবাবুকে আবার বসিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন মদন বাবু।

বলুন না—সেই যে একটা গল্প, কথায় কথায় সেদিন বলছিলেন—ঐ যে সেই আমেরিকান ভদ্রমহিলা যিনি ভূতুরে গল্প লেখেন—কি নাম যেন মিস্ রণ হল্ট না কি? বলুন না? কেমন ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন কোথায় যেন!—ও গল্পটা না শুনে কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।

ওরা দুজন মদন বাবুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

নূতন করে আসর জমাতে, পরিবেশটাকে উপযুক্ত করে তৈরী করে নিতে, বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। আবার এক দফা চা-টাও এল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসে মদন বাবু মিস্ রণ হণ্টের গল্পটা সুরু করলেন।

হনুমানঢোকার রাজপ্রাসাদটা প্রায় সিংহ দরবারেরই অনুরূপ। ওতেও ৬০০।৭০০ শত কুঠরী আছে। ওটা পূর্ব্বতন রাজাদের আবাসস্থল ছিল। এখন রাজা অবশ্য উঠে গেছেন তার নারায়ণহিতির নূতন প্রাসাদে।

মিস্ রণ হণ্ট ভূতুরে গল্প লেখায় সুনিপুণ—সিদ্ধহস্ত। ভূতুরে গল্প লেখেন বটে কিন্তু উনি নাকি ভূত, প্রেত ওসব কিচ্ছু বিশ্বাস করেন না। অদ্ভুত এই ভদ্র মহিলার আচরণ। দিনের বেলা ঘুমোন আর সারা রাত জেগে জেগে কাটান। নিশাকালই নাকি ভূতুরে গল্প লেখার সব চেয়ে উপযুক্ত সময়।

দু'চার বছর আগে মিস্ হণ্ট নেপালে এসেছিলেন। কার কাছে শুনেছেন রাজপুরীর কোন একটা ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়। অমনি এসে ধরলেন, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে হবে ঐ ঘরে।

কালে ভদ্রে খোলা হয়—বন্ধ ঘরের ভেতরটায় রাত দুপুরে আমরা দু'জন এসে বসলাম। বাদুর-চাম্‌চিকের আড্ডা—ঘরটার ভেতরে ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা বাদুর ডানা ঝট্‌পট্‌ করে এদিক থেকে ওদিক উড়ে যেতে লাগল।

নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তটির জন্য, উদ্বেগ আর শঙ্কা নিয়ে দু'জনেই সম্মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—কখন কি হয়!

মিস্ হণ্টের হাতের টর্চটা নেবানো অবস্থায় আছে। হঠাৎ ঝড়ের এক ঝাপটায় সম্মুখের দরজার একটা পাট খুলে গেল। পর মুহূর্ত্তে আবার বন্ধও হয়ে গেল।

কিম্ভূতকিমাকার একটা আকৃতি সম্মুখে এগিয়ে আসছে!

রুদ্ধশ্বাস, রুদ্ধবাক্! আশ্চর্য্য কিছু একটা ঘটবে, উদগ্রীব হয়ে আছি।

মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে পা, পা, করে আসছে। জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটার মত একটা চোখ জ্বলজ্বল করছে!

দীর্ঘ এক কালো ছায়া!

রাম নাম জপতে লাগলাম।

কালো ছায়াটা যেন একচোখো সেই সাইক্লোপ্‌স্‌ দৈত্য।

হঠাৎ কি যে ঘটে গেল বোঝা গেল না। ভয়ে ত্রাসে চীৎকার করে উঠলেন মিস্‌ হণ্ট। জোরে জাপ্‌টে ধরলেন আমাকে। ঝুপ করে টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল।

মিস্‌ হণ্ট সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন। এই শীতের রাতেও স্বেদবিন্দুতে ওর গণ্ডদেশ ছেয়ে গেছে।

টর্চটা হাতরে বের করে বোতামটা টিপে দিলাম। কোথাও কিছু নেই। মিস হণ্টের সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে এল।

এখানে আর এক দণ্ডও নয়—অন্য একটা দরজা দিয়ে তখনি বেরিয়ে এসে তবে শান্ত হলাম।

কৌতুক হাস্যে মদন বাবুকে শুধালাম—দাদা কত পারসেণ্ট! কতটুকু ভেজাল থাকলে ঝুটা মাল খাঁটি বলে উৎরে যায়?

মদন বাবু বলেন—জানি, কিছুই আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তবু সময়টা ত কাটল কোন রকম করে। থাকগে—কালকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?—মদন বাবু আমাদের মতামতটুকু জানতে চাইলেন।

আপনিই ঠিক করে ফেলুন। এ বিষয়ে ত আপনিই বিজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ঠিক হল কাল আমরা যাব দক্ষিণকালী। দুপুরটা ওখানেই কাটাব। বিকালের দিকে সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্য যাব কাকনীতে।

দক্ষিণকালী নেপালের জাগ্রত দেবী। স্থানটিও খুব সুন্দর।

কাল প্রত্যুষেই আমরা বেরোব। সারাদিন ধরে ঘুরব। ফিরব সেই রাত্রিতে।

শুভরাত্রি জানিয়ে মদন বাবু আর হোটেল মালিক বিদায় নিলেন।

ঐ ওটা যুগল ণশ, দূরেরটা গণেশ হিমল, সবশেষে পূব রটা শৃঙ্গরাজ এভারেষ্ট

বাগমতীর ওপর চোভারের ঝুলন্ত সেতু

শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে স্তম্ভিত জলধারা মিশে গেল বাগমতী স্রোতে

গল্পের মন্ত্রজালে আচ্ছন্ন, স্তব্ধ হয়েছিল সবাই। মৌন ভঙ্গে অমিত আক্ষেপ করে উঠল—সব ধোকাবাজী, সব ঝুটা। মদন বাবুটা আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে চলে গেল।

॥ ১১ ॥

পরদিন—রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে বাজার টাজার করে অমিত সব ঠিকঠাক করে নিল।

এড্‌মাণ্ডও আজ আমাদের সঙ্গে যাবে।

ওর গুরু-প্রদত্ত নাম—যোগীরাজ ইউনোমিন্।

এড্‌মাণ্ড ভারতের অনেক তীর্থই পরিদর্শন করেছে। হিম-প্রান্তরে কেদারবদ্রী, সমুদ্রতীরে পুরী আর কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে পরশুরাম কুণ্ড আর কামাখ্যা, পশ্চিমে দ্বারকা আর সোমনাথ—সবই দেখেছে।

যোগীরাজ শুধুই ঘুরে বেড়ায়—বলে চলাটাই আনন্দ, গতিহীনতাটা হচ্ছে মৃত্যু।

ভোর ভোর মদন বাবুও জুটে গেছেন : কল্পনার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার আর মানবের হাতে একটা ঝুড়ি। অমিতও নানা সম্ভারে খাবারের ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়েছে।

প্রেমভকত গাড়ী নিয়ে হোটেলের দরজায় অপেক্ষা করছে।

বেশ সকাল সকালই গাড়ীতে চেপে বসলাম।

গাড়ী এগিয়ে চলল।

হেমন্তের প্রভাত সূর্য্য—উজ্জ্বল রাঙারশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে কাঠমাণ্ডুর পথে ঘাটে। চারদিকে অরুণ ঝলক্—আমাদের রক্তেও তার স্পর্শ লেগেছে।

কি এক বন্য উদ্দামতা পেয়ে বসেছে সবাইকে। প্রেমভক্ত! রুখ, রুখ—বলে হঠাৎ ঝপাঝপ্ নেমে পড়ছে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দৃষ্টি চালিয়ে দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছে তুষার কিরীটীর রূপমহিমা। আবার ঝটপট্ চেপে বসছে গাড়ীতে। এমনি করে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।

আবার একটা জায়গায় গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। বিষ্ণুমতী আর বাগমতীর সঙ্গমে দেখা যাচ্ছে ঝুলন্ত সেতু। দূরে কাঠমাণ্ডু সহর—মাথা উচিয়ে আছে ভীমসেন টাওয়ার।

আবেগে উদ্বেল—নীরু বসে পড়ল ঘাসের ওপর। বিস্ময় সম্ভ্রমে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল হিমালয়ের গম্ভীর রূপের দিকে।

ওকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। হিমলোকের রূপে বিভোর—নীরু ভাব-তরঙ্গে দোলা খাচ্ছে। গুন গুন করছে নীরু—

"যাবনা যাবনা, যাবনা, ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

সবাই গাম্ভীর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। কখনও বা ছোট শিশুর মত উদ্দাম আবেগে খিল খিল করে হেসে উঠছে, কখনও আবার বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনি তুলে স্তব্ধ হয়ে পড়ছে—থেমে যাচ্ছে সব কলরব।

খুকু একাই একশ। দূরবীনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুষারচূড়াগুলোকে আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

ও চূড়াটা কি, সে চূড়াটা কি—জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় মানবকে অস্থির করে তুলল।

—এটা?—মাছেপুছেরি।

—ওটা?—যুগল হিমল।

—ঐ ওটা?—যুগল গণেশ।

—ঐ দূরেরটা ?—গণেশ হিমল।

—সবশেষে পূব দিকেরটা ?—শৃঙ্গরাজ এভারেষ্ট।

মানবের সব চূড়াগুলি মুখস্থ। পরপর সমস্ত হিমশৃঙ্গগুলির নাম আওড়ে যেতে পারে।

ওর চোখ বেঁধে দাও, শুধু বলে দাও কোথায় রয়েছি—অভ্রান্ত অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরপর প্রত্যেকটি তুষারচূড়াকে দেখিয়ে দিতে পারে।

চোভারের কাছাকাছি এসে সকলেই আবার গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার এক পরম রমণীয় স্থান এই চোভার গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে সাজানো সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী। মনোরম এর দৃশ্য, চিত্তাকর্ষক, মনোগ্রাহী এর পরিবেশ। চারদিকে ভুবন ভোলান রূপ। সুউচ্চ ফুলচক পাহাড়ের গায়ে নিবিড় বনবিটপীর ছায়া—দূরে উত্তর প্রান্তরে তুষার শীর্ষের অবগুণ্ঠন।

বিশ্বরচয়িতার মঞ্চক্ষেত্র—অন্তহীন এ রূপরাশি। এ রূপ সুষমা ভোগে অরুচি নেই কারও।

লীলাময়ের অপরূপ এ লীলাখেলা—অন্তরে জাগায় রূপক্ষুধা। আকণ্ঠ এ রূপ-সুধা পান করে বুঁদ হয়ে পড়েছে সকল সঙ্গীরা।

"এ তো খেলা নয় এ যে হৃদয় দহন জ্বালা"

কোন নিভৃত কোণ থেকে ভেসে আসছে মৃদু স্বর—

"কাণ পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

ক্লান্ত বাগমতী! দীর্ঘ উপত্যকা পথ বেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্রোতস্বিনী। পাহাড় প্রাচীরের বেষ্টনী জালের ভেতর ঢুকে আবর্ত্তিত, আকুলিত হচ্ছে এখানটায়। পাহাড়কে বিদীর্ণ করে আবার হারিয়ে গেছে—লুকিয়ে পড়েছে পাহাড়ের আড়ালে।

বাগমতীর ওপর দোল খাচ্ছে ঝুলন্ত সেতু। এটি চোভার গ্রামের পারাপার পথ। আমরা উঠে এসেছি সেতুর ওপরে। নীচে অনেকটা দূরে বাগমতীর তীরে গণেশের মন্দির। স্বর্ণ-মণ্ডিত শীর্ষ ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। চোভার পাহাড়শীর্ষে রয়েছেন আনন্দ-লোকেশ্বর আদিনাথ শিব।

ভ্রমণ পথে সর্ব্বত্রই অমিত নীরব দর্শকের ভূমিকায় কাটিয়ে দিয়েছে। আজ যেন অমিতের মর্ম্ম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দু'একটা কথা—মুখর হয়ে উঠতে চাইছে ক্ষণেকের জন্য। ওর ওষ্ঠপুটে বাক-স্ফূর্ত্তির স্পষ্ট আভাস দেখা যাচ্ছে।

এত মুখচোরা হলে কবে থেকে? মুখের আগলটা আলগা করে দাও। বলনা যা বলবে, ভয়টা কি?—অসীমা ওকে উৎসাহ দিল।

স্বরে স্তিমিত কুণ্ঠা এনে অমিত বলল—ভরসা দিচ্ছেন ত?

চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও—মাধবীও আশ্বাস দিল।

আগ্রহ আর ঔৎসুক্য নিয়ে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অমিত ওর কাহিনীর দরজা খুলে দিল।

কাঠমাণ্ডুর জন্মকথা—পুরাকথাই বলা যায়। তখনও এতটা পুরাণো হয়নি পৃথিবী। নবীন—আদিম তারুণ্যে সবুজ সরস ছিল এ ধরিত্রী। রঙ-রসের সম্ভারে পরিপূর্ণ—শ্যাম সবুজের বিপুল সমারোহ চারদিকে। রহস্য আবরণে ঘেরা সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য—মানুষের পদস্পৃষ্ট হয়ে পৃথিবী আর্ত্ত হয়ে ওঠেনি তখনও।

পৃথিবী শুধু জন্মেছে—মানুষও জন্মেছে মাত্র।

সেই আদিম যুগ থেকেই, দিগন্তবিস্তৃত রহস্যের আহ্বান—মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, যুগ যুগ ধরে টেনে এনেছে পথে। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন প্রয়াসে মানুষ চলেছে অজানার সন্ধানে। চলেছে দিক থেকে দিগন্তরে—আজও সে চলার বিরাম নেই।

নাগদহ!—হিমালয়ের বুকে এক বিশাল জলাশয়। কাঠমাণ্ডু তখন ছিল ওরই অতল গর্ভে। শুনতে পাওয়া যায় বিপস্বী নামে এক মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করেছিলেন নাগদহের তীরে নাগার্জ্জুনের বনে।

স্বপ্নে অলৌকিক এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই দহেরই জলে রোপণ করেছিলেন এক কমল বীজ।

বীজ থেকে জন্মাল এক কমল কোরক।

সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে উদ্ভাসিত হল ঐ কমলদলের অন্তঃস্থল—পূর্ণ প্রস্ফুটিত হল আশ্বিন পূর্ণিমার দিন।

এই স্বয়ম্ভু!

অলৌকিক এই জ্যোতিঃপুঞ্জের খবর পেয়ে অরুণলোক থেকে এলেন শিখিবুদ্ধ। দেবলোক থেকে এলেন সমস্ত দেবতারা।

ক্রমে ক্রমে কমলের জ্যোতি নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে যেতে লাগল। সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল মেষ সংক্রান্তির দিন।

এর পর এলেন বিশ্বভু বুদ্ধ। আশ্রম স্থাপনা করলেন ফুলচক পাহাড়ের গায়ে। সশিষ্য লক্ষ কমলে পূজা করলেন স্বয়ম্ভুকে।

শিষ্যদের সহযোগিতায়, বিশ্বভু অতলান্ত নাগদহের জল নিষ্কাশন করলেন—নাগদহের শুষ্ক বুকে জেগে উঠল মৃন্ময় ভূভাগ। এর পর মঞ্জুশ্রীদেব এসে এই নাগদহেরই শুষ্ক বুকে গড়ে তুললেন এক জনপদ। প্রথমে নাম হল মঞ্জুশ্রী পত্তন—পরে কান্তিপুর। কাষ্ঠমণ্ডপের অপভ্রংশ থেকে এই জনপদই আবার সপ্তদশ শতকে নাম নিল কাঠমাণ্ডু।

নাগদহের জল নিষ্কাশিত হল, জনপদও গড়ে উঠল কিন্তু জল এসে অবরুদ্ধ হয়ে গেল এই চোভারের গিরিপ্রাকারে। আবর্ত্তিত জলে সৃষ্টি হল আর এক দহ।

দ্বাপর যুগের কুখ্যাত দানব—নাম তার দানাসুর। বিরাট প্রাসাদ-পুরী গড়ে তুলল চোভারে। নানাভাবে অত্যাচার সুরু করল নাগদহের জনবসতির ওপর। গিরি প্রাকারে আবদ্ধ জলধারাকে উৎসর্পিত করে মাঝে মাঝেই প্লাবিত করে দিতে লাগল জনপদের ক্ষেত খামার।

গোচারণ মানসে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এলেন গোপগোপিনীদের নিয়ে এই চোভারে। দানাসুরকে ভস্মীভূত করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চক্রাঘাতে পাহাড় প্রাচীর বিদীর্ণ করে চোভারের আবদ্ধ জলধারাকে ঠেলে দিলেন বাগমতীর স্রোতে।

চোভারের পার্ব্বত্য অধিত্যকায় গড়ে উঠল আর এক নূতন জনপদ। অসুর অত্যাচার-পীড়িত মঞ্জুশ্রী জনপদের অধিবাসিরাও পরিত্রাণ পেল।

কেবল কাঠমাণ্ডুই নয়—হিমালয়ের অন্তঃস্থলে যত সব বিশিষ্ট জনপদ গড়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটার পেছনেই এমনি সব আশ্চর্য্য আর চমকপ্রদ কিংবদন্তী আছে।

কাহিনীটুকু শেষ করে প্রশংসা পাবার আশায় অমিত উৎসুক দৃষ্টি তুলে ধরল।

আরে! তুমি ত দেখছি পাকা জহুরী। এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে, এতসব দুর্ম্মূল্য মণিমাণিক্য—অসীমা পিঠ চাপড়ে ওকে বাহবা দিল।

নিজের প্রশংসা শুনে অমিত যত না লজ্জা পেল, খুসী হল তার চেয়েও অনেক বেশী।

আর দেরী কেন? এবার ধরা যাক দক্ষিণকালীর পথ। মদন বাবু বেশ একটু ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। ঝুলন্ত সেতু থেকে নেমে ধীরে ধীরে

বেশ কিছুটা খাড়াই পথ ঠেলে সকলে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রেমভকত ষ্টিয়ারিংটা ধরে নির্ব্বিকার, নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে আছে।

অনেক দেরী হয়ে গেল!

প্রেমভকতের কাছে জবাবদিহি করতে না হলেও কুণ্ঠিতভাবে বললাম—এত দেরী হবে ভাবিনি—কিছু মনে করো না ভাই।

মনে করার আর আছে কি? যাত্রী নিয়ে কারবার—এই ত আমার পেশা, চটলে কি চলে! প্রশান্ত আননে কথা কয়টা বলে প্রেমভকত এ্যাক্সেলেটরটা চেপে ধরল।

কিছুটা রাস্তা এসে খড়্গ-যোগিনীতে গাড়ীর গতি আবার বন্ধ হল।

পাহাড় প্রাচীরে পাষাণের গায়ে খোদাই করা দেবীমূর্ত্তি। যুগে যুগে সিন্দুর লিপ্ত হয়ে দেবী এক কিম্ভুতকিমাকার রূপ নিয়েছেন। সবাই দেবী স্থানের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুটা পরে আবার নীচে নেমে এল।

পাহাড় প্রাচীর বেয়ে প্রস্রবণের স্বচ্ছ ধারা ঝরঝর করে নেমে এসেছে এক জলাধারের মাঝে—আবার ওরই ছিদ্রপথ বেয়ে নেমে গেছে নীচে আর একটা জলাধারে।

স্ফটিক স্বচ্ছ সলিল ধারায় ভেসে চলেছে লীলাচঞ্চল মীনপংক্তির সারি—ছুটোছুটি করছে এদিক থেকে ওদিক। পুচ্ছাঘাতে আলোড়িত স্তরে জেগেছে মৃদু তরঙ্গের হিল্লোল।

মীনপংক্তির মতই চঞ্চল—কেলি কৌতুকে মেতে-উঠেছে সবাই। খুকু আর কল্পনার ত কথাই নেই।

আনন্দ রসাপ্লুত দুই কিশোরী—চপল ভঙ্গীতে অঞ্জলি ভরে তুলে নিচ্ছে স্বচ্ছ নীরধারা। ধারাযন্ত্রের তীব্র গতিতে বারবার নিক্ষেপ করে চলেছে একে অপরের অঙ্গে। ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। ওদের হাত থেকে আমরাও রেহাই পেলাম না।

কোন এক ফাঁকে উৎক্ষিপ্ত জলধারার কয়েক ফোঁটা এসে পড়ল আমার অঙ্গবাসে। ক্যামেরার লেন্সেও দু'এক ফোঁটা পড়ল। বিরক্ত

হলেও প্রকাশ করতে দ্বিধা হল। ওদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দিতে পারলাম না।

যেন কতবড় একটা অন্যায় করে ফেলেছে এমনি ভাব। স্থির অচঞ্চল—স্থানুবৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুজনেই।

কিছু না কিছুনা। যেমন চালাচ্ছিলে চালিয়ে যাও—উৎসাহ দিয়ে ওদের প্রাণবন্ত করবার চেষ্টা করলাম।

চারদিকে নিঃঝুম পার্ব্বত্য প্রকৃতি। অখণ্ড নীরবতা, প্রশান্ত ঔদার্য্য। হিমালয়ের অন্তঃপুরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে ধরা দিয়েছে সবার কাছে।

তুষারাচ্ছন্ন হিমলোকের বিচ্ছুরিত ছবি—সকলের আঁখিতারা অধিকার করে রয়েছে। আত্মহারা বিহ্বল হয়ে পড়েছে সবাই।

এই নেপালেরই হিমলোকে রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সর্ব্বোচ্চ তুষারচূড়াগুলি। এভারেষ্ট, গৌরীশৃঙ্গ, যুগল গণেশ, যুগল হিমল, গণেশ হিমল, হিমল চূলী, মাকালু, অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি, কাঞ্চন-জঙ্ঘা—সব কটাই।

নেপালকে চেনেনা কে ?

নানাদেশ থেকে শৃঙ্গ জয় অভিযানে আসে অভিযাত্রী দল, তাই নেপালকে চেনে সবাই। ওরই সঙ্গে চেনে শেরপা-ভুটিয়াদের। ওদের না চিনলে নেপালকে চেনা তুচ্ছ হয়ে যায়।

কে বইবে তোমার মালের বোঝা ?

না—নেপালী শেরপা-ভুটিয়া।

কে তোমায় দেখাবে পথ ? ঐ একই কথা।

কে তোমায় দেবে উৎসাহ উদ্দীপনা ?

দেবে ওরাই।

এরা তুষার মরুর নির্ভীক সৈনিক।

সাহস আর ধৈর্য্যের প্রতীক—অধ্যবসায়ের জাজ্বল্যমান আদর্শ।
এদের সাহায্য ছাড়া শৃঙ্গ বিজয়ের কথা চিন্তাও করা যায় না।

একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছি। দেখতে পাচ্ছি নেপালী গ্রাম্য-জীবনকে। শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি থেকে মুক্ত, ছোট ছোট শিশুগুলো অনাবৃত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়স্ক পুরুষেরা আলসেতে বসে অলসভাবে গুড়ুক গুড়ুক্ করে হুঁকো টানছে। ছিন্ন জীর্ণ মলিন বসনে আবৃত ওদের দেহ। ওদের পাশে গৃহস্থ বধূরাও বসে আছে। ক্ষেত থেকে তুলে আনা নূতন ধান চাটাইয়ের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। উন্মুক্ত আঙ্গিনায় ধানগুলো শুকোচ্ছে।

অতি-স্পৃহিত এ জীবন!
কৃত্রিমতার কোন ছোঁয়াচই এদের নষ্ট করে দিতে পারেনি।
এরা নির্ব্বিরোধ, এরা অল্পেতেই তুষ্ট।
এরা অভাব বোধ করেনা—নইলে নিশ্চয়ই ছুটে যেত সহরের আধুনিক মরীচিকার পেছনে।
এরা দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা। বিত্ত বৈভবে নেই কোন লিপ্সা। নেই কোন গর্ব্বিত মদমত্ত আচরণ।
আরও চাই, আরও চাই করে—লালসার রথচক্র পিষে চূর্ণ করে দেয় না নিম্নস্তরের জীবকে।
নেই এদের পরশ্রীকাতরতা। নেই কোন হিংসা-দ্বেষ, নেই মোহমদ।
নির্ম্মল এদের অন্তর—শুচিশুদ্ধ এদের আত্মা।

মনে হয় কত সুন্দর এ জীবন! কত সুন্দর এই আরণ্যক মোহ! চারদিকে তৃণাস্তরণ, পাহাড় প্রাচীরে পুষ্প বীথি। কত লতা, কত ফুল, কত পাতা! সবার ওপর সবুজ—পল্লব-শ্যাম ধরণী।

এমনি করে পাহাড়ের পথ ধরে শতপাকে ঘুরে ঘুরে গাড়ী এসে দাঁড়াল দক্ষিণকালীতে।

বেলা দু'পুর গড়িয়ে গেছে।

আবেশোদ্বেল—নিভৃত নির্জ্জন পরিবেশ।

মন্দির বেদীর পাদস্পর্শ করে মন্দমধুর ঝঙ্কার তুলে ক্ষীণতনু তটিনী বয়ে চলেছে নৃত্যের ছন্দে। ওরই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে অনুক্ষণ প্রাণ-বীণার তারে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে আনন্দ-রসঘন পটভূমিতে, অরণ্য বেদীমূলে ঐ দেখা যায় দক্ষিণকালী প্রতিমা।

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকি। মনের অজ্ঞাতে কণ্ঠ থেকে উদ্গীত হল—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া॥"
দেবি! প্রপন্নার্ত্তি হরে! প্রসীদ।

মা, মাগো—অসুর-নাশিনী, দৈত্য-দলনী তুমি! তুমি লোলরসনা নৃমুণ্ড মালিনী! তুমি ভয়ভীষণা সংহারিকা, তুমি রুদ্রাণী—ভীমা ভয়ঙ্করা। তুমি অমাকুন্তলা—ভৈরবী ভৈমী তুমি।

স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ক্ষুব্ধ চিত্তের ভাবনা চিন্তা আর যত সংশয়ের আলোড়ন। মনে হচ্ছে এসে পড়েছি কোন এক রসোত্তীর্ণ জগতে।

চিত্ত হয়ে পড়েছে স্থির।

ভেঙ্গে দিল কে এ পরমানুভূতি!

মৃদু অনুযোগ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রুমা।

আপনি কি! ওদিকে সব বসে আছে আপনার অপেক্ষায় আর আপনি—পরম নিশ্চিন্তে বসে আছেন এখানে।

উঠুন, চলুন—রুমা অঙ্গুলি উচিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

অবশ বিকল অঙ্গকে টেনে এগিয়ে চললাম।

এড্‌মাণ্ড বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নবলব্ধ যোগমার্গের অর্জ্জিত বিদ্যা ফলাও করে জাহির করছে। শ্বেতার হাত ধরে বসে আছে—বিচার করছে ওর কর-রেখা।

ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম—

এবার সুরু হবে তোমার আসল পরীক্ষা! ওদের ত যা হয় তাই কিছু একটা বলে দিলে। এ কিন্তু বড় কঠিন ঠাঁই। এস ত যাদু—দেখি, বলতে পার কি আমার সম্বন্ধে বিস্ময়কর দু'চারটে চমকান সত্য কথা? বুঝব তোমার জারিজুরি।

ইতস্ততঃ করে এড্‌মাণ্ড এড়িয়ে যেতে চাইল।

চেপে ধরলাম জোর করে, আরও কঠিন করে।

অগত্যা ওকে বলতেই হল—

"You have got enough but endless is your desire"

আরও বলছি শোন—

"You are not so ill as you pretend to be!"

আর কিছু জানতে চাও ত তাও বলতে পারি। ঘাঁটাবেনা কিন্তু! এড্‌মাণ্ড গর্ব্বভরে ঘাড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

বিস্মিতই হলাম। এড্‌মাণ্ড—আমার জীবনের নিছক কয়েকটা সত্য কথা বলে দিল। এতসব কথা ও জানল কেমন করে? আর এই কটু মন্তব্যই বা করল কেন?

সঙ্গিনারা খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে পাতায় করে তুলে দিল একে একে সবার হাতে।

খুকু, মানব আর কল্পনা—ওরা ছিট্‌কে চলে গেছে বয়স্কদের সঙ্গ ছেড়ে। তটিনীর কলতানের সঙ্গে ওদের উচ্ছল হাসির উচ্চকিত রব ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ! আবার অমনি শুনছি সঙ্গীতের মধুর আলাপ—

"বাজে অলখিত তারি চরণে
রুণু রুণু রুণুঝুণু নূপুর ধ্বনি।"

বিদেশী হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদনে মুগ্ধ হয়ে এড্‌মাণ্ড ভীড়ে গেল ছোটদের দলে।

অসীমা আর মাধবী—ওরা বসে থাকতে রাজী নয়।

চলুন, চলুন আর দেরী কেন—এখনি না উঠলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না—কাকনীতে যাবার জন্য দুজনেই আকুল ব্যগ্রতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ওদের পিছু পিছু এগিয়ে চললাম।

পথে মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হল। অমিত যেন কার কাছে শুনেছে দক্ষিণকালীতে মাঝে মধ্যে দু'একটা নরবলি হয়। এর পেছনে সত্য কিছু আছে কিনা—তথ্যটুকু জানবার জন্য ওর ভীষণ ঔৎসুক্য। পুরোহিতকে তাই মুখোমুখি প্রশ্ন করে বসল—বলত ঠাকুর! এখানে নরবলি হয় কি না ?

সম্পূর্ণ কথা কয়টা হয়ত পুরোহিতের কানে যায়নি—বিনা দ্বিধায় তাই বললেন—বলি ! ওটা ত শক্তিপূজার বিশিষ্ট বিধি, আর অপরিহার্য্য অঙ্গ। বলি হবে—এ আর আশ্চর্য্য কি !

অমিত চটে উঠল। ধুত্ত্যেরি ! বলি'র কথা কে শুধোচ্ছে তোমায় ? আমি বলছি নরবলির কথা।

পুরোহিত একটু হকচকিয়ে গেলেন যেন। খানিক স্তব্ধতার পর সামলে নিয়ে বললেন—কই না ত ! কে বলেছে আপনাদের এ সব আজগুবি কথা ?

প্রশ্ন করবার আর কোন সুযোগ না দিয়ে পুরোহিত স্থান ত্যাগ করলেন।

অমিত দু'একটা চমকপ্রদ কাহিনী শুনবে আশা করেছিল। সে গুড়ে বালি। কৌতুহলটুকু চরিতার্থ করবার মত কোন সদুত্তর না পেয়ে পুরোপুরি দমে গেল।

কাকনীতে যাবার আগ্রহে অধীর, উতলা সব।

ঝট্‌পট্‌ গাড়ীতে চেপে বসেই অমিত হুকুম করল—প্রেমভকত! আপন কাজে হাত লাগাও এবার।

যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই ফিরে চলেছি।

মদন বাবুকে ঘুমের নেশায় পেয়ে বসেছে। চাকার আর্ত্ত ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ, এঞ্জিনের কাতর গোঙানি—কোন কিছুতেই কাতর হলেন না। সমানে তাল মিলিয়ে চলল ওর নাকের "ঘ্যাগর ঘ্যাগ" শব্দ। হেলান দেবার জায়গাটুকুর ওপর টান করে হাত দুটো বিছিয়ে দিয়ে অচৈতন্য-প্রায় মদন বাবু ঢুলে ঢুলে পড়ছেন—এদিক ওদিক, পাশে, সম্মুখে, পেছনে। মাঝে মাঝেই ছোট শিশুর মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়তে লাগল। বয়োজ্যেষ্ঠ বলে ওর এই অস্বাভাবিক ঘুম-কাতুরেপনায় হাসতেও পারছেনা কেউ।

বাবুজীর এ দুরবস্থা দেখে কল্পনা মাঝে মাঝে সামলে দিচ্ছিল।

যাত্রীদের তাগাদায়, আর পাছে সময় উতরে যায় এই ভয়ে—প্রেমভকত গাড়ীর গতি দ্রুততর করে দিল। যে পথটুকু যেতে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল, সেই পথটুকু দেড় ঘণ্টাতেই পার হয়ে এলাম্‌। আনন্দ উদ্দীপনা আর হৈ চৈ—জানতেই পারা গেল না, কোন এক ফাঁকে কাঠমাণ্ডু সহর পার হয়ে গাড়ী বালাজুর পথ ধরেছে।

বালাজুর পর থেকে পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট ফাটিয়ে নূতন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এ রাস্তাটা যাবে ত্রিশূলী পর্য্যন্ত। "ইণ্ডিয়া এইড

মিশন” এর টাকায় ত্রিশূলী পাওয়ার প্রজেক্টের কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি শেষ হয়ে যাবে। ভারী যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই এ রাস্তাটুকু না হলেই নয়।

ডিনামাইটের আঘাতে পাহাড়ের স্তর বিদীর্ণ হচ্ছে। মাঝেমাঝেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে।

রাস্তাটা একদম কাঁচা। কোথায়ও বা সম্পূর্ণ স্যাঁতসেঁতে। জায়গায় জায়গায় বুকের ওপর দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। বুল্‌ডোজার আর রোলার চালিয়ে পথের বুকটা সমতল করে নেওয়া হচ্ছে।

একদিকে পাহাড়ের প্রাচীর, অন্যদিকে মুখব্যাদন করে আছে মৃত্যুভীষণ অতলস্পর্শী খাদ। রাস্তাটা দুস্তর—প্রায় অনধিগম্য।

খুব সাবধানে, হুঁসিয়ার হয়ে প্রেমভকত ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। সামান্য অসাবধানতায় পলকে প্রলয় ঘটে যেতে পারে—হতে পারে সর্ব্বনাশ! রাস্তা ধ্বসে গিয়ে হতে পারে অবলুপ্তি—পাহাড়ের গহ্বরে চির সমাধি।

শ্রীমণ্ডিত—স্ফুরিত কাননকান্তার। চারদিকে বনবিটপীতে ঘেরা শ্যামলশ্রী। নাগার্জ্জুনের বনে ঘন অরণ্য সমারোহ।

পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা—সময় উড়ে যাচ্ছে কোন যাদুবলে।

উত্তীর্ণ হয়ে যাবে সময়, সূর্য্য চলে যাবে অস্তাচলে, ঠিক সময়ে কাকনীর সানসেট পয়েণ্টে পৌঁছতে না পারলে ব্যর্থ হয়ে যাবে সব পরিশ্রম! অধীর এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সকলে।

আর একটু জোরে—প্রেমভকত! আরও একটু জোরে চল।

সাধ্য নেই প্রেমভকতের—এ রাস্তায় গতিবেগ বাড়ান অসম্ভব।

কোন একটা অপরাধ মূলক ঘটনার তদন্ত শেষে, কাঠমাণ্ডুর পুলিস

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাকনী থেকে ফিরে চলেছেন পায়ে হেঁটে। ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাস্তার ভয়াবহতা জানিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে সাবধান করে বললেন—হেঁটে চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

সামান্য দুচারটে কথা বিনিময়ের পর শুভেচ্ছা জানিয়ে ভদ্রলোক ওর গন্তব্য পথ ধরলেন।

সকলের চোখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা! তবে কি কাকনীতে যাওয়া হবেনা!

আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েছি। আকস্মিক ভাবে "ক্যাচোর ক্যাচ"—প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ করে গাড়ীটা স্থির হয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল সকল সঙ্গীরা।

এ কি ভয়াবহ ব্যাপার! বন্‌বন্ করে শূন্যে ঘুরে চলেছে সম্মুখের চাকা দুটো। রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই—ধ্বসে গেছে প্রায় ১৫।২০ ফিট নীচে।

"রাখে হরি মারে কে?"

নেপথ্যশক্তির ইচ্ছায় আর ড্রাইভারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এ যাত্রা বেঁচে গেল সবাই।

কাকনীর মায়া!

এ কঠিন বিপর্য্যয়েও বিচলিত হয়নি কেউ। মানবের প্রতিজ্ঞা—যেমন করে হোক যেতে হবে নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে। বদ্ধ পরিকর মানব—দুচার মিনিটের খোঁজাখুঁজিতে একটা রাস্তা বের করে ফেলেছে। পথটুকু প্রায় দুর্গম—তা হলেও ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা ঘেঁসে, বাধাটুকু পার হয়ে গেল।

যেমন করে আমি পেরিয়ে এসেছি—ঠিক তেমনি করে আপনারাও পার হয়ে আসুন। কথাটুকু উচ্চারণ করেই মানব ছুটে চলল। আমরাও ওর পিছুপিছু ছুটলাম।

যাক্, আশা তবে অপূর্ণ রইল না।

"সান-সেট-পয়েণ্টে" এসে বসল সবাই। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে—ওঠা নামা করছে বুক দ্রুতগতিতে।

"অপরূপ পেখলুঁ রামা।"

কাকনী! কাকনী! কাকনী! মাথার মণি কাকনী!

"সুন্দর বদনে সিন্দূর-বিন্দু সামর চিকুর ভার।"

রক্তিম গোধূলির অনিন্দ্য সুন্দর রূপ! আকাশের আপ্রান্ত ছেয়ে গেছে রক্তের আলিম্পনে। দিগাঙ্গনে কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠো-মুঠো সিন্দুর জাল। ফাগের রাগে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে পশ্চিম আকাশ।

কাকনী! বন্যানী সমৃদ্ধ কাকনী! অভিসারিকা কাকনী!

সমীর হিন্দোলে ঝাউ আর পাইনের বনে উৎসরিত হচ্ছে অস্ফুট গুঞ্জন—গোপন অভিসার বার্ত্তা। ভূর্জ্জশাখে লেগেছে পত্র মর্ম্মর—আলিঙ্গনে বদ্ধ হবে আলো আর আঁধার। জলে স্থলে শূন্যলোকে চলেছে রহস্য আলাপ—মন্দ মধুর কানাকানি।

সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে—

চলে যাচ্ছে পাহাড় প্রাচীরের অন্তরালে, কোন গহন তলে।

দূরান্তের বনচ্ছায়ার ওপারে আকাশ-পথে নির্নিমেষ চেয়ে আছে নীরু। অস্তরাগের ক্ষীণরশ্মির লালিমাটুকু প্রতিফলিত হয়ে

করুণ করে তুলেছে ওকে। বিষাদ-করুণ অস্ফুট স্বরে গুঞ্জিত হয়ে উঠল ওর কণ্ঠ—

"গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা॥"

* * *

"ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক কুহকী ভেলি বরনারি॥"

*

কাকনী! রূপসী কাকনী! কুহকময়ী কাকনী!

অবেলার ঘন করুণ ছায়াঘেরা বনস্থলী। পত্র মর্ম্মরিত কানন সমীর, নির্ঝর-কল্লোল নিঃসৃত মৃদুমধুর ঝঙ্কার, সোনায় ভরা মাঠ, শূন্যলোকে সঞ্চরণশীল অলকস্তূপ, ঘনশ্যাম অবগুণ্ঠনে আবৃত পারিপার্শ্বিক।

অনাদি অনন্ত শান্তশ্রী পরিবৃত আবেগময় স্তব্ধ নিথর ক্রন্দসী—শুনতে পাচ্ছি পরম ঈপ্সিতের আহ্বান, উপলব্ধির বিরাট ইঙ্গিত।

"মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তহি চাই"

কাকনী! প্রেয়সী কাকনী! শ্রেয়সী কাকনী!

না, ভুলব না, ভুলবনা তোমায়—

তোমার এ অপরূপ রূপ!—মানসকুঞ্জে বিহার করবে নিশিদিন—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

অমরাপুরী থেকে ফিরে চলেছি মর্ত্ত্যের মাটীতে। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে বন-অঙ্গন। বিষাদভরা মন। অন্তঃসারশূন্য অন্তর-বাহির। বিয়োগ ব্যথাকাতর—ভারাক্রান্ত মনে বসে আছি আনমনা।

গাড়ী চলেছে ছুটে। জানতেও পারা গেল না—কখন ঢুকে পড়েছে সহরের ভেতর। চারদিকে বিদ্যুতের ঝলসান আলো, কল কোলাহল, ব্যস্ত চঞ্চলতা, হৈ চৈ। ওলট পালট হয়ে গেল সব। কৃত্রিম বাস্তব পরিবেশ—ভেঙ্গে দিল সব স্বপ্ন-মায়া।

ভেসে আসছে, "সুইট নেপাল"এর রেডিও সঙ্গীত—উচ্চস্বরে পরিবেশিত কর্কশ ছায়াছবির গান, নৃত্যপরায়ণা নটীর নূপুরনিক্কণ। ভোগ-লালসার উপকরণের মাঝে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল প্রশান্তিটুকু। বিষণ্ণ মনে ঢুকে পড়লাম হোটেলে।

॥ ১২ ॥

কয়েকদিন থেকেই কাঠমাণ্ডুতে বিজলী আলোর বিভ্রাট লেগেছে। ছবেজী তাই ঘরে ঘরে সেজ আর মোমবাতি দিয়ে গেছেন। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি। সারাদিন একটানা ঘোরা-ঘুরির ধকলে স্নায়ুগুলো সব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিছুতেই এক হচ্ছেনা চোখের পাতাগুলো—ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি দিচ্ছি। ইন্দ্রিয়গুলোকেও বশে আনতে পারছি না—সারাটা মন জুড়ে রয়েছে নীরু।

ঘুমের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে অলস দেহটাকে ছড়িয়ে দিলাম বিছানার ওপর। সেজটা টেনে নিলাম। চিবুকটা বালিসের ওপর রেখে আবোল তাবোল নানা কথা ভাবতে ভাবতে দিনপঞ্জীর পাতায় টুকিটাকি দু'চারটে কথা টুকে যেতে লাগলাম। এক সময় তাও শেষ হয়ে গেল।

অনেকটা রাত হয়ে গেছে। সমস্ত হোটেলটাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশুতি রাত।

না! আজ আর ঘুম হবে না।

"কবীর" আমার অতি প্রিয়। এমনি অবস্থায় "কবীর"-ই হয়ত প্রশান্তি এনে দিতে পারে। "কবীর"-কে টেনে নিলাম।

একের পর এক উল্টে চলেছি পাতাগুলো। ক্রমশঃই শান্ত হয়ে আসছে মন। পড়ে চলেছি—

"তেরা সাঁই তুহ্যো মেঁ জ্যোঁ পুহপনমেঁ বাস।
কস্তুরীকে মিরগ্ জ্যোঁ ফিরি ফিরি ঢুঁঢ়ৈ ঘাস॥"

"কবীর আপ ঠগাইয়ে ঔর ন ঠগিয়ে কোয়।
আপ ঠগা সুখ হোত হৈ ঔর ঠগে দুঃখ হোয়॥"

কবীরকে শিয়রে রেখে, আলোটা নিবিয়ে দিলাম। বহু বিস্মৃত সুরগুলো পেয়ে বসেছে আমায়। ভাবনার স্রোত ঠেলে নিয়ে গেল পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে।

রাত ক্রমে বাড়তে থাকে। তবুও ঘুম নেই চোখে। বুকফাটা কান্নায় পরম পুরুষকে জানাই—ফিরিয়ে দাও মিষ্টি স্মৃতিতে ভরপূর আমার আবেগময় পুরাণো দিনগুলো!

স্বপ্ন! না—অবচেতন মনের ভাববিলাস!

এ কি! কে এসে দাঁড়াল আমার আঁখির আগে। কে—কে ঐ ছায়া।

কে? কে তুমি স্বপনচারিণী।

ছায়া মূর্ত্তি নিরুত্তর।

কি চাই তোমার?

কিছু না—

আরও কাছে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্ত্তি। উষ্ণ শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহ স্পর্শ করছে আমার অঙ্গ। রহস্যময় ইঙ্গিত ভরা—ছায়ামূর্ত্তির আবেগ কম্পিত অধরে স্ফুরিত মৃদু হাসি।

মদিরারসভোর—মনে আমার ঝড়ের সঙ্কেত!

দ্রুত স্পন্দন জাগল ধমনী প্রবাহে।

স্পর্শ করব—বাঁধব ওকে বাহু ডোরে!

হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম।

খট্ খট্ খট্।

দরজায় সশব্দ করাঘাতে চেতনা ফিরে এল।

এ কি, কি হল আমার? কোথায় আমি! মেঝের ওপর পড়ে আছি কেন! কেনই বা সারা অঙ্গে নেমে এসেছে অলস অবসাদ!

ভোরের মৃদু রশ্মি লুটিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। ত্রস্ত পদক্ষেপে বারান্দায় ছুটোছুটি করছে সন্তন বাহাদুর।

দরজাটা খুলে দিলাম। রুমা দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে ত্রাস শঙ্কিত বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা—ও কি—কি হলো? অমন গোঁ গোঁ করে চীৎকার করে উঠলেন কেন?

॥ ১৩ ॥

প্রবাসের দিনগুলি প্রায় শেষ হয়ে এল। বিদায় নিতে হবে কাঠমাণ্ডু থেকে। এতদিন ঘুরেছি সহরের বাইরে। আজ ঘুরব যথেচ্ছ ভাবে সহরের ভেতর—যতক্ষণ না পাদুটো অলস অচল হয়ে পড়ে।

দল বেঁধে ঘুরছি। রৌদ্র ঝলমল তরুণ প্রভাত। আলোর বন্যায় স্নাত কাঠমাণ্ডুর পথঘাট। কোমল হাল্কা নীলাম্বরীর চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত আকাশের শূন্যলোক। মাঝে মাঝে অলস বিহারে ভেসে চলেছে শুভ্র মেঘজালের অলকচূর্ণ।

ফেনশুভ্র তুষার মেখলায় আবৃত উত্তর দিগন্ত—সীমান্ত প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে উন্নত শিরে।

দেখে চলেছি, ঘুরছি ফিরছি পথে পথে। অবশ ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম এসে শহিদ বেদীমূলে। শ্রদ্ধাপ্লুত, বেদনাভরা অন্তরে ঢেলে দিলাম অঞ্জলি অর্ঘ্য।

নেপালের রাণাশাহীর অবসান ঘটাল যাঁরা, গণতন্ত্রের কর্ণধার যাঁরা, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করল যাঁরা, দেশমাতৃকার পূজায় প্রাণ দিল যাঁরা, ভায়ের জন্য আত্মাহুতি দিল যাঁরা—তাঁদেরই উদ্দেশ্যে স্মারক স্তম্ভ—এই শহিদ বেদী।

মন চলে গেল আবার, ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠায়। নেপালের ইতিহাস—করুণ ব্যথা ভরা এক মর্ম্মান্তিক কাহিনী!

যার ধন তার ধন নয়।

রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন কে, আর ভোগ করলেনই বা কারা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল নামগোত্রহীন রাণা বংশ। মন্ত্রীশাসনে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলেন রাজা। সর্ব্বক্ষণ শুধু রক্তচক্ষু দেখিয়ে গত এক শতাব্দী ধরে রাণারাই শাসন করেছেন নেপাল রাজ্য।

এই রাণাদের অতীত চিন্তা করলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। স্বৈরাচারী, খামখেয়ালী—এরা প্রজাদের শুধু শোষণই করেছেন, শাসন করেননি। রাণাদের হাতে নীরবে মার খেয়েছে প্রজারা। নিঃশব্দে যাপন করেছে গ্লানিময় জীবন।

এই রাণারা নেপালের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। নিরীহ প্রজাদের পীড়ন করে, নিঙরে নিয়েছেন রক্তের শেষ ফোঁটাটুকু, মজুদ করেছেন প্রচুর বিত্ত, সঞ্চয়ের অঙ্ক করেছেন স্ফীত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে সারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে রাষ্ট্রীয় চেতনার অভ্যুত্থান হল। উঠল প্রচণ্ড লহরী—উঠল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিগীর। এই চলোর্ম্মির আলোড়ন থেকে নেপালও দূরে সরে থাকতে পারল না।

শুক্ররাজ শাস্ত্রী ! নেপালের গান্ধী—ভারতভূমি থেকে নিয়ে এলেন গান্ধীজীর আদর্শবাদ, চলল গণ আন্দোলন।

যুদ্ধ-সামসের তখন রাণাশাহীর গদীতে সমাসীন। চারদিকে জ্বলছে অসন্তোষের দাবাগ্নি। অশান্ত বিক্ষুব্ধ জনতা ! আশ্চর্য্যের কথা, আন্দোলন এগিয়ে চলল নেপালাধীশের পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে।

মানব দরদী !

মানবধর্ম্মী, অবিসংবাদী নেতা শুক্ররাজ ! গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও জাতি ভেদ মানতেন না। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলতেন—

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

বেদান্তবাদী শুক্ররাজ ! কবীরের কথায় বলতেন—

"পাহন পূজে হরি মিলৈ, তো ম পূঁজু পহার"

দেশদ্রোহিতা!

রাণারা শুক্ররাজকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। নেপালাধীশ ত্রিভুবন বিক্রমকেও দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন। জনমতের চাপে অবশ্য রাণাশাহী শাসকেরা রাজার বিচার করতে সাহসী হয়নি।

বিচার হল—শুক্ররাজের ফাঁসী হল।

ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে গেলেন শুক্ররাজ।

রাতের মধ্য প্রহর। নিশুতি নিস্তব্ধ চারদিক। রাণার লোকেরা শুক্ররাজকে বাগমতীর সৈকতে—"পচলী"তে নিয়ে এল।

পবিত্র ধারায় স্নান করে এলেন শুক্ররাজ। কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল মধুর আলাপ—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥"

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

গুঞ্জিত হয়ে উঠল কাঠমাণ্ডুর বায়ুস্তর। অভিভূত হল সমস্ত বাতাবরণ। নভোমণ্ডলের কক্ষচ্যুত হল একটি গ্রহ—অঙ্গচ্ছেদে ব্যথাকাতর হল কিনা কে জানে!

বাগমতীর শিরায় জাগল কি কোন স্পন্দন! চঞ্চল হল কি স্রোতস্বিনী!

"রাজদ্রোহীর এই পরিণাম।" বর্ব্বর রাণারা, একটা ফলক ঝুলিয়ে দিল শবদেহের গলায়। জনতাকে আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য প্রাণহীন দেহটাকে ঝুলিয়ে দিল প্রকাশ্য রাস্তার ওপর।

শুক্ররাজ যে যজ্ঞবেদী তৈরী করে গেলেন, তাতে পরপর আত্মাহুতি

দিলেন ধর্ম্মভক্ত শ্রেষ্ঠ, গঙ্গালাল শ্রেষ্ঠ, দশরথ চন্দ্র, [illegible] [illegible] আর ভোগেন্দ্র মানসিং।

শহিদের রক্তে রাঙ্গা হল কাঠমাণ্ডুর মাটি। নূতন কলেবরে জন্ম নিল নেপাল। সার্থক হল আন্দোলন!

মানব বিভ্রান্ত, সংবিৎহীনপ্রায়। আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসল—নারী যেখানে লাঞ্ছিত, মাতৃমর্য্যাদা যেখানে অবলুণ্ঠিত, ঝরে পড়েছে যেখানে পাষাণের অশ্রুধারা, স্বৈরাচারীর শাসন কি টিকতে পারে সেখানে?

স্বয়ং শক্তিই হয়ত অবতীর্ণা হয়েছিলেন রাণাশাহীর নিপাতের জন্য।

চাকা ঘুরে গেল আশ্চর্য্যভাবে। কেউ জানতেও পারল না, কেমন করে ঘটল রাণাশাহীর পতন। নাটকের মূল ভূমিকায় আবির্ভূতা হলেন মনস্তাত্ত্বিক জার্মাণ মহিলা এরিকা। এসেছিলেন মহারাণীর চিকিৎসক হয়ে—অস্ত্রোপচার করে গেলেন নেপালের দুষ্ট ক্ষতে।

রাজা ত্রিভুবন বিক্রমের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনোভাব জানতে পেরে, রাণাশাহী কবলিত নেপালের মুক্তির জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন—যোগাযোগ স্থাপন করলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে। অনুমোদন পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এরিকা।

১৯৫০ সালের ৬ই নভেম্বর! মৃগয়ার ছলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন রাজা ত্রিভুবন বিক্রম। যুবরাজ মহেন্দ্রও এলেন। একটা মোটরের ষ্টিয়ারিং ধরলেন রাজা নিজে। অপরটার ষ্টিয়ারিং ধরলেন যুবরাজ। পাশে বসে রইল রাণাদের নিযুক্ত রক্ষী আর চালকেরা। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না কি ঘটতে চলেছে। অতর্কিতে দুটো গাড়ীই ঢুকে পড়ল ভারতীয় দূতাবাসের ভেতর। আর বেরিয়ে এল না। উন্মত্ত রাণারা সৈন্য সামন্ত দিয়ে ঘিরে ফেললেন দূতাবাস।

বিশ্ব রাজনীতি আর জনমতের চাপে, আন্তর্জাতিক আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে, রাণাদের সরে দাঁড়াতে হল। রাজা চলে এলেন ভারতে। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত রাণারাও প্রাততাড়ি গুটোবার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন।

রাণাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হল নেপাল !

মুক্ত হল রিক্ত নিঃস্ব প্রজারা। স্থুরু হল নূতন যুগের ভোব। জনমতের চাপে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হল মন্ত্রীসভা-পরিপোষিত রাজতন্ত্র।

আসবে সুদিন ! আসবে—নিশ্চয়ই আসবে নেপালেব ভাবী বংশধরদের কাছে।

ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত মানব ! ক্লান্ত মানব—দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে ঢেলে দিল শ্রদ্ধার্ঘ্য, নিবেদন কবল অকুণ্ঠ প্রণতি। বিমর্ষ আত্মহাবার মত নিষ্পলক চেয়ে রইল শহিদ বেদীব দিকে।

বেলা হয়েছে অনেকটা। মানবকে নিয়ে চ'লে এলাম হোটেলে।

খেয়ে দেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার বেবিয়ে এলাম পথে। বেশ একটা মজার ব্যাপাব ঘটে গেল। অমিত পান সিগাবেট কিনবে। দোকানীকে ভাবতীয় মুদ্রা দিয়েছে। ও তা কিছুতেই নেবেনা। অমিত ফাঁপবে পড়েছে। ইতস্ততঃ কবে এগিযে এল আমাব কাছে। হাত পেতে বলল—দাদা ! দশ গণ্ডা নেপালী পয়সা দাও ত ?

তোমাব আবার দশ গণ্ডা পযসাব দবকার হল কেন ?

দোকানীটা ভারি বেরসিক। ওকে একটা টাকা দিয়ে বললাম,—এক প্যাকেট সিগারেট আর দু'টা পান দাও। ভাঙ্গানি ফিবিয়ে দিতে হবে না—পুরোটাই নিয়ে নাও। ভাবতীয় মুদ্রা বেশী মূল্যবান হলেও, তা গ্রহণ কবা নাকি অন্যায়। দোকানী কিছুতেই নিলনা টাকাটা।

ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিতেই অমিত খুসী হয়ে চলে গেল।

বিকেল হয়ে গেছে। তরুণ তরুণীরা বিভিন্ন রুচিব পোষাকে সেজেগুজে পথে বেরিয়েছে। মেয়েদের সাজেরই চটক্ বেশী। কেউ বা বাঙ্গালী মেয়েদের মত শাড়ী পরেছে, কেউ পরেছে পাঞ্জাবী

মেয়েদের মত সালোয়ার আর ওড়না। সাবেকপন্থীরা এখনও জাতীয় পোষাক ছাড়েনি। ওদের পরনে ঘাগরা আর পুরো হাতা জ্যাকেট। গ্রামের মেয়েরাও এই পরিচ্ছদই ব্যবহার করে, তবে গ্রাম্য মেয়েদের মত সহুরেদের ভারী গহনা অলঙ্কারের বাহুল্য নেই।

সহুরে মেয়েদের আজকাল বিদেশী ভাবধারার ছোঁয়াচ লেগেছে। ওরা অঙ্গ চর্চ্চার জন্য কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করছে।

কি দরকার ওদের এসব কৃত্রিমতার ? সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাবনীভরা দেহাবয়ব, ছন্দ-চঞ্চল গতিভঙ্গি, সুকুমার সুষমা ওদের মুখমণ্ডলে।

তবু কেন লাঞ্ছিত করে আঁখিকোল মমীরা সুর্মায়, আঁকে ভ্রূ-- কজ্জ্বলকালো রেখায়, লিপ্ত করে ওষ্ঠপুট রঙয়ের আলিম্পনে, রঞ্জিত করে গণ্ডদেশ রক্তিম রাগে ? সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে ভাল—মায়েরা, মেয়েরা কেউই পর্দ্দানশীন নয়।

ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে পুরুষদের প্রায় সকলে একই পোষাক পরে। সকলেই ললাটে আঁকে চন্দনের ফোঁটা। নব্য যুবকেরা দুএকজন ইউরোপীয় পোষাক ধরেছে।

নেপাল—কাঠমাণ্ডু !

সারাটা পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টি পড়ে আছে এ দেশের ওপর। এমব্যাসীর ছড়াছড়ি কাঠমাণ্ডুতে। বেশীর ভাগই পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠির। সন্ধ্যার দিকে বিদেশী প্রতিনিধিরা "উইলিস নাইট" চেপে বের হয় হাওয়া খেতে। একটার পর একটা—গাড়ীর শোভাযাত্রা চলে রাজপথ ধরে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত—শ্রান্ত চরণে, অনেকটা রাতে ফিরে এলাম হোটেলে।

শেষ হয়ে এল নেপাল পরিক্রমা। আজকের রাতটুকু শুধু মাত্র বাকী। কালই প্রত্যুষে ফিরে যাব।

মানব আমার ঘরে বসে আছে। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, কষ্ট-দৈন্য,

স্বাচ্ছন্দ্য-কৃচ্ছ্রতা, আনন্দ-বেদনা জড়িত গত কয়দিনের সাহচর্য্যে মানবকে আজ পরম আত্মীয়—অতি আপন জন বলে মনে হচ্ছে।

নেপালের স্মৃতি ! বিগত কয়েকদিনের স্মৃতিটুকু রোমন্থন করছি।

মানবের চাহনীতে অধীরতা। অর্দ্ধস্ফুরিত অধরপুটে ব্যগ্র ব্যকুলতা। বিমর্ষ মানব, অস্ফুট ভাবে ডাকল—দাদা !

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মানবকে কাছে টেনে নিলাম। ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহধারা ঢেলে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বলবে মানব ?

দ্বিধাগ্রস্ত, নত নেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল—হ্যাঁ। পরমুহূর্ত্তেই বলল—না, আমার জিজ্ঞাসাটা কৌতূহল হয়েই থেকে যাক্ !

থাকবে কেন ! সম্ভব হলে নিশ্চয়ই তোমার কৌতূহলটুকু মেটাব।

বলেই ফেলি। সঙ্কোচ আর কুণ্ঠাটুকু দূরে ঠেলে মানব জিজ্ঞাসা করে বসল—নীরুদির কথা শুধোচ্ছিলাম।

সারাটা ভ্রমণ পথে, শুধুই মনে হয়েছে—নীরুদি কেমন যেন বিচিত্র রহস্যে ঘেরা ! কখনও দেখেছি সহজ, সরল, কুণ্ঠাহীন। কখনও বা সংশয় আর অবিশ্বাসে দোদুল্যমান, কখনও হাসিতে উচ্ছল, কখনও বা সমাহিত, ধ্যানস্তিমিত।

পরমুহূর্ত্তেই আবার দেখেছি ঘন নিশীথের স্তব্ধতা ! বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ দেখেছি ওর দৃষ্টিতে। কখনও অভিমান কুণ্ঠা, কখনও আবেগ ব্যাকুলতা। কখনও হয়ত মনে হয়েছে অতি আপনার—পরক্ষণেই মনে হয়েছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ! নীরুদি ভিন্ন জগতের।

কেন এই পরস্পর বিরোধী আচরণ ! কেন এমন হয় নীরুদি !

স্তিমিত কুণ্ঠা নিয়ে উত্তরের আশায় ব্যগ্র—উদ্বিগ্ন চিত্তে বসে রইল মানব।

স্বর বেরোচ্ছে না—মূক হয়ে গেল কি কণ্ঠ !

বারবার চেষ্টার পর বিচলি[illegible]ক্ষীণ ধ্বনি বেরিয়ে এল। বলব মানব—বলব তোমাকে সব কথা। ত[illegible]আজ নয়, অন্য আর একদিন।

আশাহত—অসাফল্যের ব্যথা করুণ দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত চেয়ে রইল মানব।

আচ্ছা আসি—আহত, কাতর মানব চলে গেল।

সমস্ত হোটেলটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত হয়েছে অনেক। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে একা আমিই শুধু জেগে আছি।

হঠাৎ মনে হল—যদি আর দেখা না হয় মানবের সঙ্গে! যদি সুযোগ না হয়! তাহলে ত প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে যাবে!

না! মানবকে লিখেই জানিয়েদি।

ক্লান্ত ঘুমাবেশে আঁচর কেটে চললাম কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

বিগত বসন্ত দিনে সমগ্র সত্বা দিয়ে চেয়েছিলাম নীরুকে।

একটি কুঁড়ি, দুটি পাতা। একই নারীর দুটি প্রেমিক—সোমনাথ আর আমি। সোমনাথই জয়ী হল শেষে। কিন্তু সেও আবার হেরে গেল নীরুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে।

স্বামী পরিত্যাগ করে চলে এল—সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক হয়ে গেল নীরু। বারবার আবেদন করেও সাড়া পাচ্ছি না আর।

এইটুকুই তোমার নীরুদির বিগত দিনের সংক্ষিপ্ত কথা। সংঘাত সঙ্কুল বাস্তব পরিবেশই হয়ত ওর ভাববৈষম্যের মূল কারণ।

॥ ১৪ ॥

ঊষার অপচ্ছায়া কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে রয়েছে। রাত ভোর হতে তখনও প্রহরার্দ্ধেক বাকী।

জাগিয়ে দিলাম সবাইকে। লেগে গেল তাড়াহুড়ো!

বাঁধা ছাদা করে প্রস্তুত—হোটেলের বেয়ারা বাবুর্চ্চিদের বকসিস্ মিটিয়ে ম্যানেজার দুবেজীর কাছে এলাম।

হোটেল ম্যানেজার দুবেজী—কত যাত্রী আসে কত যাত্রী যায়!

দুদিনের অতিথি আমরা, তবুও [illegible] অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটো। কেন এ মায়া!

বিছানা বাক্সগুলোতে ওদের লেবেল ঝুলিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম। মুটের মাথায় মোট ঘাট চাপিয়ে এসে গেলাম রয়্যাল নেপাল এয়ার লাইন কর্পোরেশনের সিটি অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে এড্‌মাণ্ডও এল।

দ্রৌপদী আর ওর মা—সেই কোন সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে বিদায় জানাতে এসেছে।

টপ্‌টপ্‌—দু'চার ফোঁটা অশ্রুবারিও ঝরে পড়ল চোখের কোণ বেয়ে।

এদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

বিদেশী বন্ধু এড্‌মাণ্ডের করমর্দ্দনে আমরা ব্যথিত। নীরু প্রায় বেপথুমতী।

নেপালের স্মৃতির অমূল্য সম্পদ—ওরা চিরকাল থাকবে আমাদের মনে।

বাস টেনে নিয়ে চলল গৌচর এয়ার পোর্টে।

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল দ্রৌপদী, দ্রৌপদীর মা আর এড্‌মাণ্ড।

পাঁচ সাত মিনিট লাগল এয়ার পোর্টে আসতে। বাক্স বিছানাগুলো ওজনের পর ছাপ ছুপ লাগান হল।

লাউঞ্জে বসে আছি।

কল্পনা আর মানবকে নিয়ে মদন বাবু উপস্থিত হলেন।

আরে! আশ্চর্য্য হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জিজ্ঞাসা করতেই হল—এই শীতের ভোরে কষ্ট করে কেন এলেন এতটা পথ!

ব্যথাবিষণ্ণ মদন বাবু। অতি ক্ষীণ করুণ স্বরে বললেন—আপনাদের সঙ্গে কত আনন্দে কাটল এ ক'য়টা দিন! চলে যাচ্ছেন—ভাবতেই ব্যথিত হয়ে উঠছে মন। এখনও ত চলে যাননি, এর মধ্যেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে সব[illegible]নে হচ্ছে কি যেন হারিয়ে গেছে।

বিষাদমাখান কণ্ঠে আবার ব[illegible]ন—না হয় এসেছি কষ্ট করেই, তবুও

জিজ্ঞাসা করি, এ সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকু জানাবার অধিকারও কি নেই ?

আবেগ প্রবণ কণ্ঠ ওর—কেঁপে কেঁপে উঠল বারবার।

এই মদন বাবু ! এরই সাহচর্য্যে—আমাদের নেপাল ভ্রমণ হয়ে উঠেছিল সার্থক সুন্দর। এরই বাক-নৈপুণ্য আর কথা-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে থেকেছি সর্ব্বক্ষণ। ভুলে গেছি পথ কষ্ট।

সেই মদন বাবুর সদাশয় ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হতে হল আবার। বিদেশে এমন সজ্জন, সুখদায়ক সঙ্গী—সত্যই দুর্লভ, প্রায় কল্পনাতীত।

এয়ার পোর্টের লাউঞ্জ হয়ে উঠেছে বেদনা-বিধুর। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় কাতর সবাই। অশ্রুসজল খুকু, মানব আর কল্পনা। আমাদের চোখও ছলছল করে উঠল।

কেন এই বিরহ কাতরতা ! যাওয়া আসা—জগতের রঙ্গমঞ্চে এই ত রীতি ! এই ত দুনিয়ার নিয়ম !

তবু কেন এই মোহকজ্জল আকুলতা ! কি এ মায়া ?

বসন্ত আসে, ফুল ফোটে, মুকুলিত হয় পুষ্পবীথি, ঋতুরঙ্গে মেতে ওঠে প্রকৃতি। জাগে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সমারোহ। আমোদিত হয় দশ দিশি। বীণার তন্ত্রাতে বেজে ওঠে বাহারের পঞ্চম আলাপ।

আবার আসে শীত। ঝরে পড়ে পাতা। শীর্ণ, রুক্ষ হয়ে পড়ে শ্যামায়িতা ধরণী। অপেক্ষায় থাকে আবার কবে আসবে বসন্ত—যৌবনরসে সিক্ত হয়ে সিঞ্চিত হবে ধরণীতল।

বিচিত্র এ সংসার ! প্রতিমুহূর্ত্তে এমনি করে চলে ভাঙ্গাগড়ার খেলা।

কেন তবে শোক ! কেন এই আঁখি জল ! কেন এই ক্ষোভ !

এসেছিলাম পথের ডাকে, ফিরে চলেছি আবার ওরই ডাকে।

পথের ডাক ! এ হচ্ছে মোহিনীর মায়া ! শান্ত থাকতে দেয় না কাউকে—সর্ব্বনাশা এ ডাক ! যে শুনে[illegible] একবার—কিছুতেই পারবেনা ঘরে থাকতে। বেরিয়ে তাকে আসতে হবেই হবে। আচ্ছন্ন হয়ে

চলবে সে পথে পথে। পথে নেমে হবে সে উদাসী বাউল। দুঃখে, বিপদে দুর্গম, দুর্ব্বার পথ চলে পাবে আনন্দ। সারাটা জীবন কেটে যাবে পথে। পথেই বাঁধবে বাসা, পথই হবে ঘর। হোক না হাজার কষ্ট, আসুক না শত বাধা, হয় হোক আত্মনাশ, হোক জীবনাবসান— ক্ষতি নেই কিছু।

"এই তো ব্রজের ধূলো"—

বীজমন্ত্র জপে চলবে অবিরত। আত্মহারা মন ভুলে যাবে তার অহং চিন্তা, ভুলে যাবে সব মদ-গরিমা—চলে বেড়াবে পথে পথে, একাত্ম হয়ে মিশে যাবে ধরনীর ধূলোয়, মিশে যাবে বিশ্বরূপার সঙ্গে।

এমনি করে বারবার পথ ডেকেছে। ডেকেছে বারবার হিমালয়ের তুষারলোক। পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ লিপি—পারিনি প্রত্যাখ্যান করতে একবারও। সাহস হয়নি ফিরিয়ে দিতে।

যতবার এসেছি, মন্ত্রমুগ্ধের মত কেটে গেছে দিনগুলি। ফিরে গেছি বার বার ফিরে আসার অভিলাষ নিয়ে।

এই হিমালয়—ধৈর্য্য আর স্থৈর্য্যের সুমহান প্রতীক!

এর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এনে দেয় সান্দ্র ঔদার্য্য, ভুলিয়ে দেয় ভেদাভেদ।

পরমতীর্থ—পরমবিস্ময় এই হিমালয়!

এর বায়ুস্তরে ছড়ান রয়েছে পরম সাত্ত্বিকতা। এর গুহা গহ্বরে আছে ধূপের সুবাস। নদী নির্ঝরে ঝরে পড়ে অগুরু নির্য্যাস। গাছে গাছে পাই চন্দনের সুগন্ধ, ফুলে ফলে লতায় পাতায় মাখান রয়েছে মন্দার পারিজাতের সুরভি।

মনমাতান প্রাণভোলান, এই সুরভিসার! আকুল করে তুলবে—করে তুলবে অস্থির চঞ্চল! করবে মাতোয়ারা মনমাতাল। মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে পথ পিয়াসী। সংসারে জন্মাবে বিরাগ, থাকবে না কোন স্পৃহা। বিত্তবৈভবে জাগবে অনাসক্তি।

শান্তির নীড় এই হিমালয়!

এর আশ্রয়ে মিলবে অশান্ত অন্তরের সান্ত্বনা, মিলবে ক্ষুধার আহার্য্য, সমাধান হবে সকল প্রশ্নের মীমাংসা। সন্দেহ সংশয়ের দোলায় ক্ষতবিক্ষত বিক্ষুব্ধ মনে ফিরে পাবে পরম প্রশান্তি। লাভ করবে চতুবর্গ ফল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—অক্ষয় স্বর্গ।

চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বেদী এই হিমালয়! গেয়ে যায় অনাদি অনন্ত গান। কাণ পেতে থাক—শুনতে পাবে সঙ্গীত স্রষ্টা মহেশের মুখ নিঃসৃত আলাপের সুরামৃত, অনাবিল সুর লহরী। উদ্বেল ভাবতরঙ্গে—হয়ে পড়বে স্থির অচঞ্চল। পাবে নির্ম্মল আনন্দরস।

হিমলোককে ছেড়ে যেতে হবে। ক্ষণে ক্ষণে আকুল হয়ে উঠছে মন।

তীর্থের ঝুলিতে ভরে নিয়েছি পরম পাথেয়, পরমজ্ঞান। অন্তরের পরম মাধুরী, মানস-সরস উপলব্ধি—অক্ষয়, অমর, অব্যয়, অনন্ত পুণ্য।

বিদায় নিতে হল স্বর্গ থেকে।

দেখা হল না প্রাণ মন ভরে, পেলামনা রস সঞ্জীবনীর পূর্ণ আস্বাদ। হলনা রূপ-সুধার মূল্যায়ণ। যে স্বপ্নজাল রচনা করেছিলাম—দেখা হলনা তার অনেক কিছু, রয়ে গেল অসম্পূর্ণ, অনাস্বাদিত। অনাহত রয়ে গেল কত অরণ্য বীথি। অনাঘ্রাত রয়ে গেল কত কুঞ্জবাটিকা।

প্রতিশ্রুতি রেখে গেলাম—আবার আসব ফিরে। তাই বলি যাব—যাব আবার! যাব বারবার।

মাইকে ঘোষিত হল—সিমরা যাত্রীরা প্রস্তুত হয়ে নিন। ব্যথা ভারাক্রান্ত চিত্তে চললাম এগিয়ে ধীর পদক্ষেপে।

মানব খুকুর হাতে গুঁজে দিল এক টুকরো কাগজ।

"গোলাপের সাথে হায় মাধবিকা লইবে বিদায়,
যৌবনের মধুগন্ধী গ্রন্থ খানি হয়ে যাবে সায়!
তমালের ডালে ডালে যে পাপিয়া গেয়েছিল গান,
আবার উড়িয়া যাবে কোন দেশে, কে জানে কোথায় ?"

ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌—একটানা শব্দে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে যন্ত্র দানব। উঠে এলাম ওর উদরে।

উড়ছে, উড়ছে—ক্রমে উঠে চলেছে ওপরে। আবছা হয়ে গেল দৃষ্টিপথ। হারিয়ে গেল মানব, কল্পনা আর মদন বাবু।

থাকেনা কিছুই, এমনি করে হারিয়ে যায় সব কিছু।

মমতায় ভিজে উঠল চোখের পাতাগুলো।

নয়নপথ থেকে অন্তর্হিত হল কাঠমাণ্ডু। হিমালয় কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল অচল অটল।

সবার চোখ থেকে ঝরে পড়ল মুক্তাবিন্দু।

নিষ্ঠুর হিমালয়—নিষ্ঠুর তুমি! তোমার বুকে জমাট বাঁধা অশ্রুসাগর! ঝরে পড়লনা—ঝরে পড়লনা একবিন্দু বারি।

কঠিন হিমানী স্তূপ! দাঁড়িয়ে রইলে, নির্বিকার প্রাণহীন!

বিদায় কাঠমাণ্ডু, বিদায়। যাবার কালে মিনতিটুকু রেখে যাই।

"আবার আসিবে যবে নাচাইয়া নূপুর উজালা,
তৃণাসনে অতিথিরা—যেন সে ছড়ানো তারামালা।
সে আনন্দ অভিসারে মোর কথা মনে করে বধূ,
উপুড় করিয়া দিও শুষ্ক এক বিরহী পেয়ালা।"